Recommended as a Text Book by the Calcutta University
(*Vide Calcutta Gazette 29-4-1937*)

বিজ্ঞান প্রবেশিকা

(উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ৭ম হইতে ১০ম মানের জন্য)

মুখবন্ধ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত

ডাঃ জ্যোতিশ্চন্দ্র রায় এম্, বি প্রণীত

সহযোগী—ডাঃ সুশীলকুমার মিত্র ডি, এস্-সি (কলিঃ)
ডি, এস্-সি (লণ্ডন)

মূল্য একটাকা বারআনা মাত্র

ভূমিকা

বালক বালিকাদিগের সুকুমার মনে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ গ্রথিত করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, উহা আয়ত্ত করা ছাত্রগণের পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রবীণ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় এই পুস্তকের মুখবন্ধে বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথাযথ পালন না করিলে বিজ্ঞানশিক্ষার চেষ্টা সুদূর পরাহত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পুস্তকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলি যথাসম্ভব সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে, এবং তৎপ্রবর্তিত বাংলা বানানের নূতন নিয়মানুযায়ী পুস্তকের সমস্ত বানান দেওয়া হইয়াছে। যে সকল স্থানে 'জ'র উচ্চারণ '*Z*' র ন্যায় হইবে, সেই সকল স্থানে 'জ্' ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণিতে পঠিত হইলে ছাত্রগণের বোধহয় সুবিধা হইবে।

চতুর্থ শ্রেণিতে (Class VII)—জ্যোতিষ ও ভূবিদ্যা।

তৃতীয় শ্রেণিতে (Class VIII)—জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে (Class IX)—পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন।

প্রথম শ্রেণিতে (Class X)—পুনরালোচনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থ সদস্য, আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী রায় জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই মহাশয় পুস্তকখানির নামকরণ করিয়াছেন; এবং পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে-টি; সি, আই, ই; ডি, এস্-সি; পি-এচ্, ডি মহাশয় পুস্তকখানি লিখিবার সময় নানাবিধ মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন; এজন্য তাঁহাদের উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ রহিলাম। এই পুস্তক প্রণয়নে সহযোগিতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র স্নেহাস্পদ ডক্টর সুশীলকুমার মিত্র ডি, এস-সিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। বালক-বালিকাগণের কোমল হৃদয়ই সকল প্রকার শিক্ষার বীজ বপন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দের বিজ্ঞানশিক্ষার স্পৃহা উন্মেষিত হইলে আমার শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

কলিকাতা
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬। } **গ্রন্থকার**

মুখবন্ধ

বিজ্ঞানশিক্ষা, পরীক্ষা ও গবেষণামূলক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেবল পুস্তকগত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া উহা আয়ত্ত করা যায় না। যাহাতে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণ প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শিক্ষা করে, তৎবিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত পরিচিত হইতে হইলে, উহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রাণি-জগতের বিষয় স্থূল মর্ম্মগুলি পরিগ্রহ করিতে হইলে, চিড়িয়াখানায় যাইয়া জীব জন্তুর জীবনযাত্রা, হাব-ভাব, আকার-ইঙ্গিত প্রভৃতি একজন শিক্ষক সঙ্গে জানা উচিত, এবং এইজন্য ও বিবিধ প্রকার শিলা, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার জন্য যাদুঘরও মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই প্রকার উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইলে, নানাবিধ গাছ গাছড়া ও তাহাদের ফল পুষ্প প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হইবে। চিত্র, মডেল প্রভৃতি সাহায্যে শিক্ষকমহাশয়গণ ছাত্রদিগকে নরদেহের যন্ত্রসমূহ ও তাহাদিগের কার্য্য বুঝাইয়া দিবেন। রসায়নীবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার মূল

তাৎপর্য্যগুলি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থি-দিগের জন্য সম্প্রতি বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আশা করি, ইহা দ্বারা ছাত্রগণের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ক্রমশঃ উন্মেষিত হইবে।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ডাক্তার জ্যোতিশ্চন্দ্র রায় বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক রচনায় বিশেষ পারদর্শী। এই পুস্তকখানিতে তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অতি সহজ ও নির্ভুলভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সায়েন্স কলেজ
৩০শে আগষ্ট ১৯৩৬

"धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि" ।

বিষয় তালিকা

বিজ্ঞান প্রবেশিকা

প্রথম অধ্যায়

জ্যোতিষ (Astronomy)

Syllabus: Observation and identification of the principal constellations, major stars and planets throughout the year at night. The Sun—its dimension and distance from the Earth. Planetary system—relative positions. Solar year and seasons. The Moon and its phases—lunar year. Eclipses of Sun and Moon. Comets and meteors.

গগনগাত্রে সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে **জ্যোতিষ্ক** কহে। যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে এই সকল জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম **জ্যোতিষ**।

খগোল

মেঘমুক্ত দিবসে কোন উন্মুক্ত স্থান হইতে উপরে চাহিয়া দেখিলে আকাশকে একখানি বৃহৎ নীল ঢাকন (অর্ধগোলক) বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী যেন এই ঢাকনে আবৃত, এবং ঢাকনখানি বহু দূরে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যে বৃত্তাকার রেখায় আকাশ পৃথিবীর সহিত

* Candidates will be expected to have had a training in observation and in accurate and clear description, with reference to their practical applications and phenomena as observed in daily life. No detailed technical knowledge will be required. Questions should be sufficiently varied and numerous to allow considerable option. (C. U.)

মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার নাম **দিগন্ত** (Horizon)। অর্ধগোলকের ন্যায় দেখাইলেও আকাশ পৃথিবীকে সর্বদিকে বেষ্টন করিয়া আছে, সুতরাং ইহাকে একটি সুবৃহৎ পূর্ণ গোলকের অভ্যন্তর-তল রূপে কল্পনা করা হয়, এই তলের নাম **খগোল** (Celestial sphere)। পৃথিবী এই খগোলের কেন্দ্রে অবস্থিত, এবং খগোলটি বিভিন্ন প্রকার জ্যোতিষ্কে খচিত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সমস্ত জ্যোতিষ্ক শূন্যে অবস্থিত আছে। খগোলের যে বিন্দু দ্রষ্টার ঠিক মাথার উপর থাকে তাহাকে দ্রষ্টার **সুবিন্দু** (Zenith) বলা হয়।

তোমরা জান যে পৃথিবী গোলাকার, এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা, চাপা প্রান্তদ্বয়ের নাম যথাক্রমে সুমেরু ও
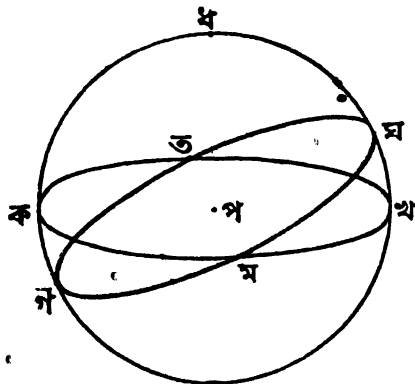
১নং চিত্র

প—পৃথিবী ; ধ—উত্তর খ-মেরু ; কতখম—খ-বিষুব রেখা

গতঘম—ক্রান্তিবৃত্ত।

কুমেরু। সুমেরু ও কুমেরুকে একটি কাল্পনিক সরল রেখা দ্বারা যোগ করিলে, সেই রেখাকে পৃথিবীর **মেরুদণ্ড** বা **ধ্রুবাক্ষ**

(Axis) কহে ; এই রেখাটি বর্ধিত হইলে, খগোলকে যে দুই বিন্দুতে ছেদ করে, তাহাদিগকে **খ-মেরু** (Celestial poles) বলা হয়। যে কাল্পনিক বৃত্ত সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমদূরে অবস্থিত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম **ভু-বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত** (Terrestrial equator)। সেইরূপ যে কাল্পনিক বৃত্ত খ-মেরুদ্বয় হইতে সমদূরে অবস্থিত হইয়া খগোলকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম **খ-বিষুবরেখা** (Celestial equator)। খ-মেরুদ্বয় ও সুবিন্দু যোগ করিয়া খগোলে যে কাল্পনিক বৃত্ত অঙ্কিত হয়, তাহার নাম **খ-মধ্যরেখা** (Celestial meridian)।

জ্যোতিষ্ক

জ্যোতিষ্ক সমূহকে প্রধানত তিনি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যে সকল জ্যোতিষ্ক খগোলের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত, অর্থাৎ যাহারা খ-গোলে ঘুরিয়া বেড়ায় না, তাহাদিগের নাম **স্থির তারা** (Fixed stars) ; সূর্যও এইরূপ একটি স্থির তারা। (২) পৃথিবীর ন্যায় যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্যকে নিয়ত পরিক্রম করিতেছে, তাহাদিগের নাম **গ্রহ** (Planets)। (৩) চন্দ্রের ন্যায় যে সকল জ্যোতিষ্ক পৃথিবীকে বা অপর কোন গ্রহকে পরিক্রম করিয়া থাকে, তাহাদিগকে **উপগ্রহ** (Satellites) কহে।

গ্রহ ও স্থিরতারাগুলিকে নগ্নচক্ষে প্রায় একরূপ দেখায়, তবে কোন্‌গুলি স্থিরতারা এবং কোন্‌গুলি গ্রহ তাহা জানিবার উপায় কি ? (১) স্থিরতারাগুলিকে খগোলের সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু সূর্য যে দিন যে পথে ভ্রমণ করে গ্রহগণকে সেই দিন সেই পথে, অথবা তাহার সন্নিকটে ভিন্ন খগোলের অন্যত্র দেখা যায় না। (দিনের বেলাতেও

স্থিরতারা এবং গ্রহগণ খগোলে বিরাজিত থাকে, কিন্তু সূর্যের অতি উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাহাদের ক্ষীণ দীপ্তি এত ম্লান হইয়া যায়, যে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না)। (২) স্থিরতারাদিগের জ্যোতি চঞ্চল, কিন্তু বুধ ব্যতীত গ্রহগণের জ্যোতি সাধারণত স্থির। (৩) যে কোন নির্দিষ্ট স্থিরতারা হইতে অপর স্থিরতারা সমূহের দূরত্ব কখন পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু ২।১ দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে গ্রহগণ তাহাদিগের নিকটস্থ কোন স্থিরতারা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। (৪) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগণকে ক্ষুদ্র গোলকাকার দেখায়, এবং স্থিরতারাদিগকে, চতুর্দিকে কিরণ বিকিরণ-কারী আলোকবিন্দু বলিয়া মনে হয়। (৫) উক্ত যন্ত্রের শক্তি বর্ধিত করিলে গ্রহগণকে বৃহত্তর দেখায়, কিন্তু স্থিরতারাদিগের কেবল ঔজ্জ্বল্য বর্ধিত হয়, আকার বর্ধিত হয় না।

তোমরা যদি কোন রাত্রে দুই এক ঘণ্টা ধরিয়া আকাশ পর্যবেক্ষণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে স্থিরতারাদিগের পরস্পরের দূরত্ব নির্দিষ্ট থাকিলেও উহারা যেন একযোগে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতেছে; সূর্যের এই প্রকার গতি তোমরা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছ। সূর্যের ন্যায় অপর স্থিরতারাগুলিকেও পূর্ব দিগন্তে উদিত হইতে, এবং ঘণ্টায় প্রায় ১৫° গতিতে পশ্চিমদিকে চলিয়া প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাইতে দেখা যায়; (অবশ্য যে সকল স্থির তারা দিনমানে অথবা সন্ধ্যার বহু পরে উদিত হয়, তাহাদিগের যথাক্রমে উদয় ও অস্ত দিবাভাগে হয় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না)। তোমরা হয়ত মনে করিবে যে, স্থির তারাগুলি খগোলে যথা-স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং খগোলটি নিয়ত পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ঘুরিতেছে বলিয়া সূর্য এবং অপর স্থির তারাদিগের উক্তরূপ গতি এবং

আর্কটুরাস
উত্তর
শিশুমার
সপ্তর্ষি মণ্ডল
ধ্রুবতারা
পেগেসাস
কশ্যপ
পশ্চিম
পূর্ব
কেপেলা
বিষুব রেখা
বৃষ
কালপুরুষ
লুব্ধক
দক্ষিণ

২ নং চিত্র
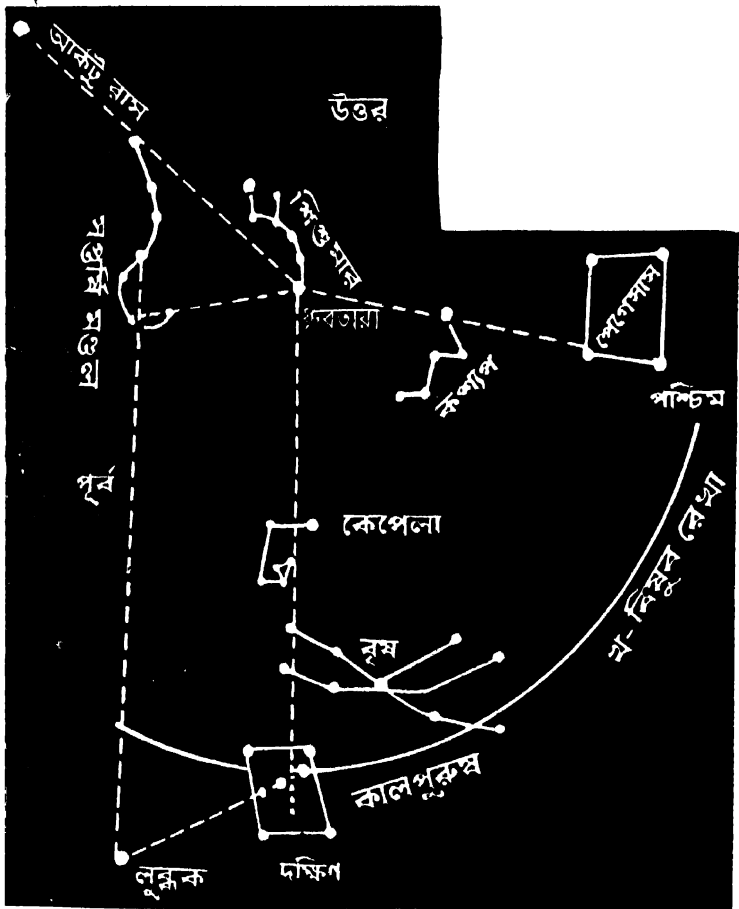
উদয় ও অস্ত দেখা যায়। স্থির তারাগুলি খগোলে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট আছে বটে, তবে খগোল এইরূপে ঘুরিতেছে না, পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে উক্তগতিতে ঘুরিতেছে। ইহাকে পৃথিবীর **আহ্নিকগতি** (Diurnal motion) বলে। ট্রেণে চড়িয়া যাইবার সময় যেমন মনে হয় যে, লাইনের ধারের গাছ-পালা, পাহাড় প্রভৃতি বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেইরূপ পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্য স্থির তারাগণ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর এই আহ্নিকগতির জন্য দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে, এবং সূর্যকে একবার দিগন্তে দেখিবার ২৪ ঘণ্টা পরে পুনরায় সেইস্থানে দেখা যায়, ইহাকে এক **অহোরাত্র** বলে। ঘুরিবার সময় সূর্য যখন পৃথিবীর যে দিকে থাকে সেই দিকে তখন দিন হয়, এবং বিপরীত দিকে রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবী যে একস্থানে দাঁড়াইয়া মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহা নহে, উহা একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া সূর্যকে পরিক্রম করিতেছে; এই পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে (৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন) তাহাকে এক **সৌর-বৎসর** কহে। পৃথিবীর এই গতির নাম **বার্ষিক** (Annual) **গতি**।

এক্ষণে তোমাদিগকে জ্যোতিষ্কসমূহের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব। ইহাদের সহিত পরিচয় হইলে দেখিবে যে জ্যোতিষ্কগণ আমাদিগকে কত প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে। দিক্ নির্ণয়, সময় নির্ণয়, তারিখ নির্ণয়, অক্ষাংশ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আমরা ইহাদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকি।

স্থির তারা ও তারামণ্ডল

'তারা' বলিতে স্থিরতারা, গ্রহ, উপগ্রহ সমস্তই বুঝায়, কিন্তু অতঃপর আমরা কেবল স্থিরতারাদিগকে তারা বা তারকা বলিয়া উল্লেখ করিব। তারাগুলিকে দেখিতে প্রায় একরূপ, সেই জন্য পণ্ডিতগণ কতকগুলি তারা লইয়া এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ এক একটি মূর্ত্তির মধ্যে যে সকল তারা আছে তাহাদিগকে একত্রে **তারামণ্ডল** (Constellations) বলে। মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত কষ্ট-কল্পিত (৩, ৪ ও ৫নং চিত্র দেখ)। তারাগুলিকে আমরা যত ছোট দেখি প্রকৃতপক্ষে তাহারা তত ছোট নহে, খগোলে যে ক্ষুদ্র তারকাটি ঝিকমিক করিতেছে সেটিও সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বড়। অত্যধিক দূরত্বের জন্য উহাদিগকে অত ক্ষুদ্র দেখায়। উজ্জ্বলতা অনুসারে তারাদিগকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; তাহাদের মধ্যে কেবল প্রথম ছয় শ্রেণির তারা নগ্নচক্ষে দেখা যায়, তন্মধ্যে যে কুড়িটি তারা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয় তাহারা প্রথম শ্রেণির তারা। ১নং তালিকা দেখ।

তারাদিগের সহিত পরিচিত হইতে হইলে সর্বাগ্রে তোমাদিগকে **ধ্রুবতারা** চিনিতে হইবে। খগোলের আপাতঘূর্ণন বশত সকল তারাই সূর্যের ন্যায় পূর্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ধ্রুবতারা খগোলের উত্তর মেরুতে অবস্থিত বলিয়া উহাকে কখন সরিয়া যাইতে দেখা যায় না। (দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম-ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে ধ্রুবতারাও একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার ভ্রমণ করিতেছে; তাহার কারণ এই যে, ধ্রুবতারা খগোলের সঠিক উত্তর মেরুতে অবস্থিত নহে; তবে উহা খ-উত্তর মেরুর অপেক্ষাকৃত

এত নিকটে আছে যে, আমরা উহাকে খ-উত্তর মেরুতে অবস্থিত বলিয়া ধরিয়া লই)। পৃথিবীর উত্তরার্ধের যে কোন স্থান হইতে প্রত্যেক রজনীতে ধ্রুবতারাকে সকল সময় একই স্থানে দেখা যায়। যে স্থান হইতে দেখিতেছ, সেই স্থানের অক্ষাংশ যত, দিগন্ত হইতে তত অংশ উর্ধ্বে খ-মধ্য রেখার উপর ধ্রুবতারাকে দেখিতে পাইবে। ভূ-বিষুবরেখার উপর হইতে ধ্রুবতারাকে দিগন্তের উপর দেখা যায়, এবং পৃথিবীর যত উত্তরাংশে অগ্রসর হইবে, উহার উন্নতি তত অংশ বাড়িতে থাকিবে। কলিকাতার অক্ষাংশ প্রায় ২২½ ডিগ্রি, সুতরাং কলিকাতা হইতে ধ্রুবতারাকে উত্তর দিগন্তের ২২½ অংশ উর্ধ্বে খ-মধ্যরেখার উপর দেখা যায়। পৃথিবীর দক্ষিণার্ধ হইতে ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না।

ধ্রুবতারার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে একস্থানে জিজ্ঞাসার চিহ্নের (?) আকারে সাতটি উজ্জ্বল তারা সাজান আছে দেখিতে পাইবে। এই তারামণ্ডলটির নাম **সপ্তর্ষিমণ্ডল** (Ursa Major বা Great Bear)। বৈশাখ মাসে রাত্রি নয়টার সময় সপ্তর্ষিমণ্ডলকে খ-মধ্য রেখার উপর দেখা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথার তারা দুইটিকে **কাঁটা** বা **নির্দেশক তারা** (Pointer stars) বলে, কারণ উহাদিগকে কাল্পনিক রেখাদ্বারা যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে ধ্রুবতারার সহিত মিলিত হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত একবার পরিচিত হইলে, আর কখন তাহাকে ভুলিবে না। এখন যদি কেহ রাত্রে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে কোন্‌টি উত্তর দিক, অথবা পৃথিবীর যে স্থান হইতে দেখিতেছ তাহার অক্ষাংশ কত, তাহা হইলে প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং নির্দেশক তারা দুইটির সাহায্যে ধ্রুব-তারাকে চিনিয়া লইবে। তোমার যে দিকে ধ্রুবতারা আছে সেইটিই

উত্তর দিক এবং ধ্রুবতারা দিগন্ত হইতে যত অংশ উর্ধ্বে অবস্থিত, তাহা সেই স্থানের অক্ষাংশের সমান।

ধ্রুবতারার যেদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত তাহার বিপরীত দিকে, এবং প্রায় সমদূরে পাঁচটি তারা ইংরাজী অক্ষর "W"এর আকারে সাজান আছে দেখিবে। এই তারামণ্ডলের নাম **কশ্যপ** (Cassiopeia)। এই তারামণ্ডলকে কার্ত্তিকমাসে রাত্রি ৯টার সময় খ-মধ্য রেখায় দেখিতে পাইবে।

এইবার আমরা যে তারামণ্ডলের নাম করিব, ধ্রুবতারা সেই মণ্ডলের অন্তর্গত। ইহার অবশিষ্ট তারাগুলির দীপ্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় ধ্রুবতারাকে লইয়া ইহার মধ্যেও সাতটি তারা আছে, কিন্তু তাহারা ইংরাজী অক্ষর "F"এর আকারে সাজান। এই তারামণ্ডলের নাম **শিশুমার** (Ursa Minor বা Little Bear)।

খগোলে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারামণ্ডলের নাম **কালপুরুষ** (Orion)। ২ ও ৩নং চিত্র দেখ। ইহাকেও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় একবার চিনিলে আর ভুলিবে না। খ-বিষুবরেখার নিকটে এই তারামণ্ডলটি অবস্থিত। মাঘ মাসে রাত্রি ৯টার সময় ইহাকে খ-মধ্যরেখায় দেখিতে পাইবে। এই মণ্ডলে প্রধানত দশটি তারা আছে, তন্মধ্যে চারিটি তারা ট্রাপিজিয়মের আকারে সাজান। ট্রাপিজিয়মের মধ্য ভাগে এক সরল রেখায় তিনটি তারা পাশাপাশি অবস্থিত, আর তিনটি তারা পূর্বোক্ত সরল রেখার সহিত সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করিয়া পাশাপাশি সাজান আছে। ট্রাপিজিয়মটিকে কালপুরুষের শরীর, প্রথম তিনটি তারাকে উহার কোমরবন্ধ, এবং শেষোক্ত তারা তিনটিকে উহার ছোরা কল্পনা করা হইয়াছে। কালপুরুষের ছোরার তারা তিনটিও দিগ্দর্শন যন্ত্রের কার্য করে, কারণ তারা তিনটিকে যোগ

করিয়া বাড়াইয়া দিলে উহা ধ্রুবতারার সহিত মিলিত হইবে। ট্রাপিজিয়মের যে তারাটি কালপুরুষের বাম পদ গঠন করিয়াছে, সেই তারাটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল; ইহার নাম **রাইগেল** (Rigel)। যে তারাটি কালপুরুষের দক্ষিণ হস্তে অবস্থিত তাহাও একটি প্রথম শ্রেণির তারা, ইহার নাম **বিটেলগার্জ** (Betelgeux)।
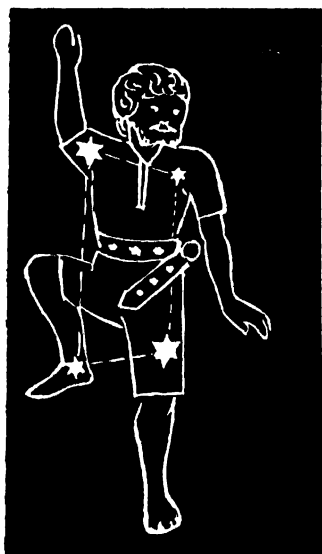
৩নং চিত্র

কালপুরুষের ছোরা ও ধ্রুব তারাকে সোজা যোগ করিয়া যে চাপ (arc) পাওয়া যায়, তাহার উপর, উক্ত ছোরা ও ধ্রুবতারা হইতে প্রায় সমদূরে একটি প্রথম শ্রেণির উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে, ইহার নাম **কেপেলা** (Capella), এই তারাটি যে মণ্ডলের অন্তর্গত তাহার নাম **অরিগা** (Auriga)। মাঘ মাসে অরিগাকে রাত্রি ৯টার সময় খ-মধ্য রেখার উপর দেখিতে পাইবে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২য় এবং ৪র্থ তারা দুইটি যোগ করিয়া দক্ষিণ দিকে, এবং কালপুরুষের কোমরবন্ধের তারা তিনটি যোগ করিয়া পূর্বদিকে বাড়াইয়া দিলে রেখাদ্বয় যে স্থানে মিলিত হইবে, তথায় একটি অতি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে, ইহার নাম **লুব্ধক** (Sirius)। সূর্যকে বাদ দিলে ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল কোন তারা আকাশে নাই।

লুব্ধক এবং আরও ৮।৯টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তারা লইয়া **কেনিস মেজর** (Canis Major) নামক তারামণ্ডল গঠিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় এই তারামণ্ডলকে খ-মধ্য রেখার নিকট দেখা যায়।

ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ তারাটি যোগ করিয়া বাড়াইয়া দাও। ধ্রুবতারা হইতে শেষোক্ত তারাটি যত দূরে অবস্থিত, শেষোক্ত তারাটি হইতে তত দূরে, উক্ত রেখার উপর একটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে, ইহার নাম **আর্কটুরাস** (Arcturus) ; ইহা যে তারামণ্ডলের অন্তর্গত তাহার নাম **বুওটেজ** (Bootes)। জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রি ৯টার সময় ইহাকে খ-মধ্য রেখার নিকট দেখা যায়।

ধ্রুবতারা ও কশ্যপের শেষ তারা যোগ করিয়া সমান দূর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিলে প্রায় সমচতুষ্কোণের আকারে সাজান চারিটি তারার একটি মণ্ডল দেখিতে পাইবে, ইহার নাম **পেগেসাস্** (Pegasus)। কার্ত্তিক মাসে রাত্রি ৯টার সময় এই তারামণ্ডলটিকে খ-মধ্য রেখার উপর দেখা যায়।

সূর্য স্থির তারা হইলেও, উহাকে অন্য স্থির তারার নিকট হইতে দৈনিক প্রায় ১° হারে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিয়া যাইতে দেখা যায়, সূর্যের এই বার্ষিক গতি যে পথে হয়, তাহার নাম **ক্রান্তিবৃত্ত** (Ecliptic)। ১নং চিত্র দেখ। ক্রান্তিবৃত্তের পরিধিকে সমান ১২ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের মধ্যে যে তারাগুলি অবস্থিত আছে, তাহাদিগকে লইয়া এক একটি মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এই তারামণ্ডলগুলির নাম যথাক্রমে **মেষ** (Aries), **বৃষ** (Taurus), **মিথুন** (Gemini), **কর্কট** (Cancer), **সিংহ** (Leo), **কন্যা** (Virgo), **তুলা** (Libra), **বৃশ্চিক** (Scorpio), **ধনু** (Sagittarius), **মকর** (Capricornus), **কুম্ভ** (Aquarius), এবং **মীন** (Pisces)। পৃথিবী

হইতে অন্য গ্রহ এবং চন্দ্রকে, এই বারটি তারামণ্ডলের মধ্যে কোন একটির গায়ে দেখা যায়। এই তারামণ্ডলদিগকে **রাশি** (Constellation of Zodiac) কহে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি মাসে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যথাক্রমে সিংহ, কন্যা প্রভৃতি রাশিকে খ-মধ্যরেখার উপর দেখিতে পাইবে।

ধ্রুবতারা ও পেগেসাসকে একটি কাল্পনিক রেখাদ্বারা যোগ কর, শেষোক্ত তারামণ্ডল হইতে উক্ত রেখার উপর লম্ব টানিয়া ক্রান্তিবৃত্তের দিকে বাড়াইয়া দাও। ইহা যে স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত মিলিত হইবে সেই স্থান অন্বেষণ করিলে, একত্রে তিনটি তারা দেখিতে পাইবে। ইহার নাম **মেষ তারামণ্ডল**।

কালপুরুষের কোমরবন্ধ পশ্চিম দিকে সামান্য কিছুদূর বাড়াইয়া দিলে উহা একটি অত্যুজ্জ্বল লোহিত বর্ণের তারাকে স্পর্শ করিবে। এই তারাটির নাম **অল্‌ডেবরণ** (Aldebaran) ; এই তারাটি যে মণ্ডলের অন্তর্গত তাহার নাম **বৃষ**।

বৃষের পূর্বদিকে ছায়াপথের গায়ে দুইটি সম-উজ্জ্বল তারা পাশাপাশি দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের নিকটে আরও চারিটি ক্ষুদ্র তারকা আছে, ইহাকে **মিথুন** তারামণ্ডল বলে, মিথুনের উজ্জ্বল তারা দুইটির নাম **ক্যাষ্টর** (Castor) ও **পোলাক্‌** (Pollux)।

মিথুনের পূর্বদিকে **কর্কট** তারামণ্ডল অবস্থিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র তারার একটি পুঞ্জ এই মণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত, সেই জন্য কর্কটকে চিনিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

কর্কটের পূর্বাবস্থিত তারামণ্ডলের নাম **সিংহ**। ৪নং চিত্র দেখ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নির্দেশক তারা দুইটি যোগ করিয়া দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া দিলে, উহা যে স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত মিলিত হইবে তথায়

একটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে, তাহার নাম **রেগুলাস** (Regulus) ; এই তারাটি সিংহ তারামণ্ডলের অন্তর্গত।

সিংহকে চিনিলে **কন্যা** মণ্ডলকে সহজেই চেনা যায়, কারণ ইহার
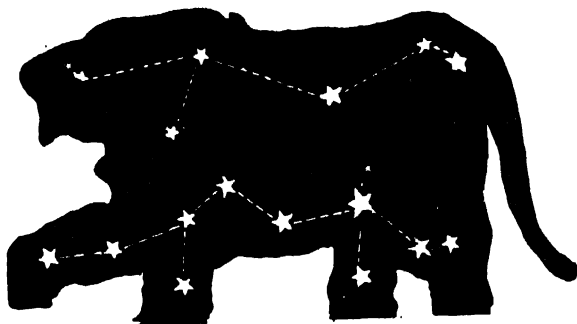
৪নং চিত্র

মধ্যে **স্পাইকা** (Spica) নামক একটি অত্যুজ্জ্বল তারা আছে। ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ষষ্ঠ তারা যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে উহা স্পাইকার সহিত মিলিত হইবে।

কন্যার পূর্বাবস্থিত তারামণ্ডলের নাম **তুলা**। ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ তারা যোগ করিয়া আর্কটুরাসের উপর দিয়া বাড়াইয়া দিলে উহা ক্রান্তিবৃত্তের অন্তর্গত তুলামণ্ডলকে স্পর্শ করিবে।

তুলার পূর্বদিকে যে তারামণ্ডল দেখা যায় তাহার নাম **বৃশ্চিক**। ৫নং চিত্র দেখ। **এণ্টারিস** (Antares) নামক একটি অতি উজ্জ্বল লোহিতাভ বর্ণের তারা এই মণ্ডলের অন্তর্গত। সিংহের রেগুলাস ও কন্যার স্পাইকা নামক তারাদ্বয় যোগ করিয়া পূর্বাভিমুখে বাড়াইয়া দিলে উহা এণ্টারিসকে স্পর্শ করিবে।

বৃশ্চিকের পূর্বে **ধনু** নামক তারামণ্ডল আছে। এই মণ্ডলটিও ছায়াপথের উপরে অবস্থিত।

অভিজিৎ ও অলটেয়ার নামক তারাদ্বয় যোগ করিয়া (নিম্নে দেখ) ক্রান্তিবৃত্তের দিকে বাড়াইয়া দিলে উহা যে তারামণ্ডলে উপস্থিত হয় তাহার নাম **মকর**।
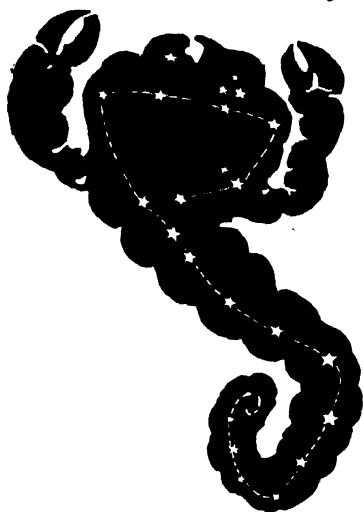
৫নং চিত্র

মকরের পূর্ববর্তী তারামণ্ডল দুইটির নাম যথাক্রমে **কুম্ভ** ও **মীন**।

কন্যার দক্ষিণে চারিটি অত্যুজ্জ্বল তারার একটি মণ্ডল আছে, তাহার নাম **দক্ষিণ ক্রুস** (Southern cross)। ইহার মধ্যে দুইটি প্রথম শ্রেণির উজ্জ্বল তারা আছে।

ধ্রুবতারা ও ধনুর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটি যোগ করিয়া যে কাল্পনিক রেখা পাওয়া যায় তাহার মধ্যবিন্দুতে একটি অত্যুজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে, এই তারাটির নাম **অভিজিৎ** (Vega)। ইহা **লাইরা** (Lyra) নামক তারামণ্ডলের অন্তর্গত।

অভিজিৎ ও পেগেসাসের মধ্যে পাঁচটি তারার একটি মণ্ডল দেখিতে পাইবে। ইহার নাম **সিগনাস** (Cygnus)। ধ্রুবতারা ও সিগনাসকে যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে ইহা **অলটেয়ার** (Altair) নামক একটি প্রথম শ্রেণির উজ্জ্বল তারাকে

স্পর্শ করিবে। উহা **আকুইলা** (Aquila) নামক তারামণ্ডলের অন্তর্গত।

যে সকল তারা ও তারামণ্ডলের নাম করা হইল তাহা ব্যতীত যে আরও কত তারা ও তারামণ্ডল আছে তাহার স্থিরতা নাই। ২নং চিত্রখানিকে মাথার উপর ধরিয়া দেখিলে মাঘ মাসের (রাত্রি ৯টায়) আকাশের চিত্র দেখিতে পাইবে। পূর্ববর্ণিত তারা ও তারামণ্ডলগুলিকে অন্যান্য মাসে খ-মধ্যরেখার উপর দেখিতে হইলে পরবর্তী মাসে দুই ঘণ্টা পূর্বে, এবং পূর্ববর্তী মাসে দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে হইবে, এইরূপে যদি কোন সময় দিবাভাগে পড়ে তাহা হইলে সূর্যালোক বশত তারামণ্ডলগুলিকে আর দেখিতে পাইবে না। যেমন বৃষ তারামণ্ডলকে মাঘ মাসে রাত্রি ৯টার সময় খ-মধ্যরেখায় দেখা যায়, ফাল্গুন মাসে উহাকে রাত্রি ১১টার সময়, এবং পৌষ মাসে সন্ধ্যা ৭টার সময় উহাকে উক্ত রেখায় দেখিতে পাইবে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা দিবাভাগে খগোলে বিরাজিত থাকে বলিয়া দেখা যাইবে না। যে দিন যে তারাকে যে সময় খ-মধ্য রেখার উপর দেখিতে পাইবে সেই দিন তাহার এক ঘণ্টা পরে উক্ত রেখার প্রায় ১৫° পশ্চিমে, এবং এক ঘণ্টা পূর্বে উক্ত রেখার প্রায় ১৫° পূর্বদিকে সেই তারাটিকে দেখা যাইবে। এখন বোধ হয় তোমরা বৎসরের প্রত্যেক দিন কোথায় কোন্ তারাটিকে দেখা যাইবে তাহা বাহির করিতে পারিবে।

রাশিচক্রস্থ তারামণ্ডলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একাধিকবার "ছায়াপথ" কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ছায়াপথ কাহাকে বলে জান? মেঘমুক্ত আকাশে (বিশেষত অমাবস্যার দিন) অনতিবিস্তৃত একটি শুভ্র উজ্জ্বল পেটিকে সমস্ত আকাশ ঘিরিয়া থাকিতে দেখা যায়, এই পেটির নাম **ছায়াপথ** (Milky Way)।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে, ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি।

তারকা ব্যতীত আকাশে কতকগুলি ছোট ছোট মেঘের ন্যায় দাগ দেখা যায়, তাহাদিগের নাম **নীহারিকা** (Nebula)। কালপুরুষের পূর্বাংশে তোমরা একটি পরিষ্কার নীহারিকা দেখিতে পাইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সকল নীহারিকা হইতে জ্যোতিষ্কগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রহ ও গ্রহ-জগৎ

তারার ন্যায় উজ্জল দেখাইলেও গ্রহগণ উহাদিগের ন্যায় জ্বলন্ত বস্তু নহে, রৌদ্র পড়িলে পৃথিবীকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ অপর গ্রহের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া তাহাদিগকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে। তোমরা জান যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে এবং এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্যকে একবার পরিক্রম করিয়া আসিতেছে। এই পথকে পৃথিবীর **কক্ষ** (Orbit) কহে। কেবল পৃথিবী নহে, সমস্ত গ্রহই এইরূপে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে এবং নির্দিষ্ট কক্ষ ধরিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে পরিক্রম করিতেছে।

পৃথিবী ব্যতীত অপর গ্রহদিগকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে সকল গ্রহ সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষের মধ্যে থাকিয়া সূর্যকে পরিক্রম করে তাহাদিগের নাম **অন্তর্গ্রহ** (Inferior planets), এবং যে সকল গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমকালে কখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী হয় না, অর্থাৎ সর্বদাই পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে থাকে তাহাদিগকে **বহির্গ্রহ** (Superior planets) কহে। উপস্থিত আমরা দুইটি

অন্তর্গ্রহ এবং ছয়টি বহির্গ্রহের বিষয় জানি। অন্তর্গ্রহ দুইটির নাম বুধ (Mercury) ও শুক্র (Venus)। গ্রহাণুপুঞ্জ ব্যতীত
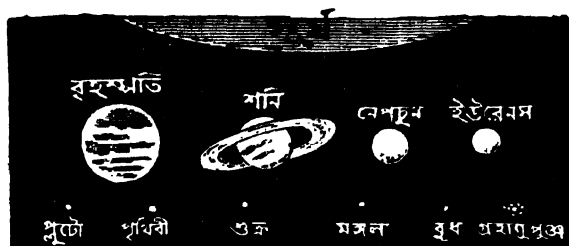
৬নং চিত্র

বহির্গ্রহগুলির নাম মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনস (Uranus), নেপচুন (Neptune), এবং প্লুটো (Pluto)।

এইবার তোমাদিগকে গ্রহগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব। একখানি বিশুদ্ধ পঞ্জিকা লইয়া দেখ কোন্ গ্রহ এক্ষণে কোন্ রাশিতে অবস্থিত। যদি তোমরা বারটি রাশিকে ঠিক করিয়া চিনিয়া থাক, তাহা হইলে গ্রহগুলিকে চিনিতে কষ্ট হইবে না, কারণ তোমরা জান যে, গ্রহগণকে সর্বদা কোন না কোন রাশির গাত্রে দেখা যায়।

বুধ ও শুক্র। অন্তর্গ্রহ দুইটিকে কখনও সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে পূর্বদিগন্তের অল্প ঊর্ধ্বে, কখনও বা সূর্যাস্তের কিছু পরে পশ্চিম দিগন্তের অল্প ঊর্ধ্বে দেখা যায়, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে বা খগোলের অন্য কোন অংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় বলিয়া, এবং ইহাদিগের ঔজ্জ্বল্যের জন্য

ইহাদিগকে চিনিবার পক্ষে তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে না, অধিকন্তু বুধের ফিকা ধূসর বর্ণ ও শুক্রের পীতাভ বর্ণ গ্রহ দুইটিকে চিনিবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। ইহাদের কোন উপগ্রহের বিষয় জানা যায় নাই। বুধ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রহ এবং সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। ইহার একদিনে এক বৎসর হয়, অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণন একবার সমাপ্ত করিতে যত সময় লাগে সূর্যকে একবার পরিক্রম করিতে ঠিক তত সময় লাগে। শুক্রকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা গেলে, **শুক তারা** এবং সূর্যাস্তের পরে দেখা গেলে, **সন্ধ্যাতারা** বলা হয়। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যানুসারে ইহার স্থান সূর্য ও চন্দ্রের পরেই, সুতরাং ইহা লুব্ধক তারা অপেক্ষাও উজ্জ্বল।

পৃথিবী। সূর্য হইতে দূরত্বানুসারে পৃথিবীর স্থান তৃতীয়। এই গ্রহটির সহিত আমাদিগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কারণ ইহাই আমাদিগের জন্মস্থান ও বাসস্থান। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯১৮ মাইল এবং পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল।

মঙ্গল। শুক্রের ন্যায় অত উজ্জ্বল না হইলেও মঙ্গলের সম্বন্ধে যত কথা জানা গিয়াছে, আর কোন গ্রহের সম্বন্ধে অত কথা জানা যায় নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার গাত্রে যে সকল রেখাদি দেখা যায়, তদ্দ্বারা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর ন্যায় এই গ্রহেও জল, স্থল ও বায়ু আছে, ইহারও মেরুপ্রদেশ তুষারাবৃত এবং বিষুবপ্রদেশ উত্তপ্ত। এককথায় মঙ্গল গ্রহ, উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। এই গ্রহটির বর্ণ লোহিতাভ, এবং ইহার দুইটি উপগ্রহ আছে।

গ্রহাণুপুঞ্জ। মঙ্গলের পর প্রায় তিন শত ক্ষুদ্র গ্রহ পুঞ্জাকারে থাকিয়া সূর্যকে পরিক্রম করে, ইহাদিগের নাম গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)।

বৃহস্পতি। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উজ্জ্বলতা

অনুসারে ইহার স্থান শুক্রের পরেই। ইহার বর্ণ রৌপের ন্যায় শুভ্র। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে, উহার বিষুবরেখায় সমান্তরাল কতকগুলি পেটি দেখা যায়, ইহাদিগকে বৃহস্পতির কোমরবন্ধ বলে, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতার প্রধান কারণ সূর্যকিরণ, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে গ্রহটির নিজেরও সামান্য আলোক আছে, কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইহার নয়টি উপগ্রহ আছে।

শনি। শনি হরিদ্রাভ বর্ণের গ্রহ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে শনিকে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখায়, কারণ ইহার বিষুবদেশ বেষ্টন করিয়া, গ্রহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বলয় (ring) আছে ; একটি বলয়ের ন্যায় দেখাইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা কতকগুলি বলয়ের সমষ্টি। এই বলয়গুলি গ্রহের গোলকাংশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, কিন্তু প্রত্যেক বলয়ের উজ্জ্বলতার তারতম্য আছে। ইহারা বোধ হয় ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য উপগ্রহ। বৃহস্পতির ন্যায় শনির গাত্রেও কোমরবন্ধ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বৃহস্পতির কোমরবন্ধের ন্যায় পরিস্ফুট নহে। এই গ্রহের নয়টি উপগ্রহ আছে।

ইউরেনস। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হর্সেল সাহেব ইউরেনস গ্রহ আবিষ্কার করেন, তৎপূর্বে গ্রহটিকে স্থির তারা বলিয়া ধরা হইত। দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ না থাকিলে তোমরা এই গ্রহটিকে নগ্নচক্ষে দেখিতে পাইবে না। ইহার বর্ণ ফিকা সবুজ। ইউরেনসের চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নেপচুন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। নগ্নচক্ষে এই গ্রহ দেখা যায় না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে একটি উজ্জ্বল বিন্দু বলিয়া মনে হয়। ইহার একটিমাত্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্লুটো। সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা অধিকদূরে অবস্থিত নবাবিষ্কৃত

গ্রহের নাম প্লুটো। ইহার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। গ্রহজতে আরও কোন গ্রহ আছে কিনা কে জানে ?

গ্রহগণের ব্যাস, এবং সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব এত অধিক যে উহার কল্পনা করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। (২নং তালিকা দেখ)। নিম্নে তুলনামূলক একটি তালিকা দেওয়া হইল, ইহাদ্বারা গ্রহগণের আকার ও তাহাদের সূর্য হইতে দূরত্ব বেশ কল্পনা করিতে পারিবে। সূর্য যদি ২ ফিট ব্যস বিশিষ্ট একটি গোলক হয়, তাহা হইলে,

বুধ	সূর্য হইতে	৮২ ফিট দূরে অবস্থিত	সরিষা	আকারের	গোলক
শুক্র	,,	১৪২	মটর কড়াই	,,	,,
পৃথিবী	,,	২১৫	মটর কড়াই	,,	,,
মঙ্গল	,,	৩৩৭	পায়রামটর	,,	,,
গ্রহাণুপুঞ্জের গ্রহ		৫৫০	বালুকা	,,	,,
বৃহস্পতি	,,	$\frac{1}{4}$ মাইল	কমলালেবু	,,	,,
শনি	,,	$\frac{2}{5}$	ছোট কমলালেবু	,,	,,
ইউরেনস	,,	$\frac{3}{4}$	সুপারি	,,	,,
নেপচুন	,,	১$\frac{1}{4}$ মাইল	কুল	,,	,,

গ্রহগণ নির্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে পরিক্রম করে। এই কক্ষ গুলিকে সাধারণত বৃত্তাকার ধরা হয়, কিন্তু ইহারা ঠিক বৃত্তাকার নহে ; কক্ষদিগের আকার উপবৃত্তের ন্যায়। সূর্য এই সকল উপবৃত্তের নাভিতে (Focus) অবস্থিত। গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষ ধরিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করে। উপবৃত্তের নাভি উহার কেন্দ্রের একপার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া, সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব, উহাদের বৎসরের সকল সমান থাকে না।

সূর্যকে একবার পরিক্রম করিতে গ্রহগণের যে সময় লাগে তাহা নির্দিষ্ট, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। গ্রহগণের নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘূর্ণন সমাপ্ত করিবারও সময় নির্দিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত সময়কে গ্রহগণের এক **সৌর বৎসর** এবং শেষোক্ত সময়কে গ্রহগণের এক **অহোরাত্র** বলে। (৩নং তালিকা দেখ)।

রাশিচক্রের অন্তর্গত তারা মণ্ডলের এক একটির গাত্রে প্রত্যেক গ্রহকে উহাদের সৌর বৎসরের $\frac{১}{১২}$ সময় দেখিতে পাইবে। শনির বৎসরের পরিমাণ, আমাদিগের অনুসারে প্রায় ২৯ বৎসর, সুতরাং শনিকে উক্ত তারা মণ্ডলের প্রত্যেকটিতে $\frac{২৯}{১২} = ২\frac{৫}{১২}$ বৎসর, অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পাঁচ মাস ধরিয়া দেখিতে পাইবে।

পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও গ্রহদিগকে খগোলে ক্রান্তিবৃত্তের সন্নিকটে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। যখন চন্দ্র বা কোন গ্রহ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন চন্দ্রের বা সেই গ্রহের **নিম্নসংযোগ** (Inferior Conjunction) হয়। সূর্য যখন পৃথিবী এবং কোন গ্রহের মধ্যে অবস্থিত হয় সেই সময় সেই গ্রহকে **উচ্চসংযোগে** (Superior Conjunction) অবস্থিত বলে। পৃথিবী যখন চন্দ্র বা কোন গ্রহ ও সূর্যের মধ্যস্থ হইয়া থাকে তখন চন্দ্রের বা সেই গ্রহের অবস্থানকে **প্রতিযোগ** (Opposition) কহে। চন্দ্রের উচ্চসংযোগ, বহির্গ্রহের নিম্ন সংযোগ, এবং অন্তর্গ্রহের প্রতিযোগ কখন হইতে পারে না।

গ্রহগণ সকল সময় একাভিমুখে সূর্যকে পরিক্রম করিতেছে, আমরা কিন্তু কোন গ্রহকে কখন কখন বিপরীত মুখে চলিতে দেখি, ইহার নাম **আপাত প্রতীপগতি** (Apparent retograde motion)। মনে কর, কোন গ্রহকে মেষ তারামণ্ডলে দেখা গেল, কিছুদিন পরে

সেই গ্রহটি বৃষ তারামাণ্ডলে উপস্থিত হইবে, এইরূপে গ্রহটি পর পর রাশির উপর দিয়া, তাহাদিগের একবৎসর পরে পুনরায় মেষ তারামণ্ডলে উপস্থিত হইবে; কিন্তু ৭নং চিত্রে দেখ, পৃথিবী যখন ক বিন্দুতে, তখন

৭নং চিত্র
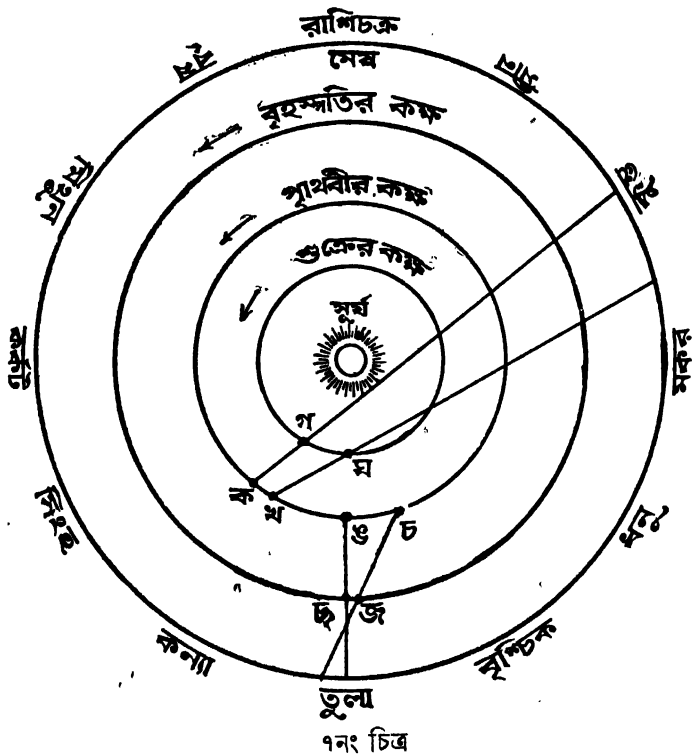
শুক্র গ বিন্দুতে অবস্থিত, এবং পৃথিবী হইতে শুক্রকে কুম্ভরাশিতে দেখা যাইতেছে, পৃথিবী যখন ক হইতে খ বিন্দুতে উপস্থিত হইল, শুক্র তখন গ হইতে ঘ বিন্দুতে উপস্থিত হইয়াছে। ক খ এর দূরত্ব গ ঘ এর

দূরত্ব অপেক্ষা অল্প, কারণ শুক্রের বার্ষিকগতি পৃথিবীর বার্ষিকগতি অপেক্ষা অধিক। এই অবস্থায় শুক্রকে পরবর্তী মীনের দিকে না দেখিয়া, পূর্ববর্তী মকরমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে শুক্রের আপাত প্রতীপগতি হইয়াছে। উক্তচিত্রে বৃহস্পতিরও আপাত প্রতীপগতি দেখান হইয়াছে। বহির্গ্রহগণের প্রতিযোগ কালে এবং অন্তর্গ্রহগণের নিম্নসংযোগকালে উহাদিগের প্রতীপগতি দেখা যায়।

সূর্য

এইবার আমরা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সূর্যের বিষয় আলোচনা করিব। সূর্য পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ স্থিরতারা এবং ইহার সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

নগ্নচক্ষে সূর্যকে প্রায় ৬″ ব্যাস বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণের একখানি মসৃণ চাকৃতির ন্যায় দেখায়; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা অত ছোট নহে, মসৃণ নহে, এবং চাকৃতির ন্যায়ও নহে। সূর্য প্রায় ৮৬৬৫০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট একটি বিরাট গোলক। পৃথিবী হইতে বহু দূরে আছে বলিয়া উহাকে অত ছোট দেখায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, সূর্যের পৃষ্ঠদেশ মসৃণ নহে; ইহা বহুসংখ্যক উচ্চ ঢিবিতে পূর্ণ। এই ঢিবিগুলি ২।৩ লক্ষ মাইল দীর্ঘ লেলিহান অগ্নিশিখা; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ যে সূর্য একটি জ্বলন্ত বস্তু।

সূর্যের মধ্যে চারিটি স্তর আছে। অভ্যন্তরের স্তরটি ঘনীভূত গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত, ইহার নাম **অন্তস্থল** (Core), ইহা সূর্যের আলোক ও উত্তাপের উৎপত্তিস্থল, এই অংশকে আমরা কিন্তু দেখিতে পাই না; ইহার বাহিরের স্তরটির নাম **আলোকস্তর** (Photo

sphere), ইহাকে সূর্যপৃষ্ঠ বলে; আলোকস্তরকে বেষ্টন করিয়া যে স্তর আছে, তাহার নাম **বর্ণস্তর** (Chromo sphere), এই স্তরটি প্রায় পাঁচ হাজার মাইল স্থূল; এই স্তরের বাহিরে ২।৩ লক্ষ মাইল ব্যাপী **অগ্নিশিখার** স্তর (Corona) আছে।

পৃথিবী হইতে সূর্যের স্বল্পতম দূরত্ব ৯১৪০৬০০০ মাইল, অধিকতম দূরত্ব ৯৪৫২৪০০০ মাইল এবং গড় দূরত্ব ৯২৯৬৫০০০ মাইল। সূর্যের ব্যাস ৮৬৬৫০০ মাইল এবং ইহার পরিধির পরিমাণ প্রায় ২৭ লক্ষ মাইল। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল ২২৮৩৬২১৪৬৬ হাজার বর্গ মাইল, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের প্রায় ১২০০০ গুণ। ইহাদ্বারা কতক পরিমাণে অনুমাণ করা যায় যে সূর্য কত প্রকাণ্ড।

ঋতু

তোমরা আষাঢ় মাসের দারুণ গ্রীষ্ম এবং পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীত অনুভব করিয়াছ, এবং আশ্বিন ও চৈত্র মাসে শরৎ ও বসন্তের নাতি-শীতোষ্ণ তাপ উপভোগ করিয়াছ। বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর এই প্রকার তাপের পার্থক্যকে ঋতু-পরিবর্তন কহে। গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত এবং বসন্ত এই চারিটি প্রধান ঋতু। ভূ-পৃষ্ঠের তাপের তারতম্যের দুইটি প্রধান কারণ আছে। **প্রথমত,** পৃথিবীর যেস্থানে সূর্যকিরণ যখন লম্বভাবে পতিত হয়, সেই স্থান তখন অধিক তাপ প্রাপ্ত হয়, এবং যেস্থানে উহা যত তির্যক্‌ভাবে পতিত হয়, সেই স্থান তখন তত অল্প উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **দ্বিতীয়ত,** পৃথিবী দিবাভাগে সূর্য হইতে তাপ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উক্ত তাপ বিকিরণ করে, অতএব বৎসরের যখন যে স্থানের দিনমান অধিক

সেই স্থান অধিক তাপ প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানের দিনমান অল্প সেই স্থানের তাপের পরিমাণও অল্প হইয়া থাকে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য, এবং উহার মেরুদণ্ডের হেলনের জন্য বিভিন্ন স্থানে উক্ত দুই প্রকার বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

তোমরা জান যে পৃথিবী তাহার নির্দিষ্ট কক্ষ অনুসরণ করিয়া
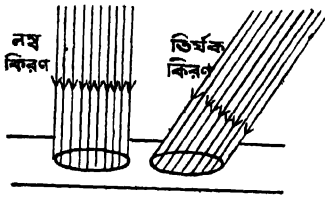
৮নং চিত্র

৩৬৫¼ দিনে সূর্যের চারিদিকে একবার পরিক্রম করিয়া থাকে, এবং পৃথিবীর মেরুদণ্ড কক্ষের উপর লম্বভাবে না থাকিয়া উহার সহিত ৬৬°৩২′ কোণ উৎপন্ন করিয়া একদিকে হেলিয়া আছে। এই প্রকার হেলনের একটি বিশেষত্ব এই যে, সূর্যকে পরিক্রম করিতে করিতে কক্ষের যে কোন স্থানে উপস্থিত হউক না কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের মেরুদণ্ডগুলি পরস্পর সমান্তরাল থাকে। ৯নং চিত্র দেখ। পৃথিবী ১০ই আষাঢ় যখন 'ক' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয় তখন উহার সুমেরু (উ), এবং ১০ই পৌষ যখন 'গ' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয় তখন উহার কুমেরু (দ), সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা হেলিয়া থাকে, ১০ই আশ্বিন এবং ১০ই চৈত্র পৃথিবী যথাক্রমে 'খ' ও 'ঘ' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইলে, উহার উভয় মেরু সূর্য হইতে সমান দূরে থাকে। 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত স্থানে পৃথিবী যখন অবস্থিত হয়, তখন যথাক্রমে

২৩°২৮′ উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের উপর এবং 'খ' ও 'ঘ' চিহ্নিত স্থানে অবস্থান কালে বিষুবরেখার উপর সূর্যকিরণ লম্ব ভাবে পতিত হইয়া থাকে। 'ঘ' হইতে 'ক'এ, এবং 'ক' হইতে 'খ' এ গমন করিতে পৃথিবীর যে তিন মাস করিয়া সময় লাগে, সেই সময়ে উহার উত্তরার্ধে

৯নং চিত্র
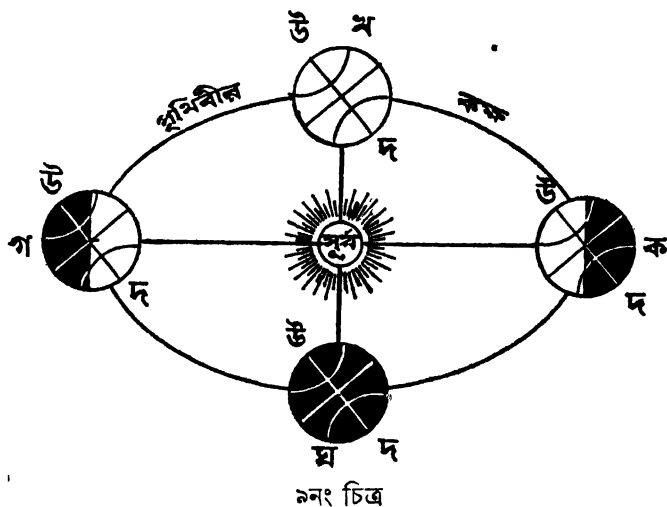
কোন না কোন স্থানে সূর্য লম্বভাবে কিরণপাত করে; সেইরূপ 'খ' হইতে 'গ'এ এবং 'গ' হইতে 'ঘ'এ গমন কালে উহার দক্ষিণার্ধে কোন না কোন স্থানে লম্বভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয়। 'খ' ও 'ঘ'এ অবস্থান কালে পৃথিবীর উভয় মেরু সূর্য হইতে সমদূরে থাকে বলিয়া ঐ দুই দিনকে যথাক্রমে জলবিষুব (Autumnal Equinox) এবং মহাবিষুব (Vernal Equinox) বলে, এই সময় পৃথিবীর অধিবাসিগণ যথাক্রমে শরৎ এবং বসন্ত ঋতু উপভোগ করিয়া থাকে।

'ঘ' হইতে 'ক'এ গমনকালে পৃথিবীর **উত্তরার্ধে** দিনমান ক্রমশ

অধিক হইতে আরম্ভ করিয়া, পৃথিবী ১০ই আষাঢ় যখন 'ক'এ উপস্থিত হয় তখন উহা সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। 'ক' হইতে 'খ'এ গমন কালে উত্তরার্ধে দিনমান ক্রমশ অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী ১০ই আশ্বিন যখন 'খ'এ উপস্থিত হয়, তখন সবত্র দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়। 'খ' হইতে 'গ'এ গমনকালে উত্তরার্ধে দিনমান ক্রমশ কমিতে থাকে, এবং পৃথিবী ১০ই পৌষ যখন 'গ' এ উপস্থিত হয় উত্তরার্ধের দিনমান সর্বাপেক্ষা অল্প হয়। 'গ' হইতে 'ঘ'এ গমনকালে উত্তরার্ধে দিনমান আবার ক্রমশ বাড়িতে আরম্ভ করে এবং ১০ই চৈত্র 'ঘ' এ উপস্থিত হইলে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়।

পৃথিবী যখন 'ক' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন উত্তরার্ধের অধিবাসিগণ সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম অনুভব করিয়া থাকে, কারণ ঐ দিন পৃথিবীর উত্তরার্ধে দিনমান সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। পৃথিবী যখন 'গ' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয় তখন উত্তরার্ধে রাত্রিমান সর্বাপেক্ষা অধিক হয় বলিয়া উক্ত স্থানের অধিবাসিগণ সর্বাপেক্ষা শীত অনুভব করিয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তরার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণার্ধে সেই সময় শীতকাল, এবং উত্তরার্ধে যখন শীতকাল, দক্ষিণার্ধে তখন গ্রীষ্ম-কাল হয়।

গ্রীষ্মকালে দিনমানের এবং শীতকালে রাত্রিমানের পরিমাণ অধিক হইলেও, সর্বত্র এই আধিক্য সমান হয় না। বিষুবপ্রদেশে কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল সময় দিনমান ও রাত্রিমান সমান থাকে। বিষুবরেখা হইতে যত অধিক উত্তর বা দক্ষিণাংশে যাইবে, দিনমানের ও রাত্রিমাণের প্রভেদ তত অধিক হইতে থাকিবে। কলিকাতা ও লণ্ডন উভয় স্থানই পৃথিবীর উত্তরার্ধে অবস্থিত, সুতরাং উভয়ের গ্রীষ্মকাল এক সময়েই হয়, এবং সেই সময়ে উভয়েরই দিনমান, রাত্রিমান অপেক্ষা অধিক;

কিন্তু কলিকাতার দিনমান যেদিন ১৩ ঘণ্টা, লণ্ডনের দিনমান সেই দিন হয়ত ১৭ ঘণ্টা এবং সুমেরু প্রদেশের দিনমান ২৪ ঘণ্টা। ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্যন্ত ছয় মাস সুমেরুতে রাত্রি এবং অপর ছয়মাস তথায় দিন; সুমেরু প্রদেশে যে ছয়মাস দিন, কুমেরু প্রদেশে সেই ছয়মাস রাত্রি, এবং অবশিষ্ট ছয় মাস দিন।

চন্দ্র

আমাদের নিকট আকারে এবং ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের পরেই চন্দ্রের স্থান। ইহা আমাদিগের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ইহা পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন পূর্বে সূর্যের অংশ ছিল, চন্দ্র সেইরূপ পৃথিবীর অংশ ছিল। সম্ভবত ইহারা একই সময়ে জন্মিয়াছে; তাহা হইলে, জন্মকালে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই সূর্যের ন্যায় উত্তপ্ত ছিল। এক্ষণে কিন্তু চন্দ্রের নিজস্ব সমস্ত উত্তাপ ফুরাইয়া গিয়াছে; তবে চন্দ্রের যে অংশে যখন সূর্য-কিরণ পতিত হয় সেই অংশ তখন সাময়িক ভাবে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রের বহির্ভাগে বায়ুর স্তর নাই; এই সকল কারণে চন্দ্রের উপর কোন জীবের বাস করা অসম্ভব। উত্তাপের ন্যায় চন্দ্রের নিজস্ব আলোকও ফুরাইয়া গিয়াছে; সূর্যকিরণ চন্দ্রের উপর পতিত হইলে উহাকে উজ্জ্বল দেখায়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের স্বল্পতম দূরত্ব ২২১৬০০ মাইল, এবং অধিকতম দূরত্ব ২৫২৯৭০ মাইল। চন্দ্রের ব্যাসের পরিমাণ ২১৬৩ মাইল। গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে; এবং গ্রহগণ যেমন সূর্যের চারিদিকে পরিক্রম করে, ইহা সেইরূপ পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রম করিয়া থাকে। নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণন একবার সমাপ্ত করিতে চন্দ্রের যত সময় লাগে, পৃথিবীর চারিদিকে

পরিক্রমণ একবার সমাপ্ত করিতে ঠিক তত সময় লাগে, এই জন্য আমরা চন্দ্রের কেবল একদিক দেখিতে পাই।

আমরা চন্দ্রের যে দিক দেখিতে পাই তাহার কতক অংশ শুভ্র ও কতক অংশ কৃষ্ণাভ দেখিয়া থাকি। এই কৃষ্ণাভ অংশকে চন্দ্রের কলঙ্ক কহে। চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ বহু মৃত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ, কৃষ্ণাভ স্থানগুলি বোধ হয় এই সকল পর্বতের ছায়া, অথবা যে সকল গভীর উপত্যকায় সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না সেই সকল উপত্যকা।

নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘূর্ণন সমাপ্ত করিতে চন্দ্রের ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিঃ ১১ সেঃ সময় লাগে, ইহাকে চন্দ্রের **পরিক্রমকাল** কহে। সূর্যের সহিত সংযোগ বা প্রতিযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সংযোগ বা প্রতিযোগে অবস্থিত হইতে চন্দ্রের প্রায় ২৯½ দিন লাগে, এই সময়ের নাম **যুতিকাল** বা **চান্দ্রমাস**। ক্রান্তিবৃত্ত অনু-সরণ করিয়া সূর্যের যে আপাত বার্ষিক গতি হয়, তাহাই যুতিকাল ও পরিক্রম কালের পার্থক্যের কারণ। সূর্য উক্ত ২৯½ দিনে আপাত বার্ষিক গতিতে যতখানি পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে ততখানি যাইতে চন্দ্রের প্রায় ২ দিন সময় লাগে। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে বা যুতিকালে চন্দ্র একবার সূর্যকে সম্পূর্ণ পরিক্রম করিয়া থাকে। সুতরাং সৌর (২৯½ × ১২ =) ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বৎসর হয়।

চন্দ্রের কলা। চন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় উহার হ্রাস বৃদ্ধি। প্রতি চান্দ্র মাসে চন্দ্রকে একদিন করিয়া একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দিনের নাম অমাবস্যা। এই দিন হইতে প্রত্যহ চন্দ্রের ক্রমবৃদ্ধি দেখিতে পাইবে এবং প্রায় ১৫ দিন পরে চন্দ্রকে পূর্ণ গোলাকাররূপে দেখা যাইবে, এই শেষোক্ত দিনকে পূর্ণিমা কহে। চন্দ্রের বৃদ্ধিকালের উক্ত ১৫ দিনকে **শুক্লপক্ষ** বলা হয়।

পূর্ণিমার পর হইতে চন্দ্রকে ক্রমশ হ্রাস হইতে দেখা যায় এবং ১৫ দিন পরে পুনরায় অমাবস্যা হয়, অর্থাৎ চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। চন্দ্রের হ্রাস কালের ১৫ দিনকে **কৃষ্ণপক্ষ** কহে। প্রত্যেক পক্ষকে ১৫ ভাগ করিয়া এক একটি তিথি পাওয়া যায়; পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পর হইতে তিথিগুলির নাম যথাক্রমে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, এবং চতুর্দশী। প্রত্যেক তিথিতে চন্দ্রের যতটুকু হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তাহাকে **কলা** বলে। চন্দ্র কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রকার ছোট বা বড় হয় না। উহার আকার যেমন গোলকের ন্যায় সেইরূপই থাকে, তবে সকল দিন আমরা উহার সকল অংশ দেখিতে পাই না। যে দিন চন্দ্রের যতটুকু আলোকিত অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, সেই দিন আমরা চন্দ্রের ততটুকু অংশ দেখিতে পাই। তোমরা জান যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই, সূর্যের কিরণ চন্দ্রে পতিত হইয়া উহাকে আলোকিত করে; চন্দ্র গোলাকাকার বলিয়া এক কালে উহার অর্ধাংশ মাত্র আলোকিত হয় এবং অপর অর্ধাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক ভূ-পরিক্রম কালে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থানে আমরা উহার কোন্ অংশ দেখিতে পাই। ১০নং চিত্রে পৃ—পৃথিবী এবং চ—চন্দ্র; দূর হইতে সূর্যের কিরণমালা সমান্তরাল ভাবে আসিয়া চন্দ্রের উপর পড়িতেছে। চিত্রে দেখিতে পাইতেছ যে, চন্দ্রের যে অর্ধ সূর্যের দিকে আছে, সেই অর্ধ আলোকিত এবং অপর অর্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অধিকন্তু পৃথিবী হইতে চন্দ্রের সমস্ত অংশ দেখা যায় না; একটি বল লইয়া দেখ, উহার যে অর্ধ তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে সেই অর্ধ দেখিতে পাও, অপর অর্ধ দেখিতে পাও না। সেইরূপ আমরা চন্দ্রের অর্ধাংশ মাত্র এককালে দেখিতে পাই। মনে কর 'চ' চন্দ্রের কেন্দ্র; পৃথিবী ও চন্দ্রের

কেন্দ্রকে পৃ চ কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করা হইয়াছে, চন্দ্রকে এমন একটি তল দ্বারা (দ র্দ) সমান দুইভাগে ভাগ কর, যেন পৃ চ সেই তলের উপর লম্ব ভাবে থাকে, চন্দ্রের যে অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর সম্মুখে আছে আমরা কেবল সেই অর্ধ দেখিতে পাই, দ র্দ তলের পিছনের অর্ধভাগ
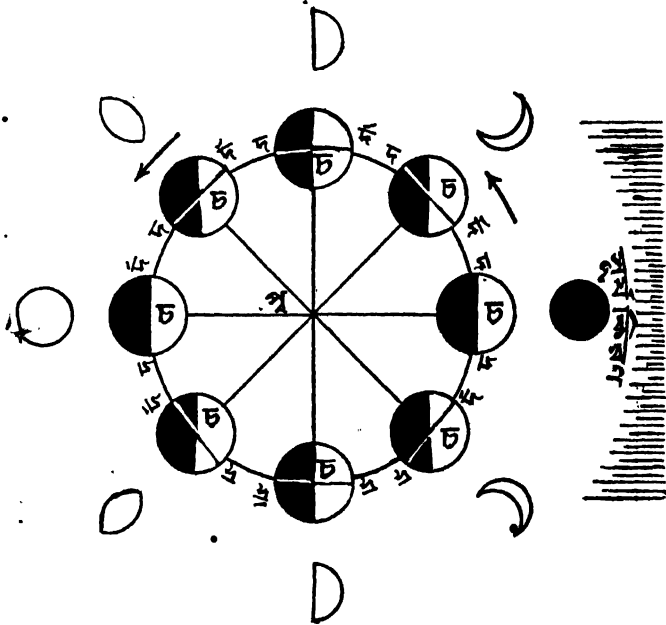
১০নং চিত্র

দেখিতে পাই না। আবার সম্মুখের অর্ধ ভাগের সমস্ত অংশ যে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নহে, উহার যতটুকু অংশ আলোকিত থাকে, কেবল ততটুকু দেখা যায়। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ কালে চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে উপস্থিত হয়, তখন দ র্দ দেখায় ভিতরের অর্ধের

কোন স্থান আলোকিত হয় না, সুতরাং আমরা চন্দ্রের কোন অংশ দেখিতে পাই না, এই সময়কে **অমাবস্যা** কহে। উক্ত চিত্রে চন্দ্রের যে বিভিন্ন অবস্থান দেখান হইয়াছে, তাহার একটি হইতে পরবর্তী স্থানে উপস্থিত হইতে চন্দ্রের ৩।৪ দিন সময় লাগে। অমাবস্থার পর তিনটি অবস্থানে দ র্দ তলের ভিতর দিকের যথাক্রমে $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$ ও $\frac{3}{8}$ অংশ আলোকিত থাকে, সুতরাং আমরা উহাকে যথাক্রমে **বালেন্দু** (Crescent), **অর্ধচন্দ্র** (Dichotomized) এবং **অর্ধাধিক** (Gibbous) আকারে দেখিয়া থাকি। অতঃপর পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যগত হয়, তখন চন্দ্রের দ র্দ রেখার ভিতরের সমস্ত অর্ধই আলোকিত থাকে, সুতরাং আমরা চন্দ্রকে গোলাকার **পূর্ণচন্দ্র** (Full Moon) রূপে দেখিতে পাই। এই সময়ে **পূর্ণিমা** বলে। ইহার পর চন্দ্রের দৃশ্যমান আলোকিত অংশ ক্রমশ কমিতে থাকে, এবং আমরা উহাকে যথাক্রমে অর্ধাধিক, অর্ধ ও বালেন্দুর আকারে দেখিতে পাই। চন্দ্র পুনরায় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে উপস্থিত হইলে উহার কোন অংশই আর দেখা যায় না।

গ্রহণ

পূর্ণিমার দিন পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যগত হয়, তখন চন্দ্রের ভিতরের অর্ধাংশ কিরূপে আলোকিত হইতে পারে? সূর্যকিরণ চন্দ্রে পতিত হইবার পূর্বে, পৃথিবী কর্তৃক রুদ্ধ হয় না কেন? ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ। চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য প্রত্যেক পূর্ণিমার দিন এক **সরলরেখাস্থ হয় না,** কারণ চন্দ্রের কক্ষ ও ক্রান্তিবৃত্ত এক তলস্থ নহে, উহারা পরস্পরের সহিত ৫° কোণ উৎপন্ন করিয়া হেলিয়া আছে, ক্রান্তিবৃত্ত চন্দ্রের কক্ষতলের সহিত দুইটি বিন্দুতে

মিলিত হয়, এই দুইটির বিন্দুর নাম **পাত** (Node) ; যে পাতের ভিতর দিয়া চন্দ্র দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গমন করে তাহার নাম **রাহু**, এবং যে পাতের ভিতর দিয়া উহা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করে তাহার নাম **কেতু**। পূর্ণিমার দিন চন্দ্র রাহু বা কেতুতে অবস্থিত থাকিলে, সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরলরেখাস্থ হয়, তখন আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না, কারণ তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, ইহার নাম **চন্দ্রগ্রহণ**। প্রতিযোগকালে চন্দ্র ঠিক রাহু বা কেতুতে অবস্থিত না থাকিয়া উহার সন্নিকটে অবস্থিত হইলেও চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে।

কোন অমাবস্যার দিন অর্থাৎ নিম্নসংযোগ কালে, চন্দ্র যদি রাহু বা কেতুতে, অথবা তাহাদের সন্নিকটে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আড়াল করিয়া থাকে, অর্থাৎ চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পতিত হয়, ইহার নাম **সূর্যগ্রহণ**। গ্রহণের সময় যদি চন্দ্র বা সূর্য সম্পূর্ণরূপে আড়াল হইয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের কোন অংশই দেখা না যায়, তাহা হইলে গ্রহণকে
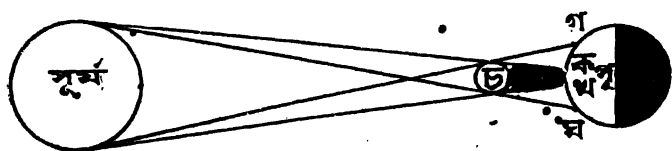
১১নং চিত্র

পূর্ণগ্রাস, এবং চন্দ্র বা সূর্যের কতক অংশ অদৃশ্য হইয়া অবশিষ্ট অংশ দৃশ্যমান থাকিলে, গ্রহণকে **খণ্ডগ্রাস** কহে। কোন কোন সূর্য-গ্রহণের সময় আমরা সূর্যের কেন্দ্রাংশ দেখিতে পাই না, কিন্তু

তাহার পরিধি অংশ বলয়াকারে দেখা যায়, এই প্রকার সূর্যগ্রহণের নাম **বলয়গ্রাস**।

১১ ও ১২নং চিত্রে চন্দ্র রাহু বা কেতুতে অবস্থিত হওয়ায় উহা সূর্য ও পৃথিবীর সহিত এক সরলরেখাস্থ হইয়াছে। ১১নং চিত্রে দেখিতে পাইতেছ যে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া (umbra) পৃথিবীর কখ অংশে পতিত
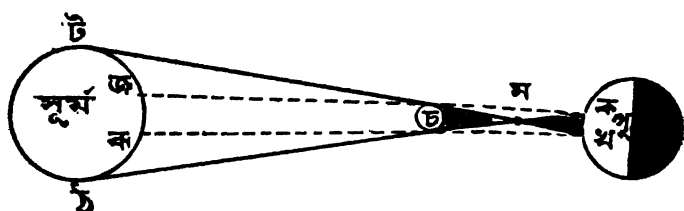
১২নং চিত্র

হইয়াছে, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যকে পৃথিবীর এই অংশ হইতে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া আছে, কিন্তু পৃথিবীর কগ ও খঘ অংশে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে নাই, সুতরাং উক্তস্থান হইতে সূর্যের কতক অংশ দেখা যায়। কখ অংশে সূর্যের পূর্ণগ্রাস এবং কগ খঘ অংশে খণ্ডগ্রাস গ্রহণ হইয়াছে। ১২নং চিত্রেও সূর্যগ্রহণ দেখান হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্র এস্থলে পৃথিবী হইতে অধিকতম দূরে অবস্থিত; এক্ষেত্রে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর দিকে পতিত হইলেও পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছায় নাই, উহা শূন্যে ম বিন্দুতে সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর কখ অংশ হইতে সূর্যের জঝ অংশ দেখা যায় না, কারণ সূর্যের উক্ত অংশকে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া আছে; উহা কিন্তু সূর্যের টজ ঠঝ অংশকে আড়াল করিতে পারে নাই, অতএব কখ হইতে সূর্যের

কেন্দ্রাংশ দেখা না গেলেও পরিধি অংশ দেখা যায়; ইহার নাম **বলয় গ্রাস** সূর্যগ্রহণ।
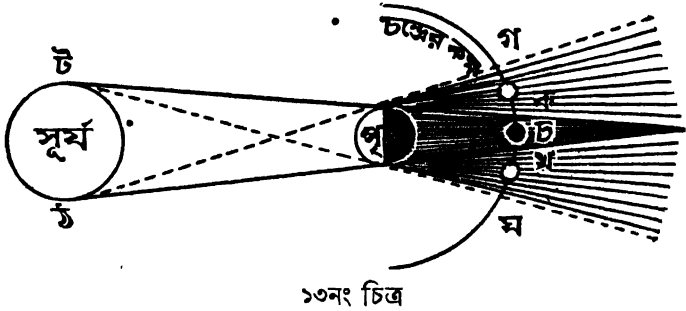
১৩নং চিত্র

১৩নং চিত্রে চন্দ্রগ্রহণ দেখান হইয়াছে। এস্থলেও চন্দ্র রাহু বা কেতুতে অবস্থিত, অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরলরেখাস্থ হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যগত, অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতিযোগ হইয়াছে। এই চিত্রে চন্দ্রের কক্ষের উপর কখ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া এবং কগ খঘ উহার উপচ্ছায়া (Penumbra), অর্থাৎ কগ অংশে সূর্যের ট অংশ হইতে এবং খঘ অংশে ঠ হইতে আলোক পতিত হইয়া থাকে, অতএব চন্দ্রকক্ষের এই অংশে পৃথিবীর অর্ধছায়া বা উপচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। চন্দ্র যখন প্রচ্ছায় মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহা সূর্য হইতে একটুও আলোক প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং পৃথিবী হইতে চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্র যখন উপচ্ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে তখন সমস্ত চন্দ্রকে অল্পরূপে আলোকিত দেখা যায়, ইহাকে গ্রহণ বলে না। গ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যালোক হইতে বঞ্চিত হইয়া ঔজ্জ্বল্য হারায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য না হইয়া, তামার ন্যায় লাল্‌চে বর্ণ ধারণ করে।

ধূমকেতু

তোমরা দেখিয়াছ যে গ্রহগণ কেমন সুশৃঙ্খলে খগোলে ভ্রমণ করে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জ্যোতিষ্ক খগোলে আবির্ভূত হয়, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য দেখা দেয়, আবার হঠাৎ কোথায় চলিয়া যায়; হয়ত বহুকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া আসে, না হয়ত চিরকালের জন্য চলিয়া যায়, এই সকল জ্যোতিষ্কের নাম **ধূমকেতু** (Comet)।
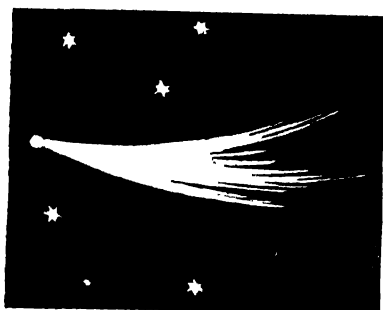
১৪নং চিত্র

ইহারাও গ্রহ, উপগ্রহের ন্যায় ভ্রমণশীল জ্যোতিষ্ক। আকাশের গাত্রে ধূমকেতুকে প্রকাণ্ড ঝাঁটার ন্যায় দেখায়, এবং ঝাঁটার কাঠিগুলির সংযোগস্থলকে একটি উজ্জ্বল তারার ন্যায় দেখায়। কাঠির গুচ্ছটি ধূমকেতুর পুচ্ছ, এবং উজ্জ্বল সংযোগ স্থলটি উহার কেন্দ্র। কোন কোন ধূমকেতুর দুই বা ততোধিক পুচ্ছ দেখা গিয়াছে, আবার কোন কোন ধূমকেতু পুচ্ছহীন। পুচ্ছহীন ধূমকেতু-দিগকে উজ্জ্বল তারার ন্যায় দেখায়; তারার ন্যায় দেখাইলেও উহারা স্থির তারার ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না, এবং গ্রহগণের ন্যায় নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করে না। ধূমকেতুগণের নিজস্ব আলোক আছে বলিয়া
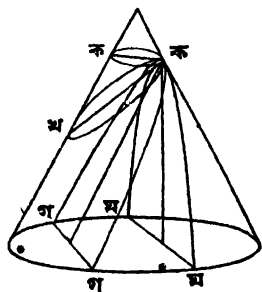
১৫নং চিত্র

উহারা স্থিরতারাদিগের ন্যায় চঞ্চলজ্যোতি। অধিকাংশ ধূমকেতু একবার সূর্যের নিকটস্থ হইয়া চিরকালের জন্য সূর্যের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, কারণ উহাদিগের কক্ষের আকার বৃত্ত বা উপবৃত্ত নহে, ইহাদিগের কক্ষের আকার পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত। একটি মোচার অগ্রভাগ বা শঙ্কুকে (cone) ১৫নং চিত্রের ন্যায় কক রেখায় লম্বচ্ছেদ কর, ছেদিত অংশের পরিধি হইবে বৃত্ত ; উক্ত শঙ্কুকে কখ এবং কগগ রেখায় বক্রচ্ছেদ করিলে ছেদিত অংশের পরিধিগুলি যথাক্রমে উপবৃত্ত (Ellipse) ও অধিবৃত্ত (Parbola) হইবে, শঙ্কুকে কঘঘএর ন্যায় দীর্ঘচ্ছেদ করিলে, তাহার পরিধি হইবে পরাবৃত্ত (Hyperbola)। পরাবৃত্ত ও অধিবৃত্তের প্রান্তদ্বয় কখন সংযুক্ত হয় না, সুতরাং যে সকল ধূমকেতুর কক্ষ এই প্রকার, তাহারা আর কখন ফিরিয়া আসিতে পারে না। এই সকল ধূমকেতুকে **মুক্ত** (Irregular) ধূমকেতু কহে। কতকগুলি ধূমকেতুর কক্ষ উপবৃত্ত, ইহারা সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে, কিন্তু ইহাদের কক্ষ এত বড়, যে একবার পরিক্রমণ সমাপ্ত করিতে বহু বৎসর লাগে, এইগুলির নাম **বদ্ধ** (Regular) ধূমকেতু। সূর্যের যত নিকটস্থ হয়, ধূমকেতুগণের ঔজ্জ্বল্য তত বাড়িতে থাকে এবং সূর্য হইতে যত দূরে চলিয়া যায়, উহাদের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ তত কমিতে থাকে। দৃশ্যমান ধূমকেতুর কেন্দ্রাংশে দুইটি স্তর আছে। ভিতরের স্তরের নাম **নিউক্লিয়স** (Nucleus) এবং বাহিরের স্তরের নাম **আবরক** (Coma)। নিউক্লিয়সগুলি অসংখ্য লৌহাদি ধাতু ও প্রস্তরখণ্ডে গঠিত। সূর্যের নিকটস্থ হইলে উক্ত লৌহ ও প্রস্তরখণ্ড সমূহ সূর্যের অতিরিক্ত উত্তাপে জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং তাহার শিখা দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ আবরক সৃষ্টি করে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ধূমকেতুর পুচ্ছও এই শিখার প্রবাহ।

উল্কা

আর এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জ্যোতিষ্ক আছে, তাহাদের নাম **উল্কা** (Meteors)। চন্দ্রহীন আকাশের দিকে চাহিলে প্রায় দেখা যায় যে, হঠাৎ হাউইয়ের মত একটা তারা যেন ছুটিয়া গেল। মার্চ, মে, জুলাই বিশেষত নভেম্বর মাসে এইরূপ বহু তারা ছুটিতে দেখা যায়, সাধারণত আমরা ইহাদের "খসা তারা" বলি। ইহারা কিন্তু তারাও নহে গ্রহও নহে, ইহাদিগের নাম উল্কা। ছোট বড় নানা আকারের উল্কা আছে, যে সকল বড় উল্কা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহাদিগকে **উল্কাপিণ্ড** (Meteorites) কহে। এক এক সময় এত অধিক সংখ্যক উল্কাপিণ্ড পতিত হয় যে তাহাকে উল্কাবৃষ্টি বলা যায়। উল্কার জন্ম সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ধূমকেতুগুলি কোন কারণে ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যস্থ প্রস্তর ও লৌহপ্রধান ধাতুখণ্ডগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়া অত্যন্ত বেগে উক্ত ধূমকেতুর কক্ষে ছুটিতে থাকে। ছুটিতে ছুটিতে যদি তাহারা কখন পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে অতিবেগে শূন্য হইতে পৃথিবীতে নামিতে থাকে, এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সহিত প্রচণ্ড ঘর্ষণ বশত জ্বলিয়া উঠে। যদি উক্ত খণ্ডগুলি ক্ষুদ্রাকার হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে পতিত হইবার পূর্বেই উহারা ভস্মীভূত হইয়া অদৃশ্য ধূলায় পরিণত হইয়া যায়, ইহাদিগকে আমরা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আকাশে জ্বলিতে দেখি মাত্র। উক্ত খণ্ডগুলি বড় হইলে তাহারা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইবার পূর্বেই অতিবেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন ইহাদিগকে **উল্কাপিণ্ড** বলা হয়।

১নং তালিকা

ঔজ্জ্বল্যানুসারে প্রথম শ্রেণির স্থিরতারাগুলি এবং তাহারা যে মণ্ডলের অন্তর্গত।

সংখ্যা	স্থির তারা	তারামণ্ডল	মন্তব্য
১	লুব্ধক	কেনিস মেজর	৭ ও ৯ পৃষ্ঠা।
২	অগস্ত্য (Canopus)	আরগো (Argus)	মেষের সুদূর দক্ষিণে
৩	সেন্‌টরীয়‘ক’ (α Centauri)	সেন্‌টরাস (Centaurus)	„ „ „
৪	আর্কটুরাস	বুওটেজ.	৭ ও ১০ পৃষ্ঠা
৫	রাইগেল	কালপুরুষ	৭ ও ৯ „
৬	কেপেলা	অরিগা	১৩ „
৭	অভিজিৎ	লাইরা	১৩ „
৮	প্রোসিয়ন্ (Procyon)	কেনিস মাইনর	কর্কটের দক্ষিণে
৯	বিটেলগাজ্	কালপুরুষ	৭ ও ৯ পৃষ্ঠা
১০	যমরাজ (Achernar)	বৈতরণী (Eridanus)	মীনের সুদূর দক্ষিণে
১১	অলডেবরণ	বৃষ	১১ পৃষ্ঠা
১২	সেন্‌টরীয়‘খ’ (β Centauri)	সেন্‌টরাস	মেষের সুদূর দক্ষিণে
১৩	ক্রুসীয়‘ক’ (α Crucis)	দক্ষিণ ক্রুস	১২ পৃষ্ঠা
১৪	এণ্টারিস	বৃশ্চিক	১২ „
১৫	অলটেয়ার	আকুইলা	১৩ „
১৬	স্পাইকা	কন্যা	১২ „
১৭	ফমেলহট্ (Fomalhaut)	দক্ষিণ মীন	কুম্ভের দক্ষিণে
১৮	ক্রুসীয়‘খ’ (β Crucis)	দক্ষিণ ক্রুস	১২ পৃষ্ঠা
১৯	পোলাক্	মিথুন	১১ „
[illegible]	[illegible]	সিংহ	১১ „

২নং তালিকা

গ্রহগণের ব্যাস এবং সূর্য হইতে উহাদের গড় দূরত্ব

গ্রহ		ব্যাস		সূর্য হইতে গড় দূরত্ব।
বুধ	...	২৭৬৫ মাইল	...	৩৫৯৮৭০০০ মাইল
শুক্র	...	৭৮২৬ „	...	৬২২৪৫০০০ „
পৃথিবী	...	৭৯১৮ „	...	৯২৯৬৫০০০ „
মঙ্গল	...	৪৩৫২ „	...	১৪১৬৫০০০০ „
বৃহস্পতি		৯০১২০ „	...	৪৮৩৬৭৮০০০ „
শনি	...	৭৬৪৭০ „	...	৮৮৬৭৭৯৯০০ „
ইউরেনস		৩৪৯০০ „	...	১৭৮২০০০০০০ „
নেপচুন	...	৩২৯০০ „	...	২৮০০০০০০০০ „

৩নং তালিকা

পৃথিবীর দিনাদি অনুসারে গ্রহগণের সৌরবৎসর ও অহোরাত্রের পরিমাণ।

গ্রহ		সৌরবৎসর দিন	ঘণ্টা		অহোরাত্র দিন	ঘণ্টা
বুধ	...	৮৭ —	২৩	...	০৮৭	২৩
শুক্র	...	২২৪ —	১৭	...	২২৪	১৭ (?)
পৃথিবী	...	৩৬৫ —	৬	...	—	২৪
মঙ্গল	...	৬৮৭ —	০	...	—	২৪½
বৃহস্পতি	...	৪৩৩২ —	১৪ (প্রায় ১২ বৎসর)	...	—	১০
শনি	...	১০৭৫৯ —	৫ („ ২৯ „)	...	—	১০
ইউরেনস	...	৩০৬৮৮ —	৭ („ ৮৪ „)	...	—	১১
নেপচুন	...	৬০১৮০ —	২১ („ ১৬৫ „)	...	—	?

Questions :—(1) How can you identify the Polestar ? (2) Draw a map of the sky showing the principal constellations as seen in the evening of November. (3) Name the planets in order of their distance from the sun and state the number of satellites of each of them. (4) Illustrate with diagram what do you understand by the terms, Inferior conjunction, Opposition and Apparent retrograde motion. (5) Illustrate with diagram, how change of season is effected ? (6) What do you mean by lunar year ? What is the cause of our seeing different phases of the moon ? (7) Illustrate with diagrams various types of eclipses. (8) What do you know about comets and meteors ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূবিদ্যা (Geology)

Syllabus :—The Earth—condensation from a hot gaseous state —its crust—igneous and sedimentary rocks. Probable condition of the interior of the Earth. Earth movements (earthquake)—folding, landslide, volcano. Varieties of soil and their bearing on plant life and agricultural operations. The story of the formation of coal and mineral oil.

ভূবিদ্যা বলিতে পৃথিবীর সজীব, নির্জীব সমস্ত পদার্থের বিষয় জানা বুঝায়, কিন্তু উহার উদ্ভিদ্, প্রাণী, জড়বস্তু, নদ, নদী, সাগর প্রভৃতির অবস্থান, যথাক্রমে উদ্ভিদ্ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি পৃথক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে **ভূবিদ্যা** বলিতে পৃথিবীর জন্ম হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভূত্বকের (Crust of the Earth) গঠন ও ক্রমবিকাশের বিষয় জানা বুঝাইয়া থাকে।

পৃথিবীর উৎপত্তি

পৃথিবী ও অপর গ্রহগণ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয় পূর্বে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করিতেন; অধুনা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জিন্‌স্‌ (Sir James Jeans) সমস্ত প্রাচীন মতবাদ খণ্ডন করিয়া তাঁহার বিস্ফীতি মতবাদ (Tidal Theory) প্রচার করিয়াছেন। জড় পদার্থ মাত্রের মহাকর্ষ (Gravitation) নামক একটি ধর্ম আছে; এই ধর্ম প্রভাবে দুইটি জড় বস্তু পরস্পরকে নিজ ভারকেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কোন বস্তুর ওজন যত অধিক হয়, এবং দ্বিতীয় বস্তুটি যত নিকটে থাকে উহার মহাকর্ষ বল তত অধিক হয়। চন্দ্র ও সূর্যের এই মহাকর্ষ বল প্রভাবে সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা বা জল-স্ফীতি হইয়া থাকে। সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অধিক নিকটে আছে বলিয়া চন্দ্রই উক্ত জল স্ফীতির প্রধান কারণ।

তোমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছ যে সূর্যের বহির্ভাগ জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, দুই তিন শত কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের আকার আরও প্রকাণ্ড ছিল এবং উহার বহির্ভাগের অবস্থা আরও অধিক লঘু ছিল। সেই সময়, তখনকার সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ একটি তারা অকস্মাৎ সূর্যের নিকট দিয়া চলিয়া যায়। সূর্য ও চন্দ্রের মহাকর্ষ বল প্রভাবে সমুদ্রে যেমন জলস্ফীত হয়, সেই তারাটির মহাকর্ষ বল প্রভাবে সেইরূপ সূর্যের যে দিক উহার সম্মুখে ছিল, সেই দিকের গ্যাসীয় বহির্ভাগের কিয়দংশ স্ফীত হইয়া প্রকাণ্ড পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠিল। তারাটি সূর্যের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, উক্ত পর্বতটিও তত উচ্চ হইতে লাগিল এবং তারাটি নিকটতম হইলে, উহার অত্যধিক মহাকর্ষ বল প্রভাবে পর্বতের কিয়দংশ সূর্য হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া তারাটির অভিমুখে ছুটিয়া গেল। তারাটি সূর্যের নিকটে আসিয়া আবার দূরে চলিয়া গেল বলিয়া উক্ত বিচ্ছিন্ন অংশটি তারাটিতে সংলগ্ন হইতে না পারিয়া মহাকাশে থাকিয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং আজও সেইভাবে ঘুরিতেছে, তবে কালক্রমে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘনীভূত হইয়া পৃথক পৃথক গোলকে পরিণত হইয়াছে। এই এক একটি গোলক এক একটি গ্রহ। এইরূপে সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ উৎপন্ন হইল। পূর্বোক্ত বিচ্ছিন্ন অংশটির আকার ছিল পটলের ন্যায়, সেইজন্য সূর্যের নিকটতম ও সুদূরতম গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী গ্রহগুলি ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর আকারের।

সৃষ্টির সময় গ্রহগণ যে সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময় পৃথিবী এত অধিক উত্তপ্ত ছিল যে সেরূপ উত্তাপে কোন বস্তু কঠিন, এমন কি তরল অবস্থাতেও থাকিতে পারে না। সেই সময় পৃথিবীর অন্তর্গত সমুদয় বস্তু ঘনীভূত গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, এবং বর্তমান কালে সূর্যের পৃষ্ঠদেশ হইতে যেরূপ লেলিহান অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ হইতে তখন সেইরূপ অগ্নিশিখা সমূহ বহির্গত হইত। তখনকার সেই ভীষণ অগ্নিময় পৃথিবীর পৃষ্ঠে উদ্‌ভিদ্ বা প্রাণী কোন সজীব বস্তুর শ্বাস অসম্ভব। কালক্রমে ভূপৃষ্ঠের উক্ত জ্বলন্ত অবস্থার অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল। একটি লৌহ শলাকাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে দেখিবে যে উহা হইতে লোহিতাভ আলোক বিকীর্ণ হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ উহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে দেখিবে যে তাপ বিকিরণে ফলে উহার আলোক ও উত্তাপ ক্রমশ হ্রাস হইতে হইতে নষ্ট হইয়া শলাকাটি অনুজ্জ্বল ও শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীও সেইরূপ বহুকাল ধরিয়া তাপ বিকিরণ করিতেছে। ফলে, উহার বহির্ভাগের আলোক ও উত্তাপ নষ্ট হইয়া

ক্রমশ শীতল হইয়াছে, এবং গ্যাসীয় বস্তু সমূহ প্রথমে তরল, পরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

তোমরা জান যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় চারি হাজার মাইল। তন্মধ্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৭০০ মাইল এইরূপ কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই কঠিন অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাহিরের ৪০।৫০ মাইল স্থূল অংশের নাম ভূত্বক (Crust of the Earth)। আমরা এই অধ্যায়ে উক্ত ভূত্বকের গঠন ও ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচনা করিব। প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি ভূত্বকের উপাদান; ভূত্বকের নিম্নদেশ কঠিন অবস্থায় আছে জানা গেলেও উহার সবিশেষ পরিচয় আমাদিগের অজ্ঞাত। পৃথিবীর এই অভ্যন্তরভাগে গমন করা, এমন কি উহাকে দেখিতে পাওয়া আমাদিগের অসাধ্য, কিন্তু উহার অবস্থা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। কোন খনির মধ্যে নামিলে দেখা যায় যে, নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে উত্তাপ ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে। সাধারণত প্রতি ৬০ ফিট নিম্নে প্রায় এক ডিগ্রি ফাঃ করিয়া উত্তাপ অধিক হয়। ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ যদি ৫০° ফাঃ হয়, এবং উক্ত হারে যদি নিম্নদেশের উত্তাপ অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের অনধিক দুই মাইল নিম্নে জল স্টীমে পরিণত হইবে। যে সকল প্রস্রবণ পৃথিবীর এই প্রকার গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হয়, সেই সকল প্রস্রবণ হইতে ফুটন্ত জল ও স্টীম নির্গত হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরি সমূহ হইতে মধ্যে মধ্যে স্টীম, ধূম, গলিত ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ অগ্নিময় উত্তপ্ত অবস্থায় নির্গত হইতে দেখা যায়। এই সকল উষ্ণ-প্রস্রবণ এবং আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত বস্তু সমূহ হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা অনুমান করা যায়। ইহা যে অত্যুত্তপ্ত অবস্থায় আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই

পৃথিবীর উক্ত অভ্যন্তরেরও নিম্নদেশ যে কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা কেবল অনুমান সাপেক্ষ। কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবীর কেন্দ্রাংশ তরল বা সান্দ্র (Viscous) অবস্থায় আছে, যে অবস্থাতেই থাকুক ইহা যে ভীষণ উত্তপ্ত যে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীর এই কেন্দ্রাংশের নাম **অন্তস্থল** (Core)।

ভূত্বক (Crust)

তাপ বিকিরণের ফলে প্রথমে পৃথিবীর পৃষ্ঠ গ্যাসীয় অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং পৃথিবীর চারিদিকে সমভাবে বিস্তৃত একটি সূক্ষ্ম কঠিন আবরণ পতিত হয়। এই আবরণই আদিভূত্বক। বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া ভূত্বক ক্রমশ স্থূল হইতে হইতে বর্তমানকালে প্রায় ৪০।৫০ মাইল স্থূল হইয়াছে। পৃথিবীর অন্তস্থল যত শীতল হইতেছে, উহা তত সংকুচিত হইতেছে, ফলে ভূত্বকও সংকুচিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের বৈষম্য, অর্থাৎ কোন স্থান উন্নত এবং কোন স্থান অবনমিত হইতেছে। যে স্থান অধিক অবনমিত, সেই স্থানে জল জমিয়া মহাসমুদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। এই উন্নতিবৈষম্য আমাদিগের চক্ষে অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইলেও; সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ইহা অতি অল্প। গভীরতম সমুদ্রের তল হইতে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ১১ মাইল, আট হাজার মাইল ব্যাস বিশিষ্ট পৃথিবীর তুলনায় ইহা কতটুকু!

শিলা। ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাবৃত কোন স্থান খনন করিলে, নরম মৃত্তিকার নিম্নে কঠিন প্রস্তরের একটি স্তর দেখা যায়, এই স্তরের উপর বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকার উচ্চতা বিভিন্ন। সমুদ্রাদি পৃথিবীর জলভাগের নিম্নেও এইরূপ প্রস্তরের স্তর বিদ্যমান আছে। ফলত পৃথিবীর সমগ্র অভ্যন্তর কঠিন প্রস্তর কঙ্কালে আবৃত। পর্বতাদি প্রস্তরময় স্থান

সমূহ এই কঙ্কালের নগ্ন বা অনাবৃত অংশ। আমরা সাধারণত কঠিন প্রস্তর সমূহকে **শিলা** (Rock) বলিয়া থাকি, কিন্তু তোমরা পরে দেখিবে যে বালুকা, মৃত্তিকা, কর্দম প্রভৃতি ভূত্বকের প্রায় সমস্ত উপাদান, প্রস্তরের অংশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেইজন্য ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূত্বকের বালুকাদি উক্ত সমুদয় উপাদানকে **শিলা** আখ্যা দিয়া থাকেন।

তোমরা বোধ হয় মিছরীর কুঁদা দেখিয়াছ। কুঁদার মধ্যস্থলে মিছরী-গুলি কেমন নির্দিষ্ট জ্যামিতীয় আকার ধারণ করে, কুঁদার বাইরের মিছরী উক্তরূপ নির্দিষ্ট জ্যামিতীয় আকার ধারণ করিতে না পারিলেও ঐরূপ ভাবাপন্ন হয়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নির্দিষ্ট জ্যামিতীয় আকারের বস্তুগুলিকে কেলাস (Crystals), এবং কেলাস ভাবাপন্ন বস্তুদিগকে কেলাসিত বস্তু (Crytalline Bodies) কহে। হীরক

১৬নং চিত্র

(Diamond), নীলকান্ত (Sapphire), অয়স্কান্ত (Lode Stone;), সৈন্ধব লবণ (Rock Salt) প্রভৃতি শিলা কেলাসের দৃষ্টান্ত।

পৃথিবীতে যত প্রকার প্রস্তর আছে তন্মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কেলাস বা কেলাস ভাবাপন্ন পদার্থ থাকে। এই সকল প্রস্তরকে কেলাসিত শিলা (Crystalline Rock) বলা হয়।

বেলেপাথর প্রভৃতির ন্যায় অবশিষ্ট প্রস্তরগুলির মধ্যে উক্তরূপ অভগ্ন কেলাস বা কেলাস ভাবাপন্ন বস্তু নাই, তবে ইহাদের কতকগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাস চূর্ণ দেখা যায়, এই সকল চূর্ণ একরূপ সিমেণ্টের সাহায্যে দৃঢ়সংবদ্ধ থাকে, সুতরাং ইহারা কোন প্রাচীন কেলাসিত শিলার ভগ্ন অংশ তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে বেলে-পাথরের ন্যায় শিলাগুলি প্রাচীনতর শিলার ভগ্ন অংশসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়।

শিলার শ্রেণি। শিলা সমূহকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। গ্রানাইটের ন্যায় যে সকল শিলা পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত দ্রব বস্তু সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম **আগ্নেয় শিলা** (Igneous Rock), এবং নানা প্রাকৃতিক কারণে পূর্বোৎপন্ন শিলা সমূহের বিশ্লিষ্ট, চূর্ণীকৃত বা দ্রবীভূত অংশ সমূহ নদী, হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে জমিয়া বেলে-পাথরের ন্যায় যে সকল শিলা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম **পালল** (Sedimentary) **শিলা**। পালল শিলাগুলি যে কেবল পূর্বোৎপন্ন শিলার অংশ সমূহ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উদ্ভিদ বা প্রাণীর দৈহিক অংশ অথবা রাসায়নিক পদার্থ সমূহ হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। স্তরে স্তরে জমিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া পালল শিলার অপর নাম **স্তরীভূত** (Stratified) শিলা। আগ্নেয়শিলার মধ্যে এইরূপ স্তর এবং পাললশিলার মধ্যে অভগ্ন কেলাস দেখিতে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু আগ্নেয়শিলার মধ্যে সাধারণত জীবাশ্ম (Fossils), অর্থাৎ জীবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ থাকে না।

আগ্নেয় শিলা দ্বিবিধ ; আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত উত্তপ্ত দ্রব বস্তু সমূহ জমাট বাঁধিয়া যে সকল আগ্নেয় শিলা উৎপন্ন হয় তাহাদিগের নাম **আগ্নেয়গিরিজ** (Volcanic) **শিলা**, এবং উক্ত দ্রব বস্তুসমূহ নিঃসৃত

না হইয়া যদি আগ্নেয়গিরির মধ্যে বা ভূত্বকের গভীরতম প্রদেশে জমাট বাঁধে, তাহা হইলে উক্ত আগ্নেয় শিলাকে **বারুণ** (Plutonic) **শিলা** বলা হয়।

আগ্নেয় ও পালল এই দুই প্রধান শ্রেণির শিলা ব্যতীত, আর এক শ্রেণির শিলা আছে তাহার নাম **রূপান্তরিত শিলা** (Metamorphic Rock)। পালল ও আগ্নেয় উভয়বিধ শিলা হইতে রূপান্তরিত শিলা উৎপন্ন হইতে পারে। যে সকল রূপান্তরিত শিলা পালল শিলা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত স্তর বিন্যাসে থাকিতে পারে, কিন্তু আগ্নেয়শিলা হইতে উৎপন্ন রূপান্তরিত শিলাগুলির মধ্যে প্রকৃত কোন স্তর থাকে না, তবে উহারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফলকে বিন্যস্ত আছে বলিয়া মনে হয়। রূপান্তরিত শিলা সমূহের মধ্যে কেলাস বা কেলাস ভাবাপন্ন মণিক (Mineral) দেখা যায়। ভূত্বকের চাপ, উত্তাপ প্রভৃতি নানা কারণে শিলাসমূহের রূপান্তর হয়। কয়লা, চূণাপাথর, গ্রানাইট প্রভৃতি শিলা রূপান্তরিত হইয়া যথাক্রমে কোক্, মর্মর ও নাইস (Gneiss) প্রভৃতি শিলায় পরিণত হয়।

সাধারণত যত প্রকার শিলা দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই পালল শিলা। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পালল শিলাগুলি স্তরে স্তরে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পালল শিলায় কতকগুলি স্তর উপর্যুপরি সংবদ্ধ হইয়া থাকে। এই স্তরগুলি সাধারণত পরস্পর সমান্তরাল, কিন্তু স্তরগুলির বর্ণ বা উচ্চতা সমান নহে। কোন কোন শিলার স্তরে আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত (Lamina) থাকে।

পূর্বজাত শিলার চূর্ণাংশ জমিয়া যে সকল পালল শিলা উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে বেলেপাথরের ন্যায় যেগুলির মধ্যে বালুকার দানা থাকে, তাহাদিগকে **বালুকাময়** (Arenaceous) **শিলা** বলা হয়।

মৃত্তিকা গঠিত পালল শিলার নাম **মৃন্ময়** (Agrillaceous) **শিলা**। শিলাচূর্ণ ব্যতীত জৈব ও রাসায়নিক পদার্থ সমূহ জমাট বাঁধিয়াও পালল শিলা উৎপন্ন হইতে পারে। **জৈব** পদার্থ হইতে উৎপন্ন পালল শিলাগুলির মধ্যে খড়ি, চূণাপাথর প্রভৃতি ক্যালসিয়ম প্রধান ; লৌহ-প্রস্তর (Iron Stone) প্রভৃতি লৌহপ্রধান ; অরণি প্রস্তর (Flint) প্রভৃতি শিলা সিলিকা (Silica) প্রধান ; এবং কয়লা (Coal) প্রভৃতি কার্বণপ্রধান শিলা। **রাসায়নিক** বস্তু হইতে উৎপন্ন পালল-শিলার মধ্যে সোরা, সৈন্ধব লবণ (Rock Salt) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পালল শিলা

অতঃপর আমরা পালল শিলা সমূহ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা আলোচনা করিব। এই সকল শিলার উৎপত্তির মূল ধ্বংস ও সৃষ্টি। পূর্বোৎপন্ন, অর্থাৎ প্রাচীনতর শিলাসমূহের বহির্ভাগ নানা প্রাকৃতিক কারণে নিয়ত ভগ্ন, চূর্ণ, বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; নদী ও সমুদ্র এই সকল চূর্ণীভূত ও ক্ষয়িত অংশসমূহ অপসরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠের নূতন নূতন অংশ সমূহ উন্মোচন বা নগ্ন করিতেছে। ধ্বংসের প্রথম প্রক্রিয়ার নাম **চূর্ণীভবন** (Disintegration) ও **ক্ষয়ীভবন** (Erosion); এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম **নগ্নীভবন** (Denudation)। এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে চূর্ণীভূত ও ক্ষয়িত অংশ সমূহ নদী, হ্রদ বা সমুদ্রতলে যাইয়া জমিতেছে। ইহাই প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। ধ্বংসলীলার ফলে পৃথিবীর সমুদয় স্থলভাগ এতদিন সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যাইত, স্থলের কোন চিহ্ন থাকিত না, কিন্তু ধ্বংসের সহিত প্রকৃতির সৃষ্টিলীলাও সমভাবে চলিতেছে; সেইজন্য অদ্যাপি স্থলভাগ সমুদ্রের উপর মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রগর্ভে নীত প্রাচীন শিলার অংশ সমূহ জমাট বাঁধিয়া নূতন শিলা উৎপন্ন হইতেছে। এক্ষণে আমরা ধ্বংস ও সৃষ্টির কারণ সমূহ বর্ণনা করিব।

ধ্বংস। বস্তু সমূহ উত্তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রসারণের ও সঙ্কোচনের হার সমান নহে, অর্থাৎ সমান ভাবে উত্তপ্ত বা শীতল হইলে কোন বস্তু অধিক এবং কোন বস্তু অল্প পরিমাণে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পালল শিলার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিলা থাকে, আর প্রত্যেক স্তর যে এক উপাদানে গঠিত তাহা নহে। যেমন

গ্রানাইটের মধ্যে অভ্র, কোয়ার্টজ্‌ ও ফেল্‌স্‌পার আছে; শিলার এই সকল বিভিন্ন উপাদান **সূর্যের উত্তাপে** বিভিন্ন পরিমাণে প্রসারিত এবং শৈত্যে বিভিন্ন পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং **ঋতু পরিবর্তনের** সঙ্গে সঙ্গে অসমান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে উহারা ফাটিয়া যায় এবং অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়। বায়ু কর্তৃক নীত হইয়া **বালুকার কণা** এই সকল ফাটলে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বাড়াইয়া দেয়। তুহিনাবৃত পর্বতের ফাটলে ফাটলে গ্রীষ্মকালে গলিত **তুহিন** প্রবেশ করে, অন্যান্য শিলার ফাটলেও **জল** প্রবেশ করিতে পারে। শীতকালে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। তোমরা পরে দেখিবে যে জল বরফে পরিণত হইলে উহার আয়তন বর্ধিত হয়। শিলার ফাটলের মধ্যেও জল যখন বরফে পরিণত হয়, তখন উহার আয়তন বর্ধিত হইয়া থাকে। জলের এই বর্ধন শক্তি দুর্দমনীয়, কিছুতেই তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এই শক্তির প্রভাবে শিলাগুলি ফাটলের রেখায় ভগ্ন হইয়া যায়। কতকগুলি শিলা আবার সছিদ্র থাকে, এই সকল ছিদ্রে জল প্রবেশ করিলেও শিলাগুলি উক্তরূপে চূর্ণ হয়। তুহিন বা জল এইরূপে পর্বতাদির শিলা সমূহকে ভগ্ন করিলে পৃথিবীর **অভিকর্ষ বল** (Gravity) প্রভাবে ভগ্ন বা চূর্ণ অংশ সমূহ নিম্নতর স্থানে নামিয়া আইসে।

ঝটিকার ক্রমান্বয় আঘাতেও পর্বতের অংশ সমূহ আল্‌গা হইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু, বড় বড় শিলাখণ্ডকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলেও বায়ুপ্রবাহ ক্ষুদ্রতর শিলাখণ্ড এবং বালুকা, ধূলি প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণকে অনায়াসে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়।

বৃষ্টি হেতুও পর্বতের বা উচ্চতর স্থানের ভগ্ন ও চূর্ণ শিলাখণ্ড সমূহ

নিম্নতর স্থানে নামিয়া আইসে। বৃষ্টির রাসায়নিক ক্রিয়া শিলা ধ্বংসের যথেষ্ট সাহায্য করে। বায়ুর নানাপ্রকার উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া বৃষ্টির জল সামান্য অম্লরসাত্মক (Acid) হয়। অ্যাসিড্ নানাবিধ শিলা দ্রবীভূত করিতে পারে বলিয়া, চূণাপাথর, সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি দ্রবীভূত হয়। গ্রানাইটের অন্তর্গত ফেল্স্পারও বহুদিন বৃষ্টির জল পাইয়া নরম ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

বৃষ্টির জল ভূত্বকের প্রবেশ্য (permeable) শিলার বহিস্তর ভেদ করিয়া ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; নিম্নে কোন অছিদ্র শিলার স্তরে উহার গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে, উহা তখন উক্ত অছিদ্র শিলাস্তরের উপর দিয়া চলিতে থাকে। এই স্তর যে স্থানে ভূপৃষ্ঠের সহিত মিলিত হয়, তথায় উক্ত জল **প্রস্রবণ** রূপে নির্গত হইয়া থাকে।

১৭নং চিত্র

ভূত্বকের মধ্য দিয়া গমন কালে, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্তর ভেদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্রবণ রূপে নির্গমন পর্যন্ত, বৃষ্টির জল ভূত্বকের অন্তর্গত শিলা সমূহকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করিয়া থাকে।

পর্বতের ন্যায় কোন উচ্চ ভূখণ্ডের পাদদেশে যদি উক্ত প্রকার

প্রস্রবণ থাকে এবং নিম্নের স্তরটি যদি মৃৎশিলাদির ন্যায় নরম ও অপ্রবেশ্য শিলায় এবং উপরের স্তরটি কঠিন ও প্রবেশ্য শিলায় গঠিত হয়, তাহা হইলে প্রস্রবণ নিম্নের নরম শিলার স্তরটিকে ক্রমশ ক্ষয় ও পিচ্ছিল করিয়া থাকে। নিম্নের স্তরটি এইরূপে বিধ্বস্ত ও পিচ্ছিল হইলে, উপরের কঠিন শিলাস্তরের অবলম্বন বা ভিত্তি দুর্বল হয়, এরূপ অবস্থায় উপরের স্তর বা পাড়ের শিখর কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারে? উহা পৃথিবীর অভিকর্ষবল প্রভৃতির প্রভাবে নিম্নে গড়াইয়া পড়ে। ইহার নাম **ধস্** (Land Slide)। ১৮নং চিত্র দেখ। পাদদেশে প্রস্রবণ না থাকিলে যে পাড়ের ধস্ হইবে না তাহা নহে, পাড়ের নিম্নস্তর নরম শিলার

১৮নং চিত্র

হইলে এবং তাহার মধ্যে কোন প্রকারে জল প্রবেশ করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিলেই ধস্ হইতে পারে।

নদীর গতিবেগ বশত পর্বতের ভগ্ন অংশ গুলি নদীর স্রোতের সহিত নামিয়া আসিতে পারে। এই প্রকারে নামিয়া আসিবার সময়, পর্বতগাত্রে ক্রমাগত ঘর্ষণ বশত উহাদের সূক্ষ্ম ধার ও কোণগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং উক্ত ভগ্ন শিলাগুলি ক্রমশ মসৃণ ও ক্ষুদ্র হইতে থাকে। এই প্রকারে উপলখণ্ড (Pebble) উৎপন্ন হয়। পর্বত-

পৃষ্ঠের মৃত্তিকা, বালুকা, ও পূর্বোক্ত উপলখণ্ডগুলি নদীর স্রোতের সহিত অক্লেশে নামিয়া আসিতে পারে। সমতলে উপস্থিত হইলে নদীর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়, এবং উপর হইতে আনীত কতকগুলি উপলখণ্ড নদীতলে থাকিয়া যায়। কোন স্থানে এইরূপ অধিক উপলখণ্ড জমিলে, ইহারা নদীর গতিকে বাধা প্রদান করিতে পারে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হইলে ভূভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং চারিদিক হইতে শিলার চূর্ণীকৃত ও ক্ষয়িত অংশ সমূহ নদীতে আসিয়া পতিত হয়। এই সময় নদীর আকার বর্ধিত হওয়ায়, উহা দুই কূল প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতে থাকে এবং পূর্বোক্ত জমা উপলখণ্ডগুলিকে সমুদ্রে লইয়া যায়।

নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যত ঊর্ধ্বে উঠা যায়, বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তত কমিতে থাকে, এই জন্য মেরুপ্রদেশদ্বয় এবং উচ্চ পর্বতের শিখরগুলি সকল ঋতুতে সর্বদা তুহিন মণ্ডিত থাকে, কখন কখন এই তুহিন, বরফ রূপে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে। শীতকালে ঘৃত বা নারিকেল তৈল যেরূপ অবস্থায় থাকে, উক্ত তুহিন সেইরূপ সান্দ্র (অর্ধকঠিন) অবস্থায় নামিয়া থাকে, ইহার নাম **হিমবাহ** (Glacier)। হিমবাহের পথে কোন শিলা, কোন কারণে পূর্বে ভগ্ন হইয়া থাকিলে, ভগ্ন অংশগুলি হিমবাহের সহিত নামিয়া আইসে। প্রকৃতপক্ষে, স্তূপীকৃত বহু ভগ্ন শিলাকে হিমবাহের সহিত নামিয়া আসিতে দেখা যায়; তবে উহারা নদীর যেরূপ নিম্নে পড়িয়া যায়, হিমবাহের সেরূপ কেবল নিম্নে না পড়িয়া উপরে এবং পার্শ্বেও লাগিয়া থাকে। এই সকল ভগ্ন শিলার স্তূপগুলিকে **মোরেণ** (Moraine) কহে।

হিমবাহ যে স্থান দিয়া নামে সেই স্থানের শিলাগুলি ঘর্ষণ বশত

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং মোরেণের শিলাগুলিও উক্ত কারণে মসৃণ ও সুচল হইয়া থাকে; ঘর্ষণের ফলে শিলাগুলির কতক অংশ বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিলাংশে পরিণত হয়।

মেরুপ্রদেশের অধিকাংশ স্থলভাগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের স্তরে আবৃত থাকে। হিমবাহের ন্যায় ইহারাও ধীরে ধীরে নিম্নদিকে গমন করে, এবং সেই সময় বহু প্রস্তরখণ্ড, কঙ্কর, মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতি এই সকল বরফপিণ্ডের তলভাগে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই সকল বরফপিণ্ড ক্রমশ সমুদ্রে উপস্থিত হয়, এবং তথায় বায়ু-প্রবাহ, সমুদ্রের স্রোত ও জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি নানা কারণে বড় বড় খণ্ডে ভগ্ন হইয়া ভাসিতে থাকে, এই সকল ভগ্ন বরফখণ্ডের আকার অতি বৃহৎ, এক একটি এমন কি ২।৩ মাইল দীর্ঘ ও ২।১ মাইল উচ্চ হইয়া থাকে। এই সকল বরফখণ্ডের নাম **আইস্‌বার্গ** (Iceberg)।

এতক্ষণ তোমরা দেখিলে যে, ঋতুপরিবর্তন, তুহিন, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি, প্রস্রবণ, নদী, হিমবাহ প্রভৃতির দ্বারা শিলাসমূহ চূর্ণ, বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এবং নদী, হিমবাহ, অভিকর্ষ বল, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা উক্ত চূর্ণ ও ক্ষয়িত অংশ সমূহ অপসৃত হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের ভিতরের অংশ উন্মোচিত হয়। ভগ্ন, চূর্ণীভূত বা ক্ষয়িত অংশ সমূহ যে ভাবেই অপসৃত হউক, শেষ পর্যন্ত উহারা নদীকর্তৃক হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে নীত হইয়া থাকে; তখন পর্যন্ত কিন্তু ধ্বংসলীলার অবসান হয় না, সর্বশেষে **সমুদ্র** নিজে ধ্বংসলীলার সাহায্যে অগ্রসর হয়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা সমুদ্র দেখিয়াছ তাহারা জান যে উহার বেগ কি ভীষণ! সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সর্বদা তীরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, বিশেষত ঝড়ের সময় সমুদ্রতরঙ্গ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া প্রচণ্ড

বেগে তীরে আছাড় খাইয়া স্থলাভিমুখে অতি বেগে ছুটিয়া যায়। এই আঘাতে অনেক শিলা ভগ্ন হয়, এমন কি তীরবর্তী পর্বত হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সমূহ চূর্ণ ও স্থানচ্যুত হইয়া যায়। স্থলাভিমুখে সমুদ্র-প্রবাহ যতদূর যাইতে পারে, ততদূর হইতে তীরভূমিকে যেন কাটিয়া লইয়া আইসে, সুতরাং সমুদ্রের পাড় সাধারণত ঢালু না হইয়া উর্দ্ধাধ হয় অথবা উহার শিখর সমুদ্রের দিকে হেলিয়া থাকে ১৯নং চিত্র দেখ।

পাড় উর্দ্ধাধ ভাবে থাকিলে, বা উহার শিখর সমুদ্রের দিকে হেলিয়া থাকিলে, কেবল অভিকর্ষ বলপ্রভাবেও উহার অংশসমূহ
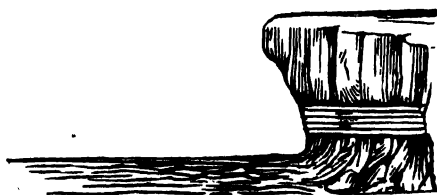
১৯নং চিত্র

স্থানচ্যুত হইয়া পতিত হইতে পারে; অধিকন্তু বৃষ্টিতে ধৌত এবং (নরম শিলায় গঠিত হইলে) গলিত হইয়া পাড়ের কোন কোন অংশ নামিয়া আসিতে পারে।

পাড়ের কোন বদ্ধমুখ ফাটলে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিলে, তরঙ্গের চাপ বশত ফাটলের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ বর্ধিত হয়, জল ফিরিয়া আসিবার সময় তরঙ্গের চাপ হ্রাস হয়, সুতরাং ফাটলের মধ্যস্থ বায়ুর চাপও অকস্মাৎ কমিয়া যায়, এবং বায়ু চতুর্দিকে প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে। বায়ুর এই আকস্মিক প্রসারণ বল অত্যন্ত অধিক, কিন্তু সমুদ্রের দিক ভিন্ন ফাটলের অন্য কোন দিক খোলা না থাকায় উহা পাড়ের

অপর দিক চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপে সমুদ্র বায়ুর সাহায্যে পাড়ের অপর দিকেরও ধ্বংস সাধন করিতে পারে।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের পাড় ভগ্ন হইলে যে সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিলাখণ্ড সমুদ্রকূলে পতিত হয়, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তাহারা পুনরায় পাড়ে আঘাত করে, ফলে পাড় আরও ভাঙ্গিতে থাকে। সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গ বশত শিলাখণ্ডগুলি অবিরত পরস্পর ঘর্ষিত হইতে হইতে যথাক্রমে উপলখণ্ড, কঙ্কর, স্থূলদানা ও সূক্ষ্মদানা বালুকাতে পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপে সমুদ্রের বিশাল বালুকাময় সৈকতের উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টি। ভূপৃষ্ঠ কিরূপে বিধ্বস্ত ও নগ্নীভূত হইতেছে তাহা দেখিলে, কিন্তু এই সকল বিধ্বস্ত অংশ সমুদ্রে পলিরূপে পতিত হইবার পর উহাদের পরিণাম কি হয়? এই সকল অংশ স্তরে স্তরে জমাট বাঁধিয়া নূতন শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে, নগ্নীভবনকালে আগ্নেয়, পালল প্রভৃতি সর্বপ্রকার শিলা বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু তাহাদের অংশ সমূহ হইতে কেবল পালল শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নগ্নীভবনের ফলে শিলার যে সকল অংশ সমুদ্রে পতিত হয়, তন্মধ্যে বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ উপলখণ্ডগুলি সমুদ্রের কিনারার দিকে, এবং সূক্ষ্মতর অংশ অর্থাৎ বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি বাহির সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত হইয়া পতিত হয়; তাহারও বাহিরে নানাবিধ দ্রবীভূত পদার্থ পতিত হইয়া থাকে। কূল হইতে সমুদ্রের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত এই সমস্ত অংশ বিস্তৃত হয়, তাহাকে **পলিক্ষেত্র** (Area of mechanical deposit) কহে। এই ক্ষেত্র সমুদ্রের কূল হইতে আরম্ভ হয় এবং কূল হইতে অনধিক দূরে সমাপ্ত হয়, সুতরাং ইহার ক্ষেত্রফল নগ্নীভূত সমগ্র স্থলভাগের তুলনায় অত্যন্ত অল্প; এই অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষেত্রের

উপর নগ্নীভূত সমগ্র স্থলভাগের অংশ সমূহ পতিত হয়। নগ্নীভবনের ফলে স্থলভাগ গড়ে প্রায় ১২০০ বৎসরে ১ ফুট হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল ক্ষয়িত অংশ সমুদ্রমধ্যে অল্প স্থানে জমা হয় বলিয়া, শেষোক্ত স্থানে উহা অধিক উচ্চ হইয়া (গড়ে প্রায় ৮০ বৎসরে এক ফুট হারে) জমিয়া থাকে, অর্থাৎ নগ্নীভবনের ফলে স্থলভাগের উচ্চতা যে পরিমাণ হ্রাস হয়, সমুদ্রমধ্যে পলি তাহার প্রায় ১৫ গুণ অধিক উচ্চ হইয়া জমিয়া থাকে।

(১) কতকগুলি নরম চূর্ণকে চাপের অধীনে রাখিলে কিছুদিন পরে উহারা জমাট বাঁধিয়া যায়। সমুদ্রতলে যে সকল পলি পতিত হয় তাহার উপর আরও চূর্ণ আসিয়া পড়ে, তদুপরি আবার জল আছে, সুতরাং নিম্নের চূর্ণগুলির উপর উপরের চূর্ণের এবং জলের চাপ পতিত হয়। এইরূপে নিম্নের চূর্ণগুলি জমাট বাঁধিতে পারে। (২) চূর্ণগুলির ব্যবধানে দ্রবীভূত চূণের কার্বণেট, লৌহের অক্সাইড, সিলিকা প্রভৃতি প্রবেশ করে, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহারা ক্রমশ অদ্রাবণীয় হইয়া থাকে। অদ্রাবণীয় হইলে ইহারা সিমেণ্টের কার্য করে, সুতরাং চূর্ণ-গুলিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া থাকে। (৩) চূর্ণগুলির মধ্যে জলকণা প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে সংবদ্ধ হইবার সহায়তা করে। (৪) উত্তাপের সাহায্যেও চূর্ণগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। প্রথমোক্ত তিন উপায়ে চূর্ণগুলি জমিয়া পাললশিলায় পরিণত হয়; এবং পুরাতন স্তরের উপর নূতন স্তর জমিয়া থাকে। উত্তাপ সংযুক্ত হইলে শিলাগুলি সাধারণত রূপান্তরিত হয়।

ভূ-চলন (Earth Movements)

একটি বেগুন অগ্নিতে ঝলসাইয়া লইলে, উহার ভিতরের নরম অংশ সঙ্কুচিত হয়, অর্থাৎ উক্ত অংশের আয়তন কমিয়া যায়, বেগুনের ত্বকের আয়তন কিন্তু কমে না, সুতরাং ত্বকটি আর নিটোল থাকিতে পারে না, উহা বাঁকিয়া অসমতল হয়। তোমরা জান যে পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যন্তর হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতেছে, ফলে উহার আয়তন হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ উহা সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু ভূত্বকের আয়তন অভ্যন্তরের আয়তনের ন্যায় কমিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তর ও ত্বকের মধ্যে ফাঁক থাকা উচিত, কিন্তু ইহা অসম্ভব। সেইজন্য ভূত্বককে ঝলসান বেগুনের ত্বকের ন্যায় বাঁকিয়া অসমতল হইতে হয়। ইহার ফলে ভূত্বকের কোন স্থান উন্নত ও কোন স্থান অবনমিত হইয়া থাকে। ভূত্বকের তথা ভূপৃষ্ঠের উন্নয়ন ও অবনয়ন এখনও চলিতেছে। এই উন্নতি ও অবনতি চিরস্থায়ী নহে। আজ যে স্থান বৃক্ষলতাদিপূর্ণ উচ্চ স্থলভাগ, কিছুকাল পরে হয়ত তাহা অবনমিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিবে; আজ যে স্থান সমুদ্রের তলদেশ গঠন করিয়া আছে, কিছুকাল পরে, হয়ত তাহা উন্নত হইয়া পৃথিবীর স্থলভাগরূপে বিরাজিত হইবে। তোমরা বোধহয় শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত, অভ্রভেদী হিমালয় একদিন সমুদ্রগর্ভে ছিল। ভূত্বকের এই প্রকার উন্নতি ও অবনতিকে **ভূ-চলন** (Earth Movement) বলে। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত উপর্যুপরি হইতে থাকিলে দ্রুত ভূ-চলন লক্ষিত হয়।

ভূমিকম্প। ভূপৃষ্ঠের কম্পন বা স্পন্দনের নাম **ভূমিকম্প** (Earthquake)। কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বহুকাল বন্ধ থাকিবার ফলে

উহার মুখ প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়, পুনরায় অগ্ন্যুৎপাতের সময় এত প্রচণ্ডবেগে উক্ত মুখ খুলিয়া থাকে, যে সেই বেগ চতুর্দিকে বহু মাইল ভুভাগকে স্পন্দিত করে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরিতে অকস্মাৎ প্রচুর স্টীম উৎপন্ন হইলেও ভূমিকম্প হইয়া থাকে। যখন কোন ভাঁজবিশিষ্ট শিলার চ্যুতি (৬৪ পৃঃ দেখ) হয়, তখন নিকটস্থ-স্থানের ভূপৃষ্ঠে প্রবল কম্পন অনুভূত হয়। ভূচলন বশত কোন ভূভাগ অকস্মাৎ উন্নত হইলে সেই স্থানে, এবং পর্বতের যেদিক ঢালু না হইয়া উর্দ্ধাধভাবে থাকে সেইদিকে ভূত্বক সাধারণত অল্প মজবুত হয়। কোন কারণে ভূত্বকের কোন অংশ অল্প মজবুত হইলে, সেই স্থান দিয়া অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ সমূহ নির্গত হইবার চেষ্টা করে, ফলে উহা সেই দুর্বল স্থানের উপর জোরে ধাক্কা দেয় এবং সন্নিকটস্থ ভূপৃষ্ঠ স্পন্দিত হইয়া থাকে।

প্রবল ভূমিকম্পের ফলে অট্টালিকাদি ফাটিয়া, ভাঙ্গিয়া বা পড়িয়া যায় এবং ভূপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটল এমনকি হ্রদের সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপে ভূমিকম্প হেতু স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়, এমনকি জমির উন্নতি বা অবনতি পর্যন্ত হইতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে, গ্রাম, নগর বা এক একটি প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। গত বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্পে উক্ত প্রদেশ সমূহ কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে। জাপান প্রভৃতি কোন কোন দেশে নিত্য ভূমিকম্প লাগিয়া আছে। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তরঙ্গ এবং শব্দ-তরঙ্গও ব্যাহত হয়। সিস্‌মোগ্রাফ (Seismograph) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান, এবং উহার প্রসার ও প্রাবল্য নির্ণয় করা যায়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি যে কেবল স্থলভাগে আবদ্ধ তাহা নহে, সমুদ্র-

গর্ভেও উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সময় পালল শিলা সমূহ সমুদ্র হইতে উন্নত হইয়া স্থলের সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা সমুদ্রের তীরবর্তী স্থান সকল অবনমিত হইয়া সমুদ্রের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারে। সমুদ্রে ভূমিকম্পের সময় তীরভূমি হইতে জল প্রথমে বহুদূর অপসৃত হইয়া যায়, পরে অতি উচ্চ হইয়া ভীষণ বেগে তীর অভিমুখে ছুটিয়া আইসে এবং তীরভূমিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

শিলার ভাঁজ (Foldings of Rock)

একখানি টিনের ফলককে ইংরাজী অক্ষর "U"এর আকারে বাঁকাও। Uএর দুই বাহু যত উচ্চ করিবে উহাদের ব্যবধান তত কমিতে থাকিবে, সুতরাং বাহু দুইটির অন্তর্গত কোন বস্তুর উপর তত চাপ পড়িতে থাকিবে। ফলকখানি টিনের না হইয়া যদি স্থূল লৌহ
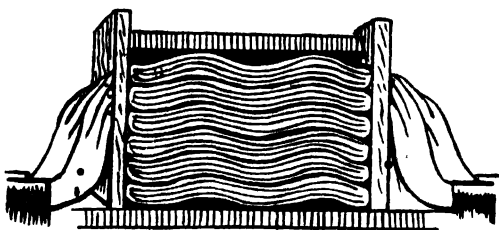
২০নং চিত্র

নির্মিত হয় তাহা হইলে বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত বস্তুর উপর কিরূপ চাপ পড়িবে তাহা অনুমান করিতে পার। ভূ-চলনের ফলে ভূত্বকের দুই উন্নত স্থানের মধ্যবর্তী স্তরীভূত শিলার উপর দুই পার্শ্ব হইতে এইরূপ চাপ পড়িতে থাকে। ভূত্বকের পার্শ্বীয় চাপের প্রভাবে স্তরীভূত শিলাগুলি তরঙ্গায়িত বা ভাঁজবিশিষ্ট (Folded) হইয়া যায়।

কতকগুলি পাট-করা কাপড় উপর্যুপরি সাজাও এবং তদুপরি একখানি ভারী কাষ্ঠ ফলক চাপা দাও। এইবার উক্ত কাপড়ের স্তূপে দুই পার্শ্ব হইতে জোরে চাপ দিতে থাক; এইরূপ করিলে দেখিবে যে কাপড়গুলিকে অপেক্ষাকৃত অল্পস্থানে থাকিতে হইতেছে বলিয়া উহারা ক্রমশ তরঙ্গায়িত হইতেছে। ২০নং চিত্র দেখ। শিলার স্তরগুলিও ঠিক এইরূপে ভূত্বকের পার্শ্বীয় চাপের প্রভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে।
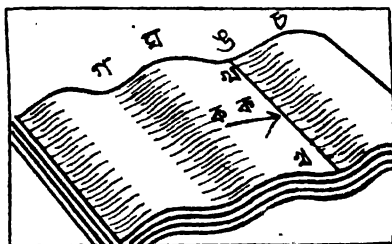
২১নং চিত্র

ইহার নাম **ভঙ্গ** বা **ভাঁজ** (Folding)। স্তরের ভাঁজগুলি ক্ষিতিজের উপর যে পরিমাণে হেলিয়া থাকে তাহার নাম **বিনতি কোণ** (Angle of Dip), এবং উক্ত ভাঁজের পৃষ্ঠে যে সরলরেখা সোজা নিম্নাভিমুখে টানা হয়, তাহার নাম **বিনতি** (Dip)। ভাঁজের পৃষ্ঠে বিনতির উপর লম্ব টানিলে যে সরল রেখাগুলি পাওয়া যায় তাহাদের নাম **বিনতি-লম্ব** (Strike)। ২১নং চিত্রে কক, বিনতি ও খখ, বিনতি-লম্ব; ভঙ্গের যে অংশ দুইদিকে নামিয়া গিয়াছে (গঘঙ) তাহার নাম **খিলান** (Anticline বা Arch), এবং যে অংশ দুইদিকে উর্ধ্বে উঠিয়াছে (ঘঙচ) তাহার নাম **দ্রোণী** (Syncline বা Trough)। প্রত্যেক খিলান বা দ্রোণী, যে রেখার (খখ) উপর ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার নাম **অক্ষ** (Axis); ভাঁজের বিনতি-লম্বগুলি উহার অক্ষের

সহিত সমান্তরালভাবে থাকে। দুইটি সন্নিহিত খিলান ও দ্রোণী একত্রে একটি **ভাঁজ** উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রত্যেক ভাঁজের তিনটি করিয়া বাহু আছে। প্রথম উন্নত বাহুটির (গঘ), নাম খিলানবাহু দ্বিতীয় উন্নত বাহুটির নাম (ঙচ) দ্রোণীবাহু এবং মধ্যবর্তী বাহুটির (ঘঙ) নাম মধ্যবাহু। ভঙ্গের অক্ষগুলির উপর যে উর্ধ্বাধ তল কল্পিত হয়, সন্নিহিত বাহুদ্বয় যদি তাহার সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে তাহা হইলে ভঙ্গকে সুষম, এবং কোণদ্বয় অসমান হইলে উহাকে বিষমভঙ্গ বলা হয়। অতিরিক্ত পার্শ্বীয় চাপের প্রভাবে কোন ভাঁজের এক দিকের স্তরগুলি ক্ষিতিজের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত হইতে, এমন কি উপর হইতে নীচে উল্টাইয়া পড়িতে পারে, এরূপ ভাঁজকে **অতিভাঁজ** (Over Fold বা Inverted Fold) আখ্যা দেওয়া হয়। কোন কোন স্তরীভূত শিলার উপর সমকোণে দুইপ্রস্থ পার্শ্বীয় চাপ পড়িতে পারে।

অতিভাঁজ বিশিষ্ট শিলার বাহুগুলি সূক্ষ্মতর হয়, কিন্তু উহাদের
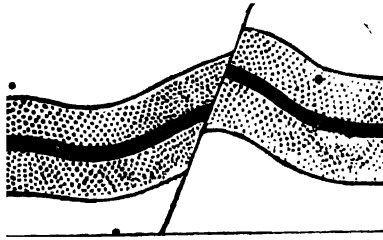
২২নং চিত্র

অক্ষের নিকটবর্তী অংশগুলি স্থূলতর হইয়া থাকে। পার্শ্বীয় চাপ যত অধিক হইতে থাকে, বাহুগুলি তত পাৎলা হইতে থাকে, যখন উক্ত চাপ বাহুগুলির পক্ষে অসহনীয় হয়, তখন কোন একটি মধ্যবাহু

ভগ্ন হয় এবং ভগ্নস্থানের এক পার্শ্বে শিলা উর্দ্ধদিকে এবং অপর পার্শ্বে নিম্নদিকে স্থানচ্যুত হইয়া থাকে, ইহার নাম **চ্যুতি** (Fault)। ২২নং চিত্র দেখ। শিলার এই প্রকার চ্যুতি হইলে নিকটস্থ ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

মৃৎশিলার ন্যায় সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট কোন প্রাচীন পালল শিলাস্তরের উপর ভূত্বকের পার্শ্বীয় চাপ পড়িলে উহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফলকে বিভক্ত হয়, এই ফলকগুলি কিন্তু মূল স্তরের সহিত সমান্তরাল না হইয়া কোণ উৎপন্ন করে, এমন কি কখন কখন ফলকগুলি মূল স্তরের উপর লম্বভাবে থাকিতে পারে, ইহার নাম **সম্ভেদ** (Cleavage)। এই প্রকারে শ্লেট নামক শিলা উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে **শ্লেটীয় সম্ভেদ** (Slaty Cleavage) বলা হয়।

কখন কখন কয়লা প্রভৃতি স্তরীভূত শিলার কোন স্তর উত্তাপ বা পার্শ্বীয় চাপের প্রভাবে স্তরের উপর লম্বভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। ভগ্ন প্রান্তদ্বয়
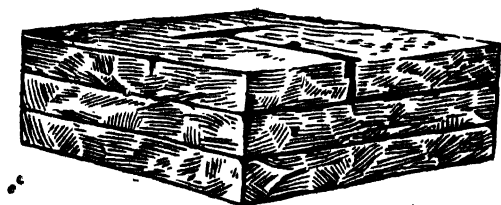
২৩ নং চিত্র

কিন্তু উঠিয়া বা নামিয়া যায় না, অর্থাৎ স্তরের মধ্যে কেবল একটি ফাটল হয় এবং এই ফাটলটি স্তরের উপর লম্বভাবে অবস্থিত থাকে। সাধারণতঃ উক্ত ফাটল এবং স্তর উভয়ের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করিয়া আর একটি ফাটল হইয়া থাকে। এই সকল ফাটলের নাম **বিদার**

(Joint)। প্রথমোক্ত ফাটলটিকে **প্রধান বিদার** (Master Joint) বলা হয়। ২৩নং চিত্রে দুইটি বিদার দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্মুখের বিদারটি প্রধান।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

যে সকল পর্বতের শিখর বা পৃষ্ঠ হইতে একটি বা একাধিক সুড়ঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এবং এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অভ্যন্তর হইতে স্টীম, ধূম, ভস্ম, গলিত প্রস্তর ও ধাতু প্রভৃতি নির্গত হইয়া পর্বতগাত্রে পতিত হয় বা পূর্বে পতিত হইত, সেই সকল পর্বতের নাম **আগ্নেয়গিরি**। আগ্নেয়গিরির যে স্থান হইতে উক্ত পদার্থসমূহ নির্গত হয়, তাহার নাম **জ্বালামুখ** (Crater)।

পণ্ডিতগণ পূর্বে অনুমান করিতেন যে, ভূত্বকের মধ্যস্থিত কোন ফাটল দিয়া সমুদ্রের জল পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে গমন করিলে, উহা অভ্যন্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই স্টীমে পরিণত হয়, এই স্টীম ভূত্বকের উপর প্রচণ্ড ভাবে চাপ দিয়া থাকে। এবম্প্রকারে উৎপন্ন চাপের প্রভাবে ভূত্বকের কোন অল্পমজবুত অংশ ভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই পথে অভ্যন্তরের গলিত দ্রবপদার্থ সমূহ ভীষণ বেগে নির্গত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এইরূপে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু অধুনা আমরা জানি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে রেডিয়ম প্রভৃতি এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহাদিগের অণুগুলি স্বতঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ বিকিরণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা তাপীয় শক্তিতে পরিণত হইয়া কঠিন ভূ-অভ্যন্তরকে গলাইয়া তরল করিতে পারে এবং ভূ-অভ্যন্তরের জলীয় উপাদান স্টীম পরিণত হয়। এই স্টীমের চাপ প্রভাবে ভূ-অভ্যন্তরের তরলীভূত উপাদান সমূহ ভূত্বক ভেদ

করিয়া ভীষণ বেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে তোমরা রেডিয়ম প্রভৃতি উক্ত সক্রিয় বস্তুগুলির (Radio Active Substances) বিষয় জানিতে পারিবে।

আগ্নেয়গিরি হইতে পদার্থ সমূহ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিন প্রকার অবস্থায় নির্গত হয়। (১) কঠিন বস্তুর মধ্যে প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ, ধূলি, ভস্ম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (২) পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে নির্গত অত্যুত্তপ্ত ও গলিত ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতি তরল বস্তুর নাম লাভা (Lava)। প্রথমে স্টীমের সহিত মিশ্রিত হইয়া লাভা বুদ্বুদের আকারে উৎক্ষিপ্ত হয়, পরে উহা পর্বতগাত্রে গড়াইয়া পড়িতে থাকে। নির্গত হইবার পর লাভার বহির্ভাগ শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, কিন্তু উহার অন্তর্ভাগ অত্যন্ত ধীরে ধীরে শীতল হইতে থাকে, এমন কি উহা বহু বর্ষ ধরিয়া শীতল হয়। ধীরে ধীরে শীতল হওয়ার ফলে লাভার অভ্যন্তর ভাগ কেলাসিত হইয়া ফেল্স্পার, অভ্র প্রভৃতি নানাবিধ স্ফটিক (Crystals) উৎপন্ন হয়। (৩) গ্যাসীয় বস্তুর মধ্যে স্টাম এবং নানাপ্রকার গ্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্গত স্টীম শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আগ্নেয়গিরির পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং ভস্মাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া **কর্দমস্রোত** (Mud Stream) সৃষ্টি করে। এই প্রকার কর্দমস্রোতে গ্রাম নগরাদির সমাধি হইতে পারে।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখে বা আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গের মধ্যে যে সকল প্রস্তরখণ্ড থাকে তাহারা সাধারণত চূর্ণ হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রস্তর পুনরায় জ্বালামুখে পতিত হয়, তাহারা পুনরায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বারংবার উৎক্ষেপণের ফলে ভগ্ন হইতে হইতে উহারা ক্রমশ ক্ষুদ্রতর এবং গোলাকার হইয়া যায়। এই সকল প্রস্তরখণ্ড পরে পর্বতগাত্রে বা উহার সন্নিহিত প্রদেশে

স্তূপাকারে জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাদিগের নাম **আগ্নেয় স্তূপশীলা** (Volcanic Agglomerate)।

বর্তমান কালে পৃথিবীতে প্রায় তিন শত **জীবন্ত** আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষ্ট্রম্বলির (Stromboli) ন্যায় কোন কোন আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত **নিরবচ্ছিন্ন** ভাবে হইয়া থাকে, এবং বিসুবিয়সের (Vesuvius) ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত **সবিরাম** ভাবে হইয়া থাকে। পূর্বের অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত পদার্থ সমূহ কঠিন হইয়া

২৪নং চিত্র

সবিরাম আগ্নেয়গিরির বহির্মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, এবং পুনরায় অগ্ন্যুৎপাতের সময় সর্বপ্রথমে উক্ত কঠিন বস্তু সমূহ ভীষণ বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। (১৮৭২ খৃঃ অব্দে বিসুবিয়সের যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে প্রস্তরাদি পদার্থ সমূহ ৫ মাইলের অধিক উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল)। উক্ত দুই শ্রেণির আগ্নেয়গিরি ব্যতীত আর এক শ্রেণির

আগ্নেয়গিরি আছে, তাহাদের অগ্ন্যুৎপাত চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে **মৃত** আগ্নেয়গিরি বলা হয়।

জ্বালামুখ ব্যতীত আগ্নেয়গিরির গাত্রের ফাটল দিয়া কখন কখন লাভা গড়াইয়া পড়ে, এই সকল ফাটল আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গের শাখা। অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হইলে এই সকল ফাটলের মধ্যেও লাভার স্তর জমিয়া যায়। এই প্রকার লাভার স্তরের নাম **সিল্** (Sill)। ভূত্বকের মধ্যে বহুস্থানে জমাট বাঁধা লাভার পাত দেখা যায়। ইহাদের এক প্রান্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরের সহিত অথবা কোন আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গের সহিত যুক্ত থাকে। কতকগুলি পাতের অপর প্রান্ত ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই, উহারা ভূত্বকের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ লাভার পাতগুলিকে **ডাইক্** (Dyke) বলে। ডাইক্‌গুলি অগ্ন্যুদ্গীরণের অসম্পূর্ণ চেষ্টার ফল। ২৪নং চিত্র দেখ।

সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রগর্ভে যে সকল আগ্নেয়গিরি থাকে, তাহা হইতে উত্তপ্ত লাভা সমুদ্রমধ্যে পতিত হইয়া, পালল শিলার উপর আগ্নেয় শিলার স্তর উৎপন্ন করিয়া থাকে ; বহু জলচর প্রাণী এবম্প্রকার আগ্নেয়শিলার নিম্নে জীবাশ্মিত হয়।

আগ্নেয় শিলা

আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত হইয়া লাভা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে উহার বহির্ভাগ বিনা চাপে ও দ্রুত শীতল হইয়া শিলায় পরিণত হয়, এবং তাহার মধ্য হইতে প্রায় সমস্ত জলীয় অংশ বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। সেইজন্য এই অংশ স্ফটিকে পরিণত না হইয়া কাল **কাচের ন্যায়** শিলায় পরিণত হয়। অবসিডিয়ান (Obsidian) প্রভৃতি শিলা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নির্গত লাভার ভিতরের অংশ কিন্তু

উপরের অংশের অল্প চাপে এবং ধীরে ধীরে শীতল হয়, সেইজন্য উহার মধ্যে **ক্ষুদ্রাকার স্ফটিক** উৎপন্ন হয়। ভূপৃষ্ঠের অল্প নিম্নে, সুড়ঙ্গ বা ডাইকের মধ্যেও উক্তরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিক দেখা যায়। বেসল্ট্ প্রভৃতি শিলা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত দুই প্রকার আগ্নেয় শিলাকে **আগ্নেয়গিরিজ শিলা** (Volcanic Rock) আখ্যা দেওয়া হয়। লাভার যে অংশ ভূপৃষ্ঠের বহু নিম্নে সিল বা ডাইক্ সৃষ্টি করে, অথবা ভূত্বকের নিম্নে জমাট বাঁধে, তাহা অতি ধীরে ধীরে এবং ভূত্বকের গুরু চাপের অধীনে শীতল হয়, অধিকন্তু উহা হইতে জলীয় বাষ্প বাহির হইতে পারে না। সেইজন্য উহা **বড় বড় স্ফটিকে** পরিণত হয়। সাধারণত আগ্নেয়গিরি প্রদেশের বহু নিম্নে এই প্রকার আগ্নেয় শিলা পাওয়া যায়। ইহাদের নাম **বারুণ শিলা** (Plutonic Rock)। গ্রানাইট, সাইনাইট (Syenite) প্রভৃতি বারুণ শিলার দৃষ্টান্ত।

মাটি (Soil)

তোমরা জান যে ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহ নিত্য বিধ্বস্ত হইতেছে। কেবল ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহ যে নানাকারণে বিধ্বস্ত হয় তাহা নহে। তোমরা শিলাধ্বংসে প্রস্রবণের প্রসঙ্গে দেখিয়াছ যে ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরকঙ্কালও জল প্রবেশের ফলে এবং বৃষ্টির জলের রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানের চূর্ণাংশগুলি কিন্তু অপসৃত হইতে পারে না, সুতরাং উক্ত প্রস্তরকঙ্কাল ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত শিলায় আবৃত থাকে। সাধারণত উপরের চূর্ণ অংশগুলি নিম্নের চূর্ণ অংশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম হয়। প্রস্তরকঙ্কালের উপর এই ভগ্ন ও চূর্ণ শিলার স্তরের

নাম **অন্তর্ভূমি** (Sub Soil)। মৃত উদ্‌ভিদ্‌ ও প্রাণিগণের পচন হেতু যে অ্যাসিড্‌ উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা, এবং জীবিত বৃক্ষলতাদির শিকড় প্রবেশ করে বলিয়া, অন্তর্ভূমির বহির্ভাগ আরও বিধ্বস্ত হয়, ফলে উহা সূক্ষ্মতর নরম দানার স্তরে পরিণত হইয়া থাকে। এই স্তরের নাম জমি বা মাটি (Soil)। কেঁচো প্রভৃতি মৃদ্‌ভক্ষণকারী প্রাণিগণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া উহা হইতে সারাংশ গ্রহণ করে এবং অসারাংশ বাহির করিয়া দেয়। উহাদের দেহ মধ্যে মৃত্তিকা আরও চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল নানা কারণে শিলা সমূহ অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হইয়া জমি বা মাটি উৎপন্ন হয়।

মাটিতে আমরা প্রধানত দুই প্রকার শিলাচূর্ণ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে যেগুলি কোয়ার্টজের ন্যায় কেলাসিত শিলার চূর্ণ তাহাদের নাম বালুকা। ইহারা অপেক্ষাকৃত বড় দানায় পরিণত হইয়া থাকে, এবং যেগুলি নরম শিলার চূর্ণ তাহাদের নাম কর্দম (Clay)। ইহারা অতি সূক্ষ্ম দানায় পরিণত হয়। মাটিতে এই দুই প্রকার শিলাচূর্ণই অল্পবিস্তর অনুপাতে থাকে। এতদ্ব্যতীত চুণাপাথরের চূর্ণ, বিভিন্ন প্রকার লবণ, প্রাণী বা উদ্‌ভিদের সটিত দেহ এবং প্রাণীর পরিত্যক্ত মলমূত্রাদি মাটির সহিত মিশ্রিত হয়। মাটিতে এই সকল লবণ ও জৈব পদার্থ থাকিলে উদ্‌ভিদ্‌গণ ইহা হইতে প্রচুর আহার সংগ্রহ করিয়া সতেজে বর্ধিত হইতে পারে। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য জল একান্ত আবশ্যক। যে জমিতে বালুকা অধিক সে জমিতে সহজে জল প্রবেশ করে বটে, কিন্তু বালুকার জলশোষণ ক্ষমতা না থাকায় উক্ত জমি জল ধরিয়া রাখিতে পারে না ; কিন্তু যে জমিতে কর্দম অধিক তাহার মধ্যে অত্যধিক জল প্রবেশ করিতে না পারিলেও কর্দমের জলশোষণ ক্ষমতা বশত উহাতে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে। মাটি হইতে উদ্‌ভিদ্‌গণ

লবণাদি সমস্ত খাদ্য জলে দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করে, সুতরাং যে জমিতে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না, সে জমি হইতে উদ্‌ভিদ্‌গণ উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। সেইজন্য বালুকাপ্রধান অপেক্ষা কর্দমপ্রধান মাটি হইতে উদ্‌ভিদ্‌গণ অধিক আহার প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জমিতে জল এবং জৈব ও ধাতব লবণের উপর উদ্‌ভিদ্‌গণের জীবন প্রধানত নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় আবহাওয়ার উপরেও উহাদিগের জীবন ও বৃদ্ধি নির্ভর করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মমণ্ডলে নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্তী স্থানসমূহ তাল, নারিকেল, শাল প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত। ইহার নাম **বিষুবীয় অরণ্য**। এই অঞ্চলে উদ্‌ভিদ্‌গণ বার মাস প্রচুর বৃষ্টি ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাদের এত বৃদ্ধি। এই অরণ্যভূমির উভয় দিকে অর্থাৎ বিষুবমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূভাগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তৃণ জাতীয় উদ্‌ভিদ্‌সমূহ জন্মে। সেইজন্য এই সকল জমির নাম **তৃণভূমি**। ইহারা পশুচারণের এবং কৃষিকার্যের উপযুক্ত। তৎপরে ক্রমশ গুল্ম ও ঝাউ প্রভৃতি সূচল পত্র বিশিষ্ট উদ্‌ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। উত্তর হিমমণ্ডলের নিকট, জমিতে শৈবাল ভিন্ন অন্য কোন উদ্‌ভিদ্ হয় না। এই অঞ্চলকে **শীতল মরু** (Tundra) কহে। শীতল মরুর উত্তর প্রান্তের চিরতুষারাবৃত স্থানে কোন উদ্‌ভিদ্ জন্মিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরক্ষবৃত্তের যত উত্তর ও দক্ষিণে যাওয়া যায়, উদ্‌ভিদ্‌গণের বৃদ্ধি তত অল্প হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন কোন স্থান জলাভাব বশত এবং জমিতে কর্দমের অভাব বশত উদ্‌ভিদ্‌গণের বাসোপযোগী নহে। এই সকল জমি কেবল বালুকাপূর্ণ। ইহাদিগের নাম **মরুভূমি**। নাগফণা জাতীয় পত্রহীন উদ্‌ভিদ্ ভিন্ন এই সকল বালুকাময় মরুভূমিতে কোন উদ্‌ভিদ্ জন্মে না।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আবার বাংলা প্রদেশে কৃষিই প্রধান জীবিকা, সুতরাং আমরা কৃষিকার্যের উপযোগী মাটির, বিশেষত বাংলার মাটির প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মাটিতে বালুকা, কর্দম, জৈবপদার্থ ও ধাতব লবণের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। (১) যে মাটিতে শতকরা প্রায় ৮০।৯০ ভাগ বালুকা ও অবশিষ্ট ১০।২০ ভাগ কর্দম থাকে, তাহাকে **বেলে** (Sandy) **মাটি** বলে; সমুদ্রতীরে বা নদীর চরে সাধারণত বেলে মাটি দেখা যায়। বেলেমাটিতে ফসল ভাল হয় না, তবে ঝাউ প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বেলেমাটিতে পুনঃ পুনঃ ধঞ্চে, অড়হর প্রভৃতি ফসল চাষ করিলে উহার বালুকার পরিমাণ হ্রাস হইতে পারে। নিকটে ভাল মাটি থাকিলে, অথবা অন্য কোন স্থান হইতে নদীর শিলাচূর্ণ (Silt) এবং নানাপ্রকার জৈব পদার্থ বহন করিয়া আনিলে নদীর কূলে পলি জমে, ইহার নাম **পলিমাটি** (Alluvial Soil)। নদীর চরে তামাক, কচু, তরমুজ, কাঁকুড়, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইতে পারে। (২) মাটিতে শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ বালুকা থাকিলে তাহাকে **বেলে-দোরসা** বা **ধস্ মাটি** কহে; এই জমি চাষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল। ইহাতে ডাল কড়াই প্রভৃতি ফসলের চাষ খুব ভাল হয়। (৩) মাটিতে কর্দমের পরিমাণ ৪০ হইতে ৬০ ভাগ হইলে উহাকে **দোরসা** (Loamy) **মাটি** বলা হয়। এই মাটি চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ ইহাতে লাঙ্গল দিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইহাতে জল প্রবেশ করিতে ও সঞ্চিত থাকিতে পারে। ধান, পাট, আলু, সজ্জী, ভুট্টা, ডাল, কার্পাস প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রকার চাষ এই মাটিতে সুন্দর হইয়া থাকে। (৪) যে মাটিতে কর্দমের পরিমাণ অত্যধিক, বালুকা নাই বলিলেই হয়, তাহাকে

এঁটেল বা **কাদা** (Clayey) **মাটি** বলা হয়। কেবল বালুকাময় মাটিতে যেরূপ চাষ হয় না, সেইরূপ কেবল কর্দমময় মাটিও চাষের অনুপযুক্ত, কারণ এই প্রকার মাটির মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না; মাটি দৃঢ় হয় বলিয়া এঁটেল মাটিতে চাষের ব্যয় অধিক হইয়া থাকে। আমন ধান, তিসি, বাঁধাকপি প্রভৃতির চাষ এই প্রকার জমিতে হইতে পারে। (৫) মাটিতে কাঁকর প্রভৃতি শিলাচূর্ণ অধিক থাকিলে উহাকে **কাঁকুরে** বা **পাথুরে** (Stony) মাটি বলে। এই প্রকার মাটিও চাষের উপযুক্ত নহে, তবে ইহাতে সরিষা এবং রবি ফসলের চাষ হইতে পারে। (৬) মাটিতে চূণাপাথরের চূর্ণ অধিক থাকিলে উহাকে **চূণা** (Calcareous) **মাটি** বলা হয়। (৭) চূণের পরিমাণ শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ হইলে মাটিকে **মর্লি** (Morly soil) কহে। এই মাটি চাষের বেশ উপযোগী। (৮) মাটিতে জৈব পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিলে উহাকে **বোদ্** (Humus) **মাটি** বলা হয়, এই প্রকার জমিতে সাধারণত কার্বণ মিশ্রিত থাকে। এই সকল পদার্থ ব্যতীত জমিতে নানাবিধ লবণের প্রাধান্য বশত উহাদিগকে **সোরাপ্রধান** (Nitrogenous), **ক্ষারপ্রধান** (Potassic), **অস্থিপ্রধান** (Phosphatic), **লৌহপ্রধান** (Ferruginous), **গন্ধকপ্রধান** (Sulphurous) মাটি বলা হয়। যে জমিতে বহুকাল চাষ হয় নাই তাহাকে **আচোট** (Virgin) জমি বলে। আচোট জমিতে বহুকাল-সঞ্চিত উদ্‌ভিদের খাদ্য থাকে বলিয়া উহাতে ভাল চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু চাষের অনুপযোগিতা বশত জমি যদি পতিত থাকে, তাহা হইলে উহাতে চাষ হয় না।

ভূত্বকের ইতিহাস

আমাদিগের এই বৃদ্ধাধাত্রী পৃথিবী দেবীর বয়স যে কত তাহার স্থিরতা নাই। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে ইঁহার বয়স অন্যূন ২০০ কোটি বৎসর! এই অতিবৃদ্ধার জীবনের একখানি ইতিহাস আছে। ইতিহাসখানিকে চারিটি **খণ্ডে** (Era), এবং প্রত্যেক খণ্ডকে কতকগুলি **যুগে** (Age) বিভক্ত করা হইয়াছে। ভূত্বক এই ইতিহাস, ভূত্বকের শিলাগুলি তাহার পৃষ্ঠা, এবং জীবাশ্মগুলি প্রধানত এই ইতিহাসের অক্ষরমালা। ভূত্বকের স্তরে স্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। মনুষ্য লিখিত যে কোন দেশের ইতিহাস অপেক্ষা, প্রকৃতিদেবী লিখিত পৃথিবীর এই প্রস্তরময় ইতিহাস-খানি কোটি কোটি বৎসর প্রাচীন। ইহার শেষপৃষ্ঠার রচনা আরম্ভ হইবার পর প্রাচীনতম মনুষ্য জাতি তাহাদিগের ইতিহাস লিখিতে শিখিয়াছে। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডটি (Eozoic Era) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পৃথিবীর জীবনের প্রায় অর্ধেক ঘটনা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই খণ্ডটি কাল প্রভাবে এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উক্ত সময়ের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহার পর হইতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি বেশ পাঠ করা যায়, কারণ এই সময়ের পর হইতে ক্রমশ বিভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহাদিগের দেহ বা দেহাংশ সেই সেই সময়ে উৎপন্ন শিলার মধ্যে জীবাশ্মিত (Fossilised) অর্থাৎ প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

কয়লা ও খনিজ তৈলের কথা

কয়লা। ভূত্বক হইতে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, কয়লা তাহাদের অন্যতম।

কয়লা এক প্রকার শিলা। স্মরণাতীত পুরাকালে পৃথিবীর বৃক্ষাদি ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত না। এই সময় উদ্‌ভিদ্‌গণ শৈবাল (Moss), পর্ণাঙ্গ (Fern) প্রভৃতি অপুষ্পক শ্রেণির হইত। কিন্তু তাহারা যে প্রকাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমুদ্রতীরে, বিশেষত নদীর মোহানার নিকট এই সকল উদ্‌ভিদ্‌ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া অরণ্যের সৃষ্টি করিত। সেই যুগে ভূ-চলন প্রবলভাবে এবং ঘন ঘন হইত; জমি সমেত উক্ত অরণ্য ভূ-চলন বশত সমুদ্রতলে নামিয়া যাইত। এদিকে স্থলভাগ দ্রুত নগ্ন হইতেছে, তাহার ফলে সমুদ্রনিমজ্জিত অরণ্যের উপর শিলাচূর্ণ পতিত হইয়া ও জমাট বাঁধিয়া নূতন শিলার সৃষ্টি হইল, অর্থাৎ পূর্বোক্ত অরণ্য নূতন শিলার তলে চাপা পড়িয়া গেল। আবার ভূ-চলন বশত সেই অংশের ভূত্বক উন্নত হইয়া স্থলে পরিণত হইল, এবং তদুপরি মৃত্তিকাদি জমিয়া উদ্‌ভিদ্‌ জন্মিবার উপযুক্ত জমি প্রস্তুত হইলে সেই স্থানে পুনরায় অরণ্যের সৃষ্টি হইল। এইরূপ ত্বকের বারংবার উত্থান ও পতন হেতু একই স্থানে উপর্যুপরি একাধিক অরণ্য থাকিয়া গেল।

একখণ্ড কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে দেখা যায় যে উহা প্রধানত কার্বণ, ও গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত। বায়ুশূন্য স্থানে ও অতিরিক্ত চাপের অধীনে উদ্‌ভিদ্‌ বিয়োজিত (decomposed) হইলে, উহা হইতে কতক পরিমাণে গ্যাসীয় উপাদানগুলি বাহির হইয়া যায়, এবং উহা কার্বণপ্রধান শিলায় অর্থাৎ কয়লায় পরিণত হয়। ভূত্বকের অতিরিক্ত চাপে এবং বায়ুশূন্য ভূগর্ভে পূর্বোক্ত অরণ্যগুলি কয়লা নামক স্তরীভূত শিলায় পরিণত হইয়াছে। অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় উপাদানের কতকাংশ বাহির হইয়া গেলেও কয়লার মধ্যে উহারা অল্প বিস্তর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যে সকল কয়লায় উহারা

যত অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেই সকল কয়লার মধ্যে কার্বণের অনুপাত তত অধিক হয়। কার্বণের এই অনুপাত অনুসারে কয়লাকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। **পিট** (Peat) নামক কয়লায় শতকরা ৫৪ ভাগ, **পিঙ্গল** কয়লায় (Lignite বা Brown Coal) ৬৭ ভাগ, সাধারণ **জ্বালানি** কয়লায় (House Coal) শতকরা ৭৮ ভাগ কার্বণ থাকে। এই সকল কয়লাকে **নরম** বা **জতুগর্ভ** (Soft বা Bituminous) কয়লা বলা হয়। এই সকল কয়লা দগ্ধ হইলে দীর্ঘতর অগ্নিশিখা ও প্রচুর ধূম নির্গত হয়। **কঠিন** কয়লার (Anthracite) মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ কার্বণ থাকে। ইহাদিগকে সহজে জ্বালান যায় না এবং দগ্ধ হইবার সময় কঠিন কয়লা হইতে যৎসামান্য ধূম ও অগ্নিশিখা নির্গত হয়। আর এক প্রকার কয়লা আছে, তাহার নাম **কেনেল** কয়লা (Cannel Coal)। জলের মধ্যে উদ্‌ভিদ্ বিয়োজিত ও দ্রবীভূত হয়, এবং সেই অবস্থায় উহা স্থানান্তরে নীত হইয়া বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি শিলাচূর্ণের সহিত জমাট বাঁধিয়া কেনেল কয়লা উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ কার্বণ থাকে, কিন্তু শিলাচূর্ণের সহিত মিশ্রিত থাকায় ইহাতে অক্সিজেনাদি গ্যাসীয় উপাদান তত অধিক অনুপাতে থাকে না। এই সকল কয়লা এত দাহ্য যে একটি দিয়াশলাই কাঠির সাহায্যে ইহাদিগকে প্রজ্বলিত করা যায়।

কয়লা উৎপন্ন হইবার সময় উদ্‌ভিদ্‌গণের যত বিয়োজন হয়, অর্থাৎ উহা হইতে গ্যাসীয় উপাদান যত নির্গত হইয়া যায়, কয়লা তত কঠিন হইতে থাকে, এবং উহা হইতে উদ্‌ভিদের চিহ্ন তত লুপ্ত হইয়া যায়। পিট কয়লার মধ্যে উদ্‌ভিদের শিকড় প্রভৃতি অংশ বেশ চিনিতে পারা যায়, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিঙ্গল কয়লার মধ্যে উদ্‌ভিদের ছিদ্র,

তন্তু প্রভৃতি অংশ দেখা যায়, কিন্তু আর কোন কয়লায় সাধারণত উদ্‌ভিদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

ভূ-অভ্যন্তরের উত্তাপে কয়লা **কোকে** (Coke) রূপান্তরিত হয়। কয়লাকে অত্যল্প বায়ুর সংস্পর্শে দগ্ধ করিয়া বাহিরেও কোক্ প্রস্তুত করা যায়, এই প্রকারে কোক্ প্রস্তুত করিবার সময় উহা হইতে যে গ্যাস নির্গত হয়, তাহার নাম **কোল-গ্যাস** (Coal Gas)। ইহা জ্বালাইয়া আলোক ও উত্তাপ পাওয়া যায়।
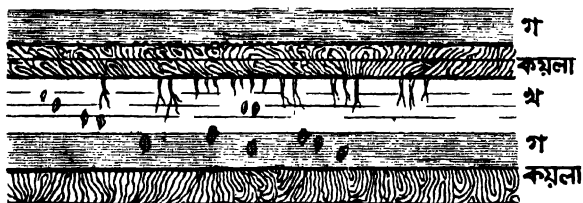
২৫নং চিত্র

তোমরা জান যে কয়লা এক প্রকার স্তরীভূত শিলা। অন্যান্য স্তরীভূত শিলার ন্যায় ইহাতেও ভাঁজ, চ্যুতি, ও বিদার দেখা যায়। কয়লার স্তরগুলির উচ্চতা ২ ফিট হইতে ৩০।৪০ ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে, এবং ইহারা সমান্তরাল ও বহুদূর ব্যাপী হয়। সাধারণত কয়লার স্তরের উর্ধ্বে বেলে পাথরের, এবং নিম্নে মৃৎশিলার স্তর দেখা যায়। উক্ত বেলে পাথরের স্তরকে কয়লা স্তরের ছাদ বলে। ইহার মধ্যে উদ্‌ভিদের প্রস্তরীভূত পত্রাদি অংশ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়লার স্তর থাকে। কয়লা স্তরের নিম্নে মৃৎশিলার স্তরের নাম **অগ্নি মৃত্তিকা** (Fire Clay)। যে জমিতে পূর্বে অরণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে অগ্নি

মৃত্তিকা হইয়াছে, সেইজন্য ইহার অপর নাম **তলমৃত্তিকা** (Under Clay)। তলমৃত্তিকার স্তরে উদ্‌ভিদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় চিনিতে পারা যায় ; ২৫ নং চিত্রে কয়লার স্তরের উপরে বেলে পাথরের স্তর (গ) বা **ছাদ**, এবং উহার নিম্নে তলমৃত্তিকার (খ) স্তরে উদ্‌ভিদগণের শিকড় দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আসানসোল, রানিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের খনিতে পূর্বোক্ত প্রাচীন যুগের (Carboniferous Age) কয়লা পাওয়া যায়। আসাম ও পাঞ্জাব প্রদেশে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে উৎপন্ন। কয়লাযুগে উৎপন্ন কয়লায় কার্বণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও গ্যাসীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত অল্প থাকায় উহা হইতে পূর্বোল্লিখিত পরবর্তী যুগের কয়লা (Tertiary Coal) অপেক্ষা অধিক উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খনিজ তৈল। কয়লার ন্যায় আর এক প্রকার দাহ্যবস্তু ভূপৃষ্ঠের নিম্নে পাওয়া যায়, ইহার নাম খনিজতৈল। তোমরা কেরোসিন তৈল দেখিয়াছ, এবং মটরগাড়ী যে পেট্রোলের সাহায্যে চলে তাহাও জান। এই সকল তৈল উদ্‌ভিদ্ হইতে বা প্রাণিগণের চর্বি হইতে সংগৃহীত হয় না, ইহাদিগকে ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করা হয় ; অবশ্য ইহারাও কয়লার ন্যায় জৈব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খনিজ তৈলকে সাধারণত **পেট্রোলিয়াম** (Petroleum) বলা হয়, (Petra = শিলা, oleum = তৈল)। পেট্রোলিয়াম একটি মিশ্র তৈল, ইহাতে **কেরোসিন, পেট্রোল** প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ তৈল মিশ্রিত থাকে। কার্বণ ও হাইড্রোজেন নামক মৌলিক বস্তুদ্বয়ের বিভিন্ন অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগের ফলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ

তৈল উৎপন্ন হয়। পেট্রোলিয়ামকে পরিশুদ্ধ করিলে, উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তোমরা সাধারণত যে সকল "মোম" বাতি দেখিয়া থাক তাহার অধিকাংশ মোমে প্রস্তুত নহে, উহারা **প্যারাফিন** (Paraffin) নামক এক প্রকার বস্তু হইতে প্রস্তুত হয়, প্যারাফিন বিশুদ্ধ ও কঠিন অবস্থার পেট্রোলিয়াম ব্যতীত কিছুই নহে। **ভেসলিনও** (Vaseline) এক প্রকার পেট্রোলিয়াম।

নানাপ্রকার ধাতুর সহিত কার্বণের সংযোগে যে সকল যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্য হইতে পেট্রোলিয়াম বাহির করা যায়, সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভূগর্ভেও উক্ত প্রকারে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ইহা জীবের, বিশেষত মৎস্যের দেহাবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল যে প্রাণিজ পদার্থ হইতে খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেও ইহা আংশিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন বস্তুকে বায়ুশূন্য স্থানে উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে উদ্বায়ী (Volatile) উপাদানগুলিকে পৃথক করার নাম অন্তর্ধূম পাতন (Destructive Distillation)। ভূগর্ভে (বায়ুশূন্য স্থানে) পৃথিবীর অন্তস্থলের উত্তাপে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জবস্তু হইতে স্বাভাবিক অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়।

পেট্রোলিয়াম দেখিতে ঘন রসের ন্যায়। অসংস্কৃত অবস্থায় ইহার বর্ণ সবুজ, হল্‌দে, কাল প্রভৃতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। কয়লার ন্যায় ইহা কোথাও ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫০ ফিট্ নিম্নে এবং কোথাও বা ৫০০০ ফিট্ নিম্নে পাওয়া যায়। ভূগর্ভে খনিজ তৈল হইতে নানা-প্রকার গ্যাস বহির্গত হয়; দুইটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যে খনিজ তৈল প্রবেশ করিলে, উহা হইতে নির্গত গ্যাস বাহির হইতে না

পারিয়া তৈলের উপর চাপ দিতে থাকে। সেই স্থান খনন করিলে উহা উক্ত চাপের প্রভাবে প্রস্রবণের ন্যায় বেগে উত্থিত হইয়া সেই স্থানে তৈলের হ্রদ সৃষ্টি করে। ভূগর্ভ-সঞ্চিত তৈলের উপর পূর্বোক্ত প্রকারে চাপ না পড়িলে, উহাকে পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করিতে হয়।

Questions :—(1) What was probably the former condition of the earth ? (2) Classify rocks. How the sedimentary rocks are formed ? (3) Define the following terms, giving their respective causative factors :—(*a*) Volcano, (*b*) Earthquake, (*c*) Landslide (*d*) Folding of rock (*e*) Denudation. (4) Name the chief varieties of soil of Bengal and discuss their relative values on agriculture. (5) What do you know about the formation of coal and mineral oil ?

তৃতীয় অধ্যায়

জীববিদ্যা (Biology)

Syllabus : Structure of any common flowering plant. Functions of root, stem, leaf, flower and fruit. Special characteristic of the living—locomotion, respiration, nutrition, growth, response to stimulus, propagation and death ; Adaptation to environments. Examples from plants like rice and pea, and animals like earthworm and fish. Life history of (a) rice and pea (b) ant, bee, spider, mosquito, butterfly and frog. Interdependence of plants and animals.

পৃথিবীতে যত প্রকার বস্তু আছে, তাহাদিগকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অর্থাৎ যাহাদের গতি, আহার, বৃদ্ধি, প্রজনন প্রভৃতি ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে **সজীব** এবং যে সকল বস্তুর জীবন বা জীবনের উক্ত লক্ষণগুলি নাই

তাহাদিগকে **নির্জীব** পদার্থ কহে। বিজ্ঞানের যে অংশে সজীব বস্তু সমূহের বিষয় আলোচিত হয় তাহার নাম **জীববিদ্যা**। সজীব পদার্থগুলি আবার **উদ্‌ভিদ্** ও **প্রাণী** নামক দুইটি বিশাল সর্গে বিভক্ত, সুতরাং জীববিদ্যাকে **উদ্‌ভিদ্‌বিদ্যা** (Botany) ও **প্রাণিবিদ্যার** (Zoology) সমষ্টি বলা যাইতে পারে।

জীববিদ্যা বলিতে জীবের (১) শরীর গঠন (Morphology), (২) শারীর বৃত্তি (Physiology), (৩) শ্রেণি বিভাগ (Classification) ও (৪) জীবনেতিহাস (Life History) এই চারিটি বিষয় বুঝাইয়া থাকে ; তন্মধ্যে শরীর গঠন আবার দুইটি শাখায় বিভক্ত। (ক) নগ্নচক্ষে দেখিয়া দেহের বাহির বা ভিতরের অংশ সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহার নাম শারীর সংস্থান (Anatomy), (খ) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৈহিক অংশের যে গঠন অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত জানা যায় না তাহার নাম আনুবীক্ষণিক গঠন (Histology)। জীবের আনুবীক্ষণিক গঠন তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে।

সপুষ্পক উদ্‌ভিদের গঠন

উদ্‌ভিদ্‌গণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শৈবাল (Algae), পর্ণাঙ্গ (Fern), ছত্রক (Fungi) প্রভৃতি কতকগুলি নিম্নস্তরের উদ্‌ভিদের পুষ্প হয় না, তাহাদিগকে **অপুষ্পক** উদ্‌ভিদ্ (Cryptogam) কহে। আম, জাম প্রভৃতি অধিকাংশ উদ্‌ভিদের পুষ্প হয়, ইহাদিগের নাম **সপুষ্পক** উদ্‌ভিদ্ (Phanerogam).

সাধারণত আমরা যে সকল উদ্‌ভিদ্ দেখিতে পাই, তাহাদের মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি কতকগুলি অংশ আছে। এই সকল বিভিন্ন

অংশ, সমগ্র উদ্‌ভিদের উপকারার্থ কতকগুলি বিশেষ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে **যন্ত্র** (Organ) বলা হয়।

মূল, কাণ্ড, পুষ্প, ফল প্রভৃতি সমেত একটি মটর গাছ লইয়া উহার গঠন পরীক্ষা কর। গাছের যে অংশ মাটির নিম্নে ছিল তাহার বর্ণ শাদা, ইহাতে পত্রাদি নাই ; এই অংশের নাম **মূল** (Root)। জমির উপরে যে অংশ ছিল সেই অংশের বর্ণ সবুজ, উহা পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি বহন করিতেছে ; এই অংশের নাম **কাণ্ড** (Stem)। মটর গাছের কাণ্ড নরম ; আম, জাম, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাণ্ডের ন্যায় মটর গাছের কাণ্ডের মধ্যে কঠিন কাষ্ঠ নাই। মটর গাছের ন্যায় যে সকল উদ্‌ভিদের কাণ্ড নরম, এবং পূর্ণ বয়সেও সবুজ থাকে, তাহাদিগকে **বীরুৎ** (Herb) কহে। যে সকল উদ্‌ভিদের কাণ্ড কঠিন কাষ্ঠময়, এবং পূর্ণবয়স্ক হইলে যাহাদের কাণ্ডের ত্বক আর হরিৎ থাকে না, সেই সকল উদ্‌ভিদের মধ্যে বেলফুল, জবা, গোলাপ প্রভৃতির ন্যায় যাহারা ১৫।২০ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না, তাহাদিগকে **গুল্ম** (Shrub), এবং আম, জামের ন্যায় যাহারা ১৫।২০ ফিটের অধিক উচ্চ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে **বৃক্ষ** (Tree) বলা হয়। মটর গাছ এক বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না বলিয়া ইহাকে **বর্ষজীবি** (Annual) উদ্‌ভিদ্ কহে। মূলা, গাজর প্রভৃতি যে সকল উদ্‌ভিদ্ দুই বৎসর জীবিত থাকে তাহাদিগের নাম **দ্বিবর্ষজীবি** (Biennial), এবং আম, জাম, গোলাপ প্রভৃতি যে সকল উদ্‌ভিদ্ দুই বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে তাহাদিগের নাম **বহুবর্ষজীবি** (Perennial) উদ্‌ভিদ্।

মূল। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় যে ভ্রূণমূল বাহির হয়, তাহাই বর্ধিত হইয়া উদ্‌ভিদের মূলে পরিণত হয়। মূলের এই অংশটিকে **প্রাথমিক** (Primary) মূল কহে। ধান্যাদি উদ্‌ভিদের

ভ্রূণমূল কিন্তু অধিক বর্ধিত হয় না। এই সকল উদ্‌ভিদের কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতে তন্তুর ন্যায় বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল বহির্গত হইয়া থাকে, এই প্রকার মূলকে তন্তুল মূল (Fibrous root) কহে। উদ্‌ভিদের কাণ্ডাদি অংশ হইতে যে সকল মূল বহির্গত হয়, তাহাদিগের নাম অস্থানজ মূল (Adventitious root); সুতরাং ধান্যাদি উদ্‌ভিদের তন্তুল মূলগুলি অস্থানজ। প্রাথমিক মূলের কতকগুলি শাখা প্রশাখা দেখিতে পাইবে। ইহাদিগকে **শাখামূল** (Secondary roots) কহে। একটি শাখামূল ছিন্ন করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা প্রাথমিক মূলের অন্তস্থল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাথমিক এবং শাখামূলগুলির অগ্রভাগ এক একটি খাপের ন্যায় আবরণে আবৃত। মূল প্রান্তের এই আবরণগুলির নাম **মূলত্র** (Root cap)।
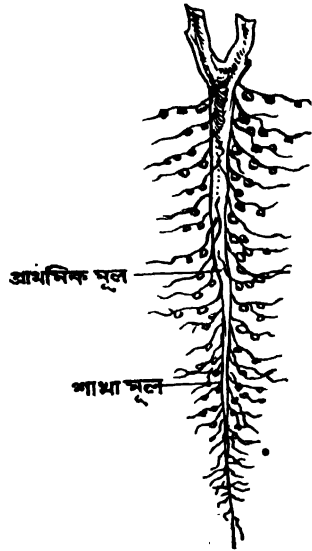
২৬নং চিত্র

মূলত্রগুলি মূলের প্রান্ত সমূহে আবরকরূপে লাগান থাকে। সমগ্র শিকড়টিকে আলোকের সম্মুখে ধরিয়া একখানি লেন্স দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রাথমিক ও শাখামূলের গাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম দেখিতে পাইবে। ইহাদিগকে **মূল রোম** (Root hair) কহে। মূলরোমগুলিকে মূলের শাখা প্রশাখা বলিয়া ভ্রম করিও না, ইহারা শাখা প্রশাখার ন্যায় মূলের অন্তস্থল হইতে বহির্গত হয় না, মূলের

ত্বক ইহাদের উৎপত্তিস্থান। মটরের মূলে কতকগুলি ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। ইহারা মূলের আশ্রিত জীবাণু। ইহাদিগকে **মূল গুটিকা** (Root tubercle) কহে। ২৬নং চিত্র দেখ।

কাণ্ড। মটর গাছ বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ্, সুতরাং উহার কাণ্ড নরম ও হরিৎ। নরম বলিয়া গাছের কাণ্ড বিনা অবলম্বনে জমির উপর দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, একটু বড় হইলেই ইহা জমির উপর শয়ন করিয়া, বা কোন আশ্রয় জড়াইয়া বর্ধিত হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বীরুতের ন্যায় মটর গাছের কাণ্ড ফাঁপা নহে। কাণ্ডের প্রায় সমদূরবর্তী স্থান হইতে পত্র বাহির হয়। কাণ্ডের যে সকল স্থান হইতে পত্র বাহির হয় সেই সকল স্থানে উহার পরিধি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকে, এই স্থানগুলির নাম **পর্ব** (Node)। দুইটি পর্বের মধ্যবর্তী কাণ্ডাংশের নাম **পর্বমধ্য** (Internode)। প্রত্যেক পর্বে কাণ্ড ও পত্রের অন্তর্গত কোণকে **পত্রকক্ষ** (Axil) কহে। সাধারণত প্রত্যেক পত্রকক্ষ হইতে একটি করিয়া পাতার কুঁড়ি বা **পত্রপ্রবাল** (Leaf bud) বাহির হয়। এই প্রবালগুলি ক্রমশ পত্র উন্মোচন করিয়া ও বর্ধিত হইয়া সপত্র শাখায় পরিণত হইয়া থাকে। পত্রপ্রবাল যে কেবল পত্রকক্ষ হইতে নির্গত হয় তাহা নহে, উহারা কাণ্ড বা শাখার প্রান্তদেশেও বহির্গত হইয়া থাকে। কোন কোন পত্রকক্ষে পত্র-প্রবালের পরিবর্তে এক একটি সুতার ন্যায় পত্রহীন শাখা দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের নাম **আকর্ষ** (Tendril)। আকর্ষগুলি বাহিরের কোন অবলম্বনকে জড়াইয়া মটরের ন্যায় দুর্বল উদ্ভিদের কাণ্ডকে ঊর্ধ্বমুখে রাখিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ আকর্ষগুলি **আরোহী যন্ত্রের** (Climbing organ) কার্য করে।

কতকগুলি লতানে গাছের কাণ্ডের অগ্রভাগ যেস্থানে জমি স্পর্শ

করে তথায় নূতন উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, ইহাদিগকে **স্টোলন** (Stolon) কহে। যে সকল স্টোলনের দৈর্ঘ্য অল্প তাহাদিগের নাম **অফ্‌সেট** (Offset), এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্টোলনগুলির নাম **রানার**
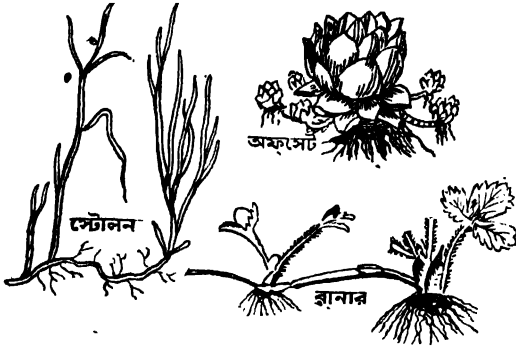
২৭নং চিত্র

(Runner)। ২৭নং চিত্র দেখ। সকল উদ্ভিদের কাণ্ড যে জমির উপরে থাকে তাহা নহে। আলু, আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড জমির নীচে থাকে। ২৮নং চিত্র দেখ।

শাখা। উদ্ভিদের গঠন বর্ণনায় শাখা ও কাণ্ডকে পৃথক ধরা হয় না। শাখাগুলি কাণ্ড হইতে এবং কাণ্ড বীজ হইতে বহির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত শাখাগুলি সর্বাংশে কাণ্ডের অনুরূপ।

পত্র। পত্রের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। (১) ইহার যে অংশ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত তাহার নাম **পত্রফলক** (Leaf lamina), (২) পত্র ফলকের নিম্নে লম্বা শাখার ন্যায় অংশের নাম **পত্রবৃন্ত** (Petiole), এবং (৩) পত্রগুলি যে অংশ দ্বারা কাণ্ড বা শাখার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার নাম **পত্রভূমি** (Base)। সকল পত্রের উক্ত তিনটি অংশই থাকে না।

বিভিন্ন উদ্‌ভিদের পত্রফলকের আকার ও আয়তন বিভিন্ন প্রকার। কতকগুলি সুপরিচিত বস্তুর আকারের সহিত তুলনা করিয়া পত্র-ফলক সমূহের আকৃতির নামকরণ হইয়াছে ; যেমন কচুপাতার আকার তীরের ন্যায়, অতএব উহাকে **তীরাকৃতি** (Sagitate) পত্রফলক বলা হয়। ফলকগুলির কিনারা আবার মসৃণ, করাতের ন্যায় কাটা, ঢেউ
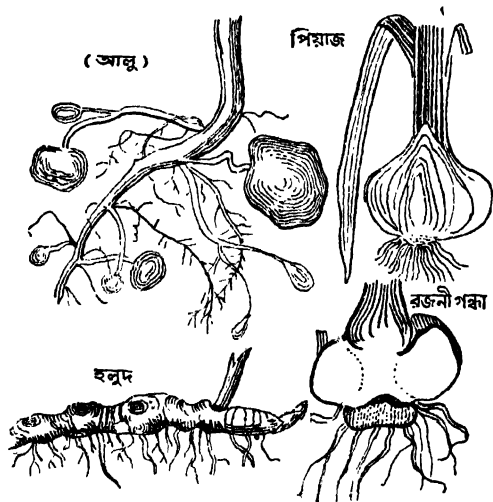
২৮নং চিত্র

খেলান, গোল ভাবে কাটা প্রভৃতি নানারূপ হইতে পারে। পত্রফলকের গঠন সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, উহার শিরা বিন্যাস (Venation)। কোন পত্রফলক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে বহুসংখ্যক শিরা (Vein) দেখিতে পাইবে। আম, জাম প্রভৃতি পত্রের মধ্যস্থলে বৃন্ত হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত যে মোটা শিরাটি দেখা যায়, তাহার নাম **মধ্যশিরা** (Midrib)। ইহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা

বাহির হইয়া জালের ন্যায় পত্রমধ্যে বিস্তীর্ণ থাকে। এই প্রকার শিরা-বিন্যাসের নাম **জালক** (Reticulate) শিরাবিন্যাস। ধান্য, বংশ প্রভৃতি উদ্‌ভিদে **সমান্তরাল** (Parallel) শিরাবিন্যাস দেখা যায়। ইহাদের শিরাগুলি পত্রবৃন্ত হইতে পত্রের অগ্রভাগ পর্যন্ত পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে। পত্রভূমিগুলি সাধারণত পত্রবৃন্ত অপেক্ষা স্থূল হয়। মটর গাছের পত্রভূমির নিকট বিভিন্ন আকারের একখানি করিয়া পত্র দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের নাম **উপপত্র** (Stipule)। মটর গাছের পত্রগুলি আম, জাম প্রভৃতি উদ্‌ভিদের পত্রের ন্যায় একফলক বিশিষ্ট নহে। আম্রাদি যে সকল পত্রে একখানি মাত্র ফলক থাকে তাহাদের নাম **একফলক** পত্র (Simple leaf)। মটর, তেঁতুল, বিল্ব প্রভৃতি উদ্‌ভিদের পত্রের ন্যায় যে সকল পত্রে একাধিক ফলক থাকে, তাহাদিগকে **বহুফলক** (Compound) পত্র কহে। মটর পত্রের অগ্রভাগে শাখাবিশিষ্ট আকর্ষ দেখিতে পাইবে।

পুষ্প। মটর পুষ্পের বৃন্ত পত্রকক্ষে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং প্রত্যেক বৃন্তের অগ্রভাগে দুইটি করিয়া পুষ্প দেখিতে পাইবে।

অধিকাংশ পুষ্প চারিটি স্তবকে গঠিত। পুষ্পের সর্বনিম্নে যে হরিৎ বর্ণের স্তবক থাকে, তাহার নাম **বৃতি** (Calyx)। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, মটর পুষ্পের বৃতিটি পঞ্চ অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশের নাম **বৃত্যংশ** (Sepal)। বৃত্যংশগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বাটির ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রকার বৃতিকে **যুক্তবৃতি** (Gamosepalous) কহে। বৃত্যংশগুলি পরস্পর পৃথক থাকিলে বৃতিকে **ভিন্নবৃতি** (Poly-selpalous) বলা হয়। প্রবাল অবস্থায় পুষ্পের অবশিষ্ট স্তবকগুলি বৃতি দ্বারা আবৃত থাকে।

পুষ্পের দ্বিতীয় স্তবকের নাম **অন্তর্বাস** (Corolla)। অন্তর্বাসের এক একটি অংশকে **দল** বা **পাপড়ি** (Petal) কহে। মটর পুষ্পের অন্তর্বাসে পাঁচটি দল আছে। এই সকল দলের বর্ণ ফিকা নীল। মটর পুষ্পের দলগুলি যুক্ত নহে; এবং সকল দলের আকার সমান নহে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একটি দল প্রবাল অবস্থায় অপর দলগুলিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই দলখানির নাম **পতাকা** (Standard)। দুই পার্শ্বের দুইখানি মধ্যমাকৃতি দলের নাম **পক্ষ** (Wings)। ইহারা ক্ষুদ্রতম দল দুইটিকে বেষ্টন করিয়া থাকে ; ক্ষুদ্রতম দল দুইটি একত্রে একখানি নৌকার ন্যায় আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে একত্রে **নৌতল** (Keel) কহে।

পুষ্পের তৃতীয় স্তবকের নাম **পুংযন্ত্র** (Andrœcium)। মটর গাছের পুংযন্ত্র দশ অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশের নাম **পুংকেশর** (Stamen)। প্রত্যেক পুংকেশরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উপরের ভাগটির নাম **পরাগধানী** (Anther), এবং নিম্নের লম্বা ভাগটির নাম **কেশর দণ্ড** (Filament)। মটর পুষ্পে দশটি কেশরদণ্ডের মধ্যে নয়টি পরস্পর সংযুক্ত ও একটি মাত্র পৃথক আছে। ইহারা সকলেই তলদেশে বৃতির সহিত সংলগ্ন। কেশর দণ্ডের নিম্নভাগে **মধুগ্রন্থি** (Nectary) থাকে। ইহা হইতে মধু নিঃসৃত হইয়া পুংকেশর ও গর্ভাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সঞ্চিত হয়। পরাগধানীগুলিকে দেখিতে হরিদ্রা বর্ণের ক্ষুদ্র ধান্যের ন্যায়। উপর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ধানীর মধ্যে চারিটি করিয়া কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলির নাম **পরাগস্থলী** (Pollen sacs)। ইহাদের ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণের **পরাগ** (Pollen) থাকে। প্রজননোপযোগী হইলে পরাগধানীর বাহিরেও পরাগ সমূহ লাগিয়া থাকে।

পুষ্পের চতুর্থ স্তবকের নাম **স্ত্রীযন্ত্র** (Gynæcium)। স্ত্রীযন্ত্রের অংশগুলির নাম **গর্ভপত্র** (Carpel)। মটর গাছের স্ত্রীযন্ত্রে একটি মাত্র গর্ভপত্র আছে। গর্ভপত্রটি পুষ্পের স্তবকগুলির উপরে সন্নিবিষ্ট। সেইজন্য ইহাকে **উন্নত** (Superior) স্ত্রীযন্ত্র কহে। যে সকল পুষ্পের
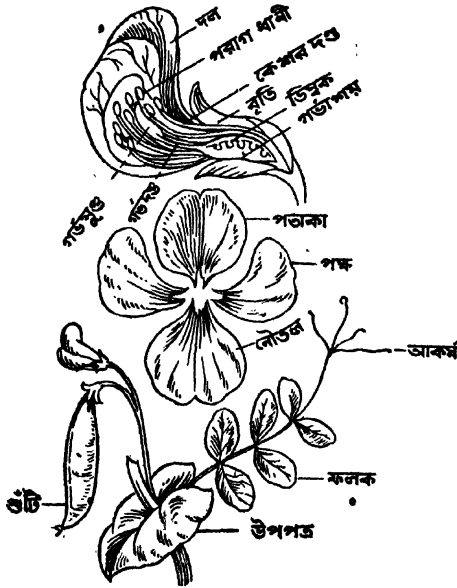
২৯নং চিত্র

স্ত্রীযন্ত্র অপর স্তবকের নিম্নে সন্নিবিষ্ট থাকে সেই সকল স্ত্রীযন্ত্রকে **অবনত** (Inferior) বলা হয়। গর্ভপত্রের তিনটি অংশ আছে, উপরের স্থূল ক্ষুদ্র অংশটির নাম **গর্ভমুণ্ড** (Stigma)। ইহাতে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নিম্নে লম্বা সরু অংশটির নাম

গর্ভদণ্ড (Style)। পুষ্পের কেশরদণ্ডগুলি গর্ভদণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে। গর্ভদণ্ড যে স্থানে পুষ্পের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে সেই স্থানের স্থূল অংশটির নাম **গর্ভাশয়** (Ovary)। গর্ভাশয়টি কাটিয়া লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিবে, যে ইহার ভিতর দিকের গাত্রে ৪।৫টি ক্ষুদ্র দানা লাগিয়া আছে। এই দানাগুলির নাম **ডিম্বক** (Ovules)। ডিম্বকগুলি যেস্থানে গর্ভাশয়ের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম **অমরা** (Placenta)। কোন কোন পুষ্পের ডিম্বক গর্ভাশয়ের গাত্রে সংলগ্ন না থাকিয়া উহার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি ঢিবিতে সংলগ্ন থাকে। ডিম্বকগুলি যেস্থানে এবং যে পদ্ধতিতে সংলগ্ন থাকে তাহার নাম **ডিম্বক নিবেশ** (Placentation)। মটরের ডিম্বক গর্ভাশয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। এই প্রকার ডিম্বকনিবেশকে **আবরকীয়** (Parietal) ডিম্বক নিবেশ কহে, এবং পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার নিবেশকে **কেন্দ্রীয়** (Central) ডিম্বকনিবেশ বলা হয়।

মটর, জবা প্রভৃতি যে সকল পুষ্পে পূর্বোক্ত চারিটি স্তবক থাকে তাহাদিগকে **সম্পূর্ণ** (Complete) পুষ্প কহে। পেঁপে, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির ন্যায় যে সকল পুষ্পে এক বা একাধিক স্তবকের অভাব থাকে তাহাদিগের নাম **অসম্পূর্ণ** (Incomplete) পুষ্প।

ফল ও বীজ। পুষ্পের পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ সংযুক্ত হওয়ার নাম **নিষেক** (Fertilization)। (৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)। নিষেকের ফলে ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হইয়া থাকে। ফলে পরিণত হইবার পর পুষ্পের দলগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। পুষ্পের বৃন্তটি শুঁটির বৃন্ত হয়। বৃন্তের উপর বৃতিটি শুঁটির সামান্য অংশ আবৃত করিয়া রাখে, পুংকেশরগুলি এবং গর্ভপত্রের দণ্ড ও মুণ্ড শুষ্ক হইয়া যায়।

ফলের সাধারণত দুইটি অংশ থাকে, (১) ফলত্বক (Pericarp) ও

(২) বীজ (৪) (Seed)। ফলত্বককে আবার তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। (ক) ফলবহিস্ত্বক (২) (Epicarp), (খ) ফলমধ্যত্বক (৩) (Mesocarp) এবং (গ) ফলঅন্তস্ত্বক (৫) (Endocarp)। ৩০নং চিত্র দেখ। ফল প্রধানত দ্বিবিধ, (১) ফলত্বকের যে কোন অংশ রসাল হইলে ফলকে **সরস** (Succulent) এবং (২) ফলত্বকের তিনটি অংশই নীরস হইলে ফলকে **নিরস** (Dry) বলা হয়। আম, জাম প্রভৃতি সরস ফলের এবং নারিকেল, মটর প্রভৃতি নিরস ফলের দৃষ্টান্ত। আম্রাদি যে সকল সরস ফলের অন্তস্ত্বক (Endocarp) নিরস ও কঠিন হয় (আঁটি), তাহাদিগকে **অস্থিল** ফল (Drupe) কহে। আঙ্গুর, শশা প্রভৃতি যে সকল সরস ফলের সমগ্র ত্বক (Pericarp) নরম ও রসাল তাহাদিগকে **বাইত** (Berry) কহে। নিরস ফলগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করিতে পার। (১) মটর প্রভৃতি কতকগুলি নিরস ফল, বীজ পরিপুষ্ট হইলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ জমিতে পতিত হয়। ইহাদিগের নাম **স্ফোটক** (Dehiscent) ফল। (২) নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি ফল এইরূপ ফাটিয়া বীজ বাহির হয় না। ইহাদিগকে **অস্ফোটক** (Indehiscent) ফল কহে। পুষ্প মঞ্জরীর সমস্ত পুষ্প একত্রে একটি ফলে পরিণত হইলে ফলকে বহুপুষ্পিক (Composite)) বলা হয়, যথা কাঁঠাল। ৩১নং চিত্র দেখ।
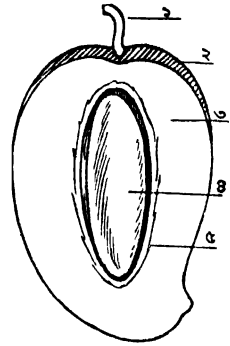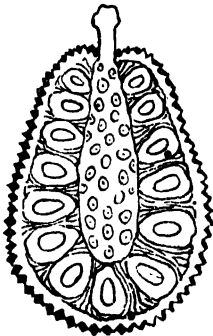
৩০নং চিত্র

৩১নং চিত্র

মটরের স্ফোটক ফলগুলি লম্বা এবং বীজ পরিপুষ্ট হইলে ফলের দুইদিক লম্বালম্বিভাবে ফাটিয়া যায়। এই প্রকার স্ফোটক ফলের নাম **শুঁটি** (Legume)। মটর বীজগুলি ক্ষুদ্র বৃন্তের সাহায্যে শুঁটির সহিত সংলগ্ন থাকে। 'বীজের এই বৃন্তগুলিকে **ডিম্বকনাড়ী** (Funicle) কহে।

এইবার কতকগুলি মটরকলাই (বীজ) লইয়া পরীক্ষা কর। ইহারা গোলাকার। বীজের যেদিক শুঁটিতে সংলগ্ন ছিল সেইদিকে একটি কাল দাগ আছে। ইহাকে **প্রবীজনাভি** (Hilum) কহে। লেন্স দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রবীজনাভির নিকট একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখিতে পাইবে, ইহার নাম **ডিম্বকরন্ধ্র** (Micropyle)। বীজটির একটি আবরণ আছে উহার নাম **বীজত্বক** (Spermoderm)। বীজত্বক দুইটি স্তবকে গঠিত। বাহিরের স্তবকটির নাম **বীজবহিস্ত্বক** (Testa) এবং ভিতরের স্তবকটির নাম **বীজঅন্তস্ত্বক** (Tegmen)। বীজত্বকও বীজের অংশ। বীজত্বক কাটিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে **ভ্রূণ** (Embryo) দেখিতে পাইবে। ভ্রূণের তিনটি অংশ আছে। (১) **বীজপত্র** (Cotyledons)। (২) **ভ্রূণমূল** (Radicle), এবং (৩) **ভ্রূণমুকুল** (Plumule)। বীজত্বকের ভিতর অর্ধগোলাকার দুইটি দাইল দেখিতে পাইবে। ইহাদের নাম **বীজপত্র**। মটর, রেড়ি, আম, জাম প্রভৃতি যে সকল উদ্‌ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রক** (Dicotyledon) এবং ধান্য, গম, ভুট্টা প্রভৃতি যে সকল উদ্‌ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **একবীজপত্রক** (Monocotyledon) উদ্‌ভিদ্ কহে। বীজপত্র দুইটি যেস্থানে পরস্পর সংলগ্ন আছে সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর দেখিতে পাইবে, উহার সরু দিকটি

ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে আছে, ভ্রূণের এই অংশের নাম **ভ্রূণমূল**। ভ্রূণমূলের বিপরীতদিকে আর একটি অংশ দেখিতে পাইবে, তাহার নাম **ভ্রূণমুকুল**। লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ভ্রূণমুকুলে কতকগুলি ক্ষুদ্র পত্র দেখিতে পাইবে। ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল যথাক্রমে উদ্ভিদের প্রাথমিক মূল ও সপত্র কাণ্ডে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্ যতদিন নিজে জমি ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারে, ততদিন বীজপত্রদ্বয় উহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্যাবলী (Functions)

উদ্ভিদের বিভিন্ন যন্ত্রের গঠন দেখিবার পর উহারা উদ্ভিদের উপকারার্থে কি কি কার্য করিয়া থাকে তাহা দেখ।

মূলের কার্য। (১) মূলত্রর সাহায্যে মূল জমি ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় এবং শাখা প্রশাখাদির সাহায্যে উহা উদ্ভিদ্‌কে জমির সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখে। শাল, তমাল প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উদ্ভিদ্‌ও শাখাদির ভারে বা ঝটিকাঘাতে যে স্থানচ্যুত হয় না, তাহার কারণ মূলের শাখা প্রশাখাদি উদ্ভিদ্‌কে অতি দৃঢ়ভাবে জমির সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখে। উদ্ভিদের মূল জমির ঝুরা মৃত্তিকাকে দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া জমাইয়া দেয়। সেই জন্য নদীর পাড়ে বা অন্য কোন ঢালু জমিতে তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্ লাগান হয়, তাহাতে জমির মৃত্তিকা ঝরিয়া পড়িতে পারে না। (২) মূল রোমগুলির সাহায্যে জমি হইতে জল ও জলে দ্রবীভূত লবণাদি খাদ্য শোষণ করে। মাটির কণাগুলির চারিদিকে যে জল ও দ্রবীভূত লবণাদি থাকে মূল রোমগুলি তাহার সংস্পর্শে আসিলে মূলরোমের ও জমির মধ্যস্থিত তরল পদার্থের বিনিময় হয়। বিভিন্ন ঘনত্ব (density) বিশিষ্ট দুইটি তরল বস্তু যদি

কেবল কোন প্রবেশ্য ঝিল্লি (Permeable Membrane) দ্বারা বিভিন্ন থাকে তাহা হইলে তরল বস্তুদ্বয়ের মিশ্রণ হইয়া থাকে, প্রকৃতির এই ধর্মের নাম **অস্‌মসিস্‌** (Osmosis)। অস্‌মসিস্‌ প্রভাবে জমির তরল পদার্থ মূলরোমে এবং তথা হইতে সন্নিহিত কোষকে প্রবেশ লাভ করে। (৩) এইরূপে মূলরোমগুলি স্ফীত হইয়া পুনরায় সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে, এবং শোষিত তরল খাদ্যের উপর চাপ দিতে থাকে, এই চাপের নাম **মূলপ্রেষ** (Root pressure)। মূলপ্রেষ বশত শোষিত তরল খাদ্য পত্রাদিতে গমন করিয়া থাকে। (৪) মূলরোম হইতে একপ্রকার অম্লরস (Acid sap) নিঃসৃত হয়, উহা নানাপ্রকার অদ্রাবণীয় বস্তুকে দ্রবীভূত করিয়া শোষণের উপযোগী করে। (৫) খাদ্য পরিপাক করিবার সময় উদ্‌ভিদের পত্রসমূহ হইতে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। ইহার নাম **জলত্যাগ** (Transpiration)। জলত্যাগ বশত উদ্‌ভিদ্‌ হইতে যে জলভাগ কমিয়া যায়, মূলরোমগুলি জমি হইতে জল শোষণ করিয়া তাহা পূর্ণ করে। (৬) মূলা, গাজর প্রভৃতি স্ফীত মূলে (Tuberous root) উদ্‌ভিদ্‌ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সকল স্ফীতমূল শঙ্কুর (Cone) ন্যায় নীচের দিক সরু ও উপরের দিক মোটা হইলে, তাহাকে **শাঙ্কব** (Conical) **মূল** কহে, যথা—গাজর। বেলনের ন্যায় দুই দিক সরু ও মধ্যভাগ মোটা হইলে, মূলকে **বেলনাকৃতি** (Fusiform) কহে, যথা—মূলা। শালগমের ন্যায় গোল হইলে স্ফীত মূলকে **গোলাকৃতি** (Napiform) বলা হয়। কোন কোন স্ফীত মূল বহুসংখ্যক অঙ্গুলির ন্যায় দেখায়, ইহাদিগের নাম **অঙ্গুল্যাকৃতি** (Tubercular), যথা—শতমূল। (৭) বটের ঝুরির ন্যায় কতকগুলি অস্থানজ মূল (Adventitious roots) উদ্‌ভিদের শাখা প্রশাখার অবলম্বনরূপে ব্যবহৃত হয়। (৮) এতদ্ব্যতীত কোন কোন উদ্‌ভিদ্‌

অস্থানজ মূলের সাহায্যে অপর উদ্‌ভিদ বা অন্য কোন অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়া থাকে। (৯) অর্কিড্ প্রভৃতি উদ্‌ভিদের আকাশলম্বী (Aerial) মূল বায়ু হইতে জল ও খাদ্য সংগ্রহ করে।
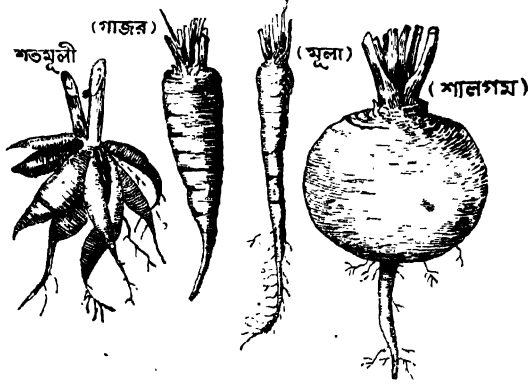
৩২নং চিত্র

(১০) কোন কোন আকাশলম্বীমূলের বর্ণ হরিৎ হয়। তাহারা পত্রের কার্য সমূহও সম্পন্ন করিয়া থাকে। (১১) মটর জাতীয় উদ্‌ভিদের মূল জীবাণুদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের নিকট হইতে নাইট্রোজেন নামক খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। (১২) কোন কোন জলজ উদ্‌ভিদ্ মূলের সাহায্যে জলে ভাসমান থাকে।

কাণ্ডের কার্য। (১) কাণ্ডের প্রধান কার্য শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি উৎপন্ন ও বহন করা। (২) মূল হইতে যে সকল তরল খাদ্য সংগৃহীত হয়, তাহা কাণ্ডের মধ্য দিয়া **আমরস** (Cell Sap) রূপে পত্রে গমন করে, এবং পত্রে খাদ্য পাচিত হইয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়া **পাচিত রস** (Elaborated Sap) রূপে উদ্‌ভিদের বিভিন্ন অংশে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং কাণ্ড উভয়বিধ রসের বাহকের কার্য

করে। (৩) কাণ্ডের হরিৎ অংশ আংশিকভাবে পত্রের সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। (৪) আলু প্রভৃতি কতকগুলি কাণ্ডে উদ্‌ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। (৫) কাণ্ড সাধারণত আলোকভিমুখে গমন করে বলিয়া পত্রাদির আলোক প্রাপ্তির সহায়তা করে। (৬) কাণ্ডের অগ্রভাগে উদ্‌ভিদের শ্বাসকার্য অধিক হয়। (৭) কতকগুলি উদ্‌ভিদের শাখা কাটিয়া জমিতে পুঁতিয়া দিলে, উহা নূতন উদ্‌ভিদে পরিণত হয়, এইরূপে ইহা উদ্‌ভিদের বংশবিস্তারের সহায়তা করে। (৮) কোন কোন উদ্‌ভিদের কাণ্ড আরোহীযন্ত্রের বা ভাসমান যন্ত্রের কার্য করিয়া থাকে। (৯) কোন কোন উদ্‌ভিদের কাণ্ডে কঠিন ত্বক, শুঁয়া, কাঁটা প্রভৃতি থাকে এবং কোন কোন উদ্‌ভিদের কাণ্ড তীব্র গন্ধযুক্ত বা বিষাক্ত হয়। এই সকল কাণ্ড উদ্‌ভিদ্‌কে জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

পত্রের কার্য। (১) পত্রের নিম্নপৃষ্ঠে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে তাহাদের নাম **মুখ** (Stoma)। এই সকল ছিদ্রদ্বারা পত্র বায়ু হইতে কার্বণ ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসীয় খাদ্য আহরণ করে। (২) পত্রের প্রধান কার্য খাদ্য পরিপাক করা। জমি ও বায়ু হইতে সংগৃহীত খাদ্যের সরল উপাদানগুলি পত্রের সাহায্যে সংযুক্ত হইয়া জৈবপদার্থে পরিণত হয়। পত্রের মধ্যে বহুসংখ্যক হরিৎবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থাকে, ইহাদিগের নাম **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll)। ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সহায়তায়, জলের সহিত কার্বণ ডাইঅক্সাইডের কার্বণাংশ সংযুক্ত করিয়া কার্বোহাইড্রেট্ নামক এক প্রকার জৈব পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। চিনি, শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি কার্বো-হাইড্রেটের দৃষ্টান্ত। কার্বণডাইঅক্সাইডকে উক্ত প্রকারে পরিবর্তন করার নাম **কার্বণ স্বাঙ্গীকরণ** (Carbon assimilation), বা

আলোক যোজন (Photo Synthesis)। পত্র কার্বণস্বাঙ্গী-করণের প্রধান যন্ত্র, কিন্তু উদ্‌ভিদের কাণ্ডাদি যে কোন সবুজ অংশে কার্বণ স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে। সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে ক্লোরো-ফিলের কার্বণ স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং রাত্রে পত্রের এই কার্য বন্ধ থাকে। (বৈদ্যুতিক আলোকেও কার্বণ স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে)। কার্বণ ডাইঅক্সাইডে কার্বণ ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক পদার্থ থাকে, তন্মধ্যে কার্বণসাঙ্গীকরণ কার্যে উদ্‌ভিদ্‌গণ কার্বণ গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন বায়ুতে পরিত্যাগ করে। এইরূপে উহারা বায়ুর অক্সিজেন বৃদ্ধি ও কার্বণডাইঅক্সাইড্ নামক উপাদান হ্রাস করিয়া থাকে। (৩) মূল কর্তৃক জমি হইতে সংগৃহীত লবণাদি খাদ্যও পত্রে পাচিত হইয়া উদ্‌ভিদের শরীর গঠনোপযোগী জৈবপদার্থে পরিণত হয়। (৪) পত্রের মুখগুলি দ্বারা উদ্‌ভিদের দেহের অতিরিক্ত জল বাষ্পরূপে নির্গত হয়। ইহার নাম **জলত্যাগ** (Transpiration)। (৫) জলত্যাগের ফলে পত্রের কোষগুলি নিম্নস্থ কোষ হইতে জলীয় রস আকর্ষণ করে। এইরূপে কোষ পরম্পরায় মূল হইতে পত্র পর্যন্ত আমরসের প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার নাম **জলত্যাগ প্রবাহ** (Transpiration current)। জলত্যাগ প্রবাহের ফলে মূল হইতে আমরস (Cell Sap) পত্রে গমন করে। (৬) কতকগুলি উদ্‌ভিদের পত্র রাত্রে মুদিত হইয়া তাপ নিয়মিত করে, অর্থাৎ উদ্‌ভিদের দেহ হইতে অধিক উত্তাপ বাহির হইতে দেয় না। (৭) পর্ণাঙ্গ প্রভৃতি অপুষ্পক উদ্‌ভিদের পত্রে **ডিম্ব** (Spore) উৎপন্ন হয়। পাথরকুচি প্রভৃতি উদ্‌ভিদের পত্র হইতে নূতন উদ্‌ভিদ্ জন্মে, সুতরাং এই সকল উদ্‌ভিদের প্রজনন কার্য্য পত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়। (৮) গাঁদাল প্রভৃতি কতকগুলি উদ্‌ভিদের পত্রের উগ্র গন্ধ; শর, কুশ প্রভৃতি উদ্‌ভিদের পত্রের তীক্ষ্ণধার;

তামাক, ধুতুরা প্রভৃতি পত্রের বিষাক্ত উপাদান বশত উক্ত উদ্‌ভিদগণ প্রাণিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। (৯) ঘৃতকুমারী প্রভৃতি উদ্‌ভিদ্ পত্রে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। (১০) পত্রেও উদ্‌ভিদের শ্বাসক্রিয়া হয়।

পুষ্পের কার্য। পুষ্পের পরাগধানীর অন্তর্গত পরাগস্থলীতে পরাগ বা পুংবীজ উৎপন্ন হয়। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে পরাগস্থলী ফাটিয়া যায়, এবং পরাগ সমূহ পরাগধানীর বহির্ভাগে সংলগ্ন হয়। কেশর দণ্ডের নিম্নভাগে যে সকল মধুগ্রন্থি আছে, তাহা হইতে এই সময় মধু নিঃসৃত হয়; মধুর লোভে এবং দলের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া প্রজাপতি, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গগণ পুষ্পে উপবিষ্ট হইলে পরাগগুলি উহাদের দেহে লাগিয়া যায়, পরে উহারা উড়িয়া যখন অন্য পুষ্পে মধু আহরণের জন্য গমন করে, তখন প্রথম পুষ্প হইতে আনীত পরাগ, দ্বিতীয় পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে সংলগ্ন হয়। পরাগধানী হইতে গর্ভমুণ্ডে পরাগ বাহিত হওয়ার নাম **পরাগযোগ** (**Pollination**); পরাগযোগ দুই প্রকার, কোন পুষ্পের পরাগ সেই পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইলে, উহাকে **স্বপরাগযোগ** (Self-pollination), এবং এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভ মুণ্ডে বাহিত হইলে, তাহাকে **ইতর** (Cross) **পরাগযোগ** কহে। পতঙ্গাদিদ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে ইতর পরাগযোগ হইয়া থাকে; বায়ু দ্বারাও কোন কোন উদ্‌ভিদের ইতরপরাগযোগ হয়। স্বপরাগযোগ অপেক্ষা ইতর পরাগযোগ হইলে, বীজ হইতে বলিষ্ঠতর উদ্ভিদ জন্মে। গর্ভাশয়ে স্ত্রীবীজ (Ovum) উৎপন্ন হয়। পরাগ যোগের পর স্ত্রীবীজ পুংবীজের সহিত সংযুক্ত হইলে স্ত্রীবীজগুলির **গর্ভাধান** বা **নিষেক** (Fertilisation) হয়, এবং ডিম্বক বীজে ও গর্ভাশয় ফলে পরিণত হইয়া থাকে। (১) পুষ্পের প্রধান কার্য বীজ উৎপন্ন করা বা **প্রজনন** (Reproduc-

tion)। সেইজন্য পুষ্পকে উদ্ভিদের **প্রজনন যন্ত্র** (Reproductive organ) বলা হয়। (২) ফল উৎপন্ন করিয়া পুষ্প বীজকে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের সাহায্য করে। (৩) প্রধানত পুষ্প দ্বারা উদ্ভিদের শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়। (৪) পুষ্পের বৃতি অপর স্তবকগুলিকে প্রবাল অবস্থায় আবরণ দ্বারা রক্ষা করে। (৫) চালতার ন্যায় কোন কোন উদ্ভিদ পুষ্পের বৃতিতে ও গর্ভদণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

ফলের কার্য। (১) ফলের প্রধান কার্য বীজ বিস্তারের সহায়তা করা। প্রাণিগণ ফলের লোভে অভ্যন্তরস্থ বীজকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। পক্ষিগণ ফল আহার করিয়া অন্যস্থানে মলের সহিত বীজ ত্যাগ করে। এইরূপ নানা উপায়ে বীজের বিস্তার হয়। (২) ফলের অভ্যন্তরস্থ বীজে ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। (কোন কোন ফলেও ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকে)। (৩) কোন কোন ফলের কঠিন আবরণ, কোন ফলের ত্বকের কাঁটা, কোন ফলের বিষাক্ত উপাদান প্রভৃতি বীজ তথা ভ্রূণকে প্রাণিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

জীবের বিশেষত্ব (Characteristics of the Living)

এইবার আমরা জীব ও জড়ের পার্থক্য কি তাহা আলোচনা করিব। জীবের এমন কতকগুলি ধর্ম আছে, যাহা কোন নির্জীব পদার্থের নাই। এই ধর্মগুলিকে **জীবের বিশেষত্ব** (Characteristics of the living) বলা হয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উচ্চ-নিম্ন, উদ্ভিদ্-প্রাণী নির্বিশেষে প্রত্যেক জীবের এই সকল বিশেষত্ব আছে।

কোষক (Cell)। তোমরা জান যে জীবের শরীর এক বা একাধিক কোষকে গঠিত। এই সকল কোষকে **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) নামক একপ্রকার সজীব পদার্থ বিদ্যমান থাকে,

সেইজন্য প্রত্যেক জীবকে প্রোটোপ্লাজ়মের সমষ্টি বলিতে পারা যায়। প্রোটোপ্লাজ়ম দেখিতে ঘৃতের ন্যায় বর্ণহীন, ঈষদচ্ছ (Translucent), সান্দ্র (Semisolid) এবং সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট। প্রত্যেক কোষকে প্রোটোপ্লাজ়মের মধ্যে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ দেখা যায়, তাহার নাম **নিউক্লিয়স্** (Nucleus)। এক একটি কোষক দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ক্রমশ অসংখ্য কোষক উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথমে কোষকের নিউক্লিয়স বিভক্ত হয়, পরে সমগ্র কোষকটি এক এক ভাগ নিউক্লিয়স লইয়া দুইটি কোষকে পরিণত হয়। ইহার নাম **কোষক বিভাগ** (Cell division)। এইরূপে একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি, আটটি, ষোলটি, ক্রমশ অসংখ্য কোষক উৎপন্ন হইয়া জীবের শরীর গঠন করে।

গমন (Locomotion)। ইহা জীবের একটি বিশেষত্ব। জীব মাত্রের দুই প্রকার গতি আছে, এক প্রকার কোষকের মধ্যে প্রোটো-প্লাজ়মের গতি এবং আর এক প্রকার কোষক বা কোষকসমষ্টির গতি। প্রথম প্রকার গতির নাম **অন্তর্গতি** (Internal movement), এবং দ্বিতীয় প্রকার গতির নাম **বহির্গতি** (External movement)। মটর পুষ্পের পুংকেশর হইতে একখণ্ড পাৎলা অংশ চাঁচিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে উহাতে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, কোষকাভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজ়মের দানাগুলি একবার নিউক্লিয়স অভিমুখে যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, ইহার নাম অন্তর্গতি। মৎস্যের সন্তরণ, কেঁচোর স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি উহাদের বহির্গতি। আহার সংগ্রহার্থ প্রাণিগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। উদ্‌ভিদ্‌গণ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না বলিয়া মনে করিও না যে, উহাদের বহির্গতি

নাই। উদ্‌ভিদ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে সেই স্থানের জমি ও বায়ু হইতে যথেষ্ট আহার সংগ্রহ করিতে পারে। সেইজন্য উহাদের স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তবে উহাদের মূল ও কাণ্ডের গতি আছে। উত্তেজনার প্রভাবে উদ্‌ভিদের বিভিন্ন প্রকার বহির্গতির বিষয় তোমরা পরে জানিতে পারিবে। (১০৫ পৃষ্ঠা দেখ)। পুষ্পের পরাগস্থলী ফাটিয়া পরাগ এবং স্ফোটক ফল ফাটিয়া বীজ নির্গত হয়, ইহা তোমরা পূর্বেই দেখিয়াছ; কোষকগুলির ক্রমান্বয় সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে পরাগ-স্থলী বা স্ফোটক ফল ফাটিয়া থাকে, এই সকলও উদ্‌ভিদের বহির্গতি।

শ্বসন (Respiration)। প্রত্যেক জীব মুক্ত অক্সিজেন বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহস্থ কোষ সমূহে প্রেরণ করে। তথায় প্রোটোপ্লাজ়মের কার্বণ নামক উপাদানের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া তাপ উৎপাদন করে এবং কার্বণ ও অক্সিজেন সংযুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কার্বণডাইঅক্সাইড রূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। জীবের এই প্রকার অক্সিজেন গ্রহণ বা কার্বণডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করাকে **শ্বসন** কহে। শ্বসনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা জীবকে কার্য করিবার শক্তি প্রদান করে। স্থলচর প্রাণিগণের শ্বসন তোমরা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছ; মৎস্যাদি জলচর প্রাণিগণও শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। জলে বায়ু দ্রবীভূত থাকে এবং অক্সিজেন বায়ুর একটি উপাদান। মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবগণ এই দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। মৎস্যের কানুকোর মধ্যে যে **ফুল্‌কো** (Gill) থাকে তাহাই উহাদের শ্বসনযন্ত্র। কোন কোন মৎস্যের ফুস্‌ফুস্‌ও (Lungs) থাকে।

উদ্‌ভিদের মধ্যেও যে শ্বাসক্রিয়া হয়, অর্থাৎ উহারা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বণডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা

করিতে পারিবে। কতকগুলি মটর বীজ ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখ। একটি বোতলের মধ্যে ভিজা তূলা দিয়া তদুপরি ভিজান বীজগুলিকে স্থাপন কর। বোতলের মুখটিতে ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দাও, যেন কোন প্রকারে উহা হইতে বায়ু নির্গত হইতে বা ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। দুই দিন পরে ছিপি খুলিয়া বোতলের মধ্যে একটু চূণের জল ঢালিয়া ভাল করিয়া নাড়াইয়া লইলে দেখিবে যে চূণের স্বচ্ছ জল দুধের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। (তোমরা পরে দেখিবে যে কেবল কার্বণডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস চূণের জলকে এইরূপ সাদা করিতে পারে)। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বোতলের মধ্যে কার্বণডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হইয়াছে। এই গ্যাস যে অঙ্কুরিত মটরগুলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোতলের মধ্যে যে বায়ু ছিল, তাহার অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া উদ্‌ভিদ কার্বণডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিয়াছে অর্থাৎ উহাদের শ্বাসক্রিয়া হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য প্রাণী ও উদ্‌ভিদ্ প্রত্যেক জীবেরই শ্বাসক্রিয়া প্রয়োজন হয়।

কার্বণস্বাঙ্গীকরণ কার্যের ন্যায় শ্বসনকার্যে উদ্‌ভিদগণের সূর্যালোক প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ইহা দিবারাত্র চলিয়া থাকে। কার্বণ-স্বাঙ্গীকরণে ক্লোরোফিল অত্যাবশ্যক, কিন্তু শ্বসনকার্যে ইহারও প্রয়োজনীয়তা নাই। পুষ্পে এবং কাণ্ডের ও শাখার অগ্রভাগে উদ্‌ভিদের শ্বসন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। কার্বণস্বাঙ্গীকরণে উদ্‌ভিদ্ কার্বণ ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে, কিন্তু শ্বাসক্রিয়ায় ঠিক তাহার বিপরীত। কার্বণস্বাঙ্গীকরণের তুলনায় উদ্‌ভিদের শ্বাসক্রিয়া অতি অল্প; প্রথমোক্ত কার্যে এক ঘণ্টায় যত কার্বণ গৃহীত হয়, শেষোক্ত কার্যে ত্রিশ ঘণ্টায় তত কার্বণ পরিত্যক্ত হয় না। উভয় কার্যের

মোট ফল অলোচনা করিলে দেখা যায় যে উদ্‌ভিদ্‌গণ বায়ুর কার্বণ-ডাইঅক্সাইড হ্রাস এবং অক্সিজেন বর্ধিত করিয়া থাকে।

পোষণ (Nutrition)। জীবগণ যে উপায়ে বাহিরের বস্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিজ নিজ শরীরের অংশ গঠন করে তাহার নাম পোষণ। জীবগণের আকার ক্রমশ বর্ধিত হয়; ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাহারা বাহির হইতে কতকগুলি বস্তু গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ গঠন করিয়া থাকে। কি কি উপাদানে জীবের দেহ গঠিত, তাহা একটি গাছ বা প্রাণীর দেহ দগ্ধ করিলে জানিতে পার। একটি গাছ দগ্ধ করিলে জলীয়বাষ্প, অন্য গ্যাসীয় বস্তু এবং ভস্ম প্রাপ্ত হইবে। এই ত্রিবিধ দ্রব্য বিশ্লেষ করিলে কার্বণ, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাই-ট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌, পটাসিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগ্‌নেসিয়ম ও লৌহ প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। জীবদেহের এই সকল উপাদান খাদ্য হইতে সংগৃহীত হয়। জীবগণের দেহে উহারা সাধারণত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন্‌, স্নেহ, লবণ ও জল রূপে বিদ্যমান থাকে। প্রাণিদেহের ও উদ্‌ভিদ্‌দেহের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন্‌ প্রভৃতির প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং খাদ্যে ও জীবদেহের উপাদানে মৌলিক বস্তু সকল সমান বটে, কিন্তু উহারা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। খাদ্য কেবল আহার বা শোষণ করিলেই চলে না, উহাকে পরিপাক করিয়া নিজ দেহের উপাদানে পরিণত করিতে, অর্থাৎ স্বাঙ্গীভূত (Assimilate করিতে হয়।

প্রাণিগণ খাদ্য আহার করিয়া পাকনলিতে (Digestive Tube) প্রেরণ করে, তথায় নানাবিধ পাচকরসের সাহায্যে উহা অপেক্ষাকৃত সরল তরলবস্তুতে পরিণত হইয়া থাকে। এই তরলবস্তু পাকনলি হইতে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে শরীরের উপাদানে পরিণত

হয়। প্রাণিগণ সাধারণত শরীরগঠনের অপ্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত নানা বস্তু খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে, সেইজন্য উহাদিগের শরীর হইতে নাইট্রোজেন সংযুক্ত নানা প্রকার পদার্থ মলমূত্ররূপে পরিত্যক্ত হয়। গৃহীত খাদ্য জীবের শ্বসন জনিত ক্ষয় পূরণ করিয়া অতিরিক্ত হইলে তবে শরীরের বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধি (Growth)। দৈহিক আয়তনের স্বাভাবিক স্থায়ী আধিক্যকে জীবের বৃদ্ধি কহে। জীবের বৃদ্ধি প্রধানত খাদ্য স্বাঙ্গীকরণের (Assimilation) উপর নির্ভর করে, কারণ শরীরের উপাদান গঠিত না হইলে বৃদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধির জন্য শ্বসন, উত্তাপ, আলোক এবং জল একান্ত আবশ্যক। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবগণের দেহ বর্ধিত হইতে আরম্ভ হয় এবং একটি নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছাইলে, উহাদিগের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণিদিগের দেহের প্রায় সর্বাংশ বর্ধিত হইয়া থাকে, উদ্‌ভিদ্‌গণের কিন্তু কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশ ভিন্ন দেহের অন্য অংশ বর্ধিত হয় না। কাণ্ড, শাখা ও মূলের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি সাধারণত উহাদের অগ্রভাগে অধিক হইয়া থাকে; উদ্‌ভিদের মূলের বা কাণ্ডের কেন্দ্রভাগ বর্ধিত হয় না, সুতরাং পরিধির বৃদ্ধি কেবল ত্বকের অব্যবহিত নিম্নে হইয়া থাকে; পত্রের মধ্যভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক বর্ধিত হয়; জীবদেহের কোন অংশের বৃদ্ধির অর্থ সেই অংশের কোষকগুলির আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি। কোষকের আকার-বৃদ্ধি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়, পরে উহা দ্রুত বর্ধিত হইতে থাকে; পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইলে আর বর্ধিত না হইয়া কোষকগুলি দ্বিধা বিভক্ত হয়, অতঃপর বিভক্ত অংশদ্বয়ের আকার বর্ধিত হইতে থাকে। জল এবং অপর স্বাঙ্গীকৃত খাদ্য হইতে উক্ত কোষকগুলির আকার বর্ধিত হয়, কিন্তু আলোক উত্তাপাদির অভাব হইলে উহারা

বর্ধিত হইতে পারে না। নির্জীব পদার্থের কিন্তু উক্তরূপ বৃদ্ধি হয় না, তবে স্ফটিকের যে বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা উহার বহির্ভাগে মাত্র হইয়া থাকে।

উত্তেজন-প্রবণতা (Irritability)। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন যদি কোন জীবকে প্রভাবিত করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তনকে **উত্তেজনা** (Stimulus) কহে। উত্তেজনা প্রভাবে কোন নির্জীব পদার্থ প্রভাবিত হয় না, সুতরাং ইহা জীবের একটি বিশেষত্ব। উত্তেজনা প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার নাম উত্তেজন-প্রবণতা। উত্তেজনা প্রভাবে প্রভাবিত হইবার জন্য তাপ, অক্সিজেন, জল এবং প্রোটোপ্লাজমের সুস্থ অবস্থা একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ প্রভৃতি না পাইলে প্রোটোপ্লাজমের, তথা জীবের এই বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আহার সংগ্রহের জন্য সমস্ত প্রাণী ইতস্তত গমন করে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। কেঁচোর মুখের উপর লবণ নিক্ষেপ করিলে উহারা যে সঙ্কুচিত হয়, তাহাও বোধ হয় তোমাদের অবিদিত নহে। আলোক, তাপ, অভিকর্ষ, স্পর্শ, খাদ্য, বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি জীবগণের প্রতিক্রিয়া উৎপাদক উত্তেজনা। উদ্‌ভিদের কাণ্ড সর্বদা আলোকাভিমুখে এবং মূল আলোক হইতে দূরে গমন করে ; কোন কোন্ পুষ্পে অকস্মাৎ উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিলে উহারা শীঘ্র প্রস্ফুটিত হয় ; উদ্‌ভিদের কাণ্ড ঊর্ধ্ব-দিকে এবং মূল নিম্নদিকে অর্থাৎ ভূ-কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকে ; অধিকন্তু, মূল যেদিকে জলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সেই দিকে গমন করে ; স্পর্শ দ্বারা লজ্জাবতী লতার পত্র মুদ্রিত হয়, এবং আরোহী উদ্‌ভিদের আকর্ষ, কাণ্ড প্রভৃতি আরোহীযন্ত্র আশ্রয়ের স্পর্শে উহাকে বেষ্টন করে ; এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ যে, উদ্‌ভিদেরও উত্তেজন-প্রবণতা (Response to Stimulus) আছে।

প্রজনন (Propagation)। প্রত্যেক জীব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে, এবং জীবিত অবস্থায় তাহারা নিজ অনুরূপ জীব উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষা করিয়া থাকে, ইহার নাম প্রজনন। উদ্‌ভিদ্‌গণের গর্ভাশয়ের মধ্যে যে সকল ডিম্বক আছে তাহারা গর্ভাশয়ের সহিত একটি বৃন্তদ্বারা সংযুক্ত থাকে, এই বৃন্তের নাম **ডিম্বকনাড়ী** (Funicle)। ডিম্বকের মধ্যে **ভ্রূণপোষক** (Nucellus) নামে একটি অংশ থাকে। তন্মধ্যে একটি **ভ্রূণস্থলী** (Embryo Sac) নিহিত আছে। উক্ত ভ্রূণস্থলীর মধ্যে স্ত্রীবীজ থাকে। পরাগযোগের পর পরাগের নিউক্লিয়স অর্থাৎ পুং-বীজ, স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইলে **ভ্রূণ** (Embryo) উৎপন্ন হয়। গর্ভাশয়ের মধ্যে ভ্রূণ কিছুদিন পুষ্ট হয়। এই সময় পুষ্পের গর্ভাশয় ফলে, এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হইয়া থাকে। অনুকূল অবস্থায় বীজ জমিতে পতিত হইলে, ভ্রূণ পৃথক্ উদ্‌ভিদে পরিণত হইয়া স্বাধীন জীবন যাপন করে, এই প্রকারে উদ্‌ভিদের প্রজনন হয়। খাদ্যাদি প্রাপ্তির জন্য জীবের বংশধরগণকে একস্থানে থাকিলে চলে না। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্‌ভিদ্‌গণ নিজেরা স্থানান্তরে যাইতে পারে না, সেইজন্য উদ্‌ভিদের ভ্রূণদিগকে, অর্থাৎ ফলের বীজ সমূহকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। (১) মনুষ্য ও ইতর প্রাণিগণ আম, জাম, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি ফলের বীজ স্থানান্তরিত করে। (২) নারিকেল সুপারি প্রভৃতি কতকগুলি বীজ জলে ভাসিয়া স্থানান্তরিত হয়। (৩) তুলা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্‌ভিদের বীজ বায়ু কর্তৃক স্থানান্তরে বাহিত হয়, এবং (৪) দোপাটি, শেফালিকা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্‌ভিদের ফল ফাটিয়া বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

উদ্‌ভিদের যে প্রকারে প্রজনন হয়, প্রাণিগণেরও প্রায় সেইরূপে প্রজনন হইয়া থাকে। উদ্‌ভিদের একই পুষ্পে সাধারণত স্ত্রী ও

পুংবীজ উৎপন্ন হয়, প্রাণিগণের সেরূপ হয় না, উহাদের স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন। কেঁচো প্রভৃতি কতকগুলি **উভলিঙ্গ** (Hermaphrodite) জীব আছে, তাহাদের একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ প্রজনন যন্ত্র থাকে বটে, কিন্তু উহাদেরও একের পুংবীজ অন্যের স্ত্রীবীজের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। প্রাণীর পুংবীজের নাম **শুক্রাণু** (Spermatozoon)। একটি প্রাণীর শুক্রাণু সমজাতীয় অপর প্রাণীর স্ত্রীবীজের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রাণীর ভ্রূণ মাতৃদেহের মধ্যে, এবং কোন কোন প্রাণীর ভ্রূণ মাতৃদেহের বাহিরে (ডিম্বমধ্যে) পুষ্ট হইয়া থাকে। এই ভ্রূণ বর্ধিত হইয়া জনকজননীর অনুরূপ প্রাণীতে পরিণত হয়।

মৃত্যু (Death)। জীবগণ চিরস্থায়ী নহে, কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিবার পর তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবের গতি, শ্বসন, পোষণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাওয়ার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর জীবের বংশধরগণ তাহার স্থান পূর্ণ করে। জন্মের পর সমস্ত জীব দ্রুত বর্ধিত হয়। যৌবনে তাহারা সন্তান প্রজনন করে, বার্ধক্যে জীবের বৃদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও উহা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় অন্তে মরিয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। অধিকাংশ জীবের ভাগ্যে কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে না। ব্যাধি বা অন্য কোন দুর্ঘটনা বশত তাহাদের এক বা একাধিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রের কর্মশক্তি পূর্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়। সেই কর্মশক্তি আর ফিরিয়া না আসিলে পূর্ণ বয়সের পূর্বে জীবের মৃত্যু হয়।

পরিপার্শ্বানুকূলন (Adaptation to Environment)

জীবগণকে যে কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্মিতে বা বাস করিতে হইবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। পরিপার্শ্ব কোন কোন বিষয়ে

ইহাদের দৈহিক গঠন বা প্রকৃতির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। জীবের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা নিজেকে সর্বদা পরিপার্শ্বের উপযোগী করিতে চেষ্টা করে, ইহার নাম **অনুকূলন** (Adaptation)। অনুকূলন দ্বিবিধ। জন্মের পর জীব আকারে বা আচরণে নিজেকে পরিপার্শ্বের উপযোগী করিয়া যেরূপভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহার নাম **স্বকৃত** (Acquired) অনুকূলন; এবং যেরূপ পরিপার্শ্বের মধ্যে জন্মিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে তাহার উপযোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করার নাম **উত্তরাধিকৃত** (Inherited) অনুকূলন।

একটি মটর গাছের কাণ্ডের অগ্রভাগ বেশ জোরে টান, কিন্তু যেন উহা ছিন্ন না হয়। প্রত্যহ এইরূপ করিলে ক্রমশ উহা অধিক আকর্ষণবল সহ্য করিতে পারিবে। কিছুদিন পরে সম আকারের অপর একটি গাছের অগ্রভাগ আকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করিতে যত জোর লাগিবে, পূর্বোক্ত গাছের অগ্রভাগ ছিন্ন করিতে তদপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করিতে হইবে। যে দিকে আলোক পায় উদ্‌ভিদের কাণ্ড সেই দিকে গমন করে। ঝিলে বা পুষ্করিণীতে মৎস্যের যেমন বৃদ্ধি হয়, ডোবায় বা চৌবাচ্ছায় সেইরূপ হয় না। যে সকল প্রাণীকে স্কন্ধে গুরুভার বহন করিতে হয়, তাহাদের স্কন্ধের চর্ম ক্রমশ শক্ত হইতে থাকে; এই সকল স্বকৃতঅনুকূলনের দৃষ্টান্ত। উত্তরাধিকৃত অনুকূলনের দৃষ্টান্ত তোমরা সর্বদা দেখিতে পাও। মটর গাছ দুর্বল সেইজন্য উহার আকর্ষ থাকে। ধান গাছের পরাগযোগ বায়ু দ্বারা হইয়া থাকে, সেইজন্য উহার পুষ্পে উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট দল নাই, কিন্তু মটর প্রভৃতি যে সকল উদ্‌ভিদের পরাগযোগ পতঙ্গ দ্বারা হয় তাহাদের পুষ্পের দল উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট। জলে দ্রবীভূত বায়ুর পরিমাণ

অতি অল্প সেইজন্য মৎস্যাদি জলচর প্রাণীর শ্বসনযন্ত্র (ফুল্‌কো) সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে। প্রথম জীবনে ভেক যখন জলে বাস করে তখন তাহাদের শ্বসনযন্ত্রও উক্ত প্রকার সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে, বড় হইয়া উহারা যখন স্থলে বাস করে তখন ফুলকোর পরিবর্তে ফুস্‌ফুস্‌ শ্বসনযন্ত্র হয়।

অনুকূলনের প্রধান কারণ সৃষ্টি বৈচিত্র্য। প্রত্যেক জীবের আকার-প্রকার এবং তাহাদের পরিপার্শ্ব বিভিন্ন, জীবগণ তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মহামতি ডারুউইন্‌ (Charles Darwin) দেখান যে জীবগণের যে হারে বংশ বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীতে সেই জাতীয় জীবের মোট সংখ্যা সেরূপ বর্ধিত হয় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, জীবগণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় যে ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা পরিপার্শ্বের অনুকূল হইলে তাহারা এ জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, অন্যথায় তাহারা প্রকৃতি-দেবী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার স্বকৃত অনুকূলন সকল সময় সন্তানে আরোপিত হয় না, ক্রমান্বয়ে বহু বংশ পরম্পরায় এক ভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকিলে, সন্তানগণ উক্ত পরিবর্তনের উত্তরাধিকারী হয়।

জীবনেতিহাস (Life History)

কি উদ্‌ভিদ্‌ কি প্রাণী প্রত্যেক জীব জীবনের সূত্রপাত হইতে ক্রমশ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, এবং জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। জীবনের এই ক্রম-পরিবর্তনকে জীবের **জীবনেতিহাস** (Life History) বলে।

উদ্‌ভিদের জীবনেতিহাস

বীজ হইতে উদ্‌ভিদ্-জীবনের সূত্রপাত হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অঙ্কুর বর্ধিত হইয়া উদ্‌ভিদে পরিণত হয়, উদ্‌ভিদ্ হইতে পুনরায় বীজ উৎপন্ন হয় ও পরে উদ্‌ভিদ্‌টি মরিয়া যায়। নূতন বীজ হইতে আবার নূতন উদ্‌ভিদ্ জন্মলাভ করে। প্রাণিগণেরও সেইরূপ স্ত্রী ও পুংবীজ হইতে ভ্রূণের উৎপত্তি; ভ্রূণ বর্ধিত হইয়া প্রাণীতে পরিণত হয়, প্রাণীর স্ত্রী ও পুংবীজ হইতে ভ্রূণ উৎপন্ন হয় এবং প্রাণী মরিয়া যায়। ভ্রূণ হইতে আবার নূতন প্রাণী উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবের জীবনেতিহাস চক্রাকারে চলিতেছে, এবং উহারা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পুনরায় নিজেদের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মটর গাছ

তোমরা মটর গাছের বীজ ইতিপূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ। এইবার কয়েকটি মটর বীজ (কড়াই) জলে ভিজাইয়া দাও। ভিজা মটর বীজগুলি প্রত্যহ লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, প্রথমে উহাদের প্রবীজনাভি উঁচু হইয়া উঠে, এবং পরে উহাদের ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়া একটি সাদা **অঙ্কুর** বাহির হয়। বীজের অন্তর্গত ভ্রূণমূলই অঙ্কুর রূপে বাহির হইয়া থাকে। ইহাই ক্রমশ গাছের প্রধান মূলে পরিণত হইবে এবং উহা হইতে বহু শাখা বাহির হইবে। অঙ্কুর বাহির হইবার পর বীজগুলিকে করাতগুঁড়ার মধ্যে পুঁতিয়া দিলে দুই একদিন পরে দেখিবে যে বীজপত্রদ্বয়সমেত ভ্রূণমুকুলগুলি করাতগুঁড়ার উপরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বীজপত্রগুলির বর্ণ কিন্তু আর সাদা নাই, উহারা সবুজ হইয়া গিয়াছে। ভ্রূণ মুকুলটিও সবুজ পত্রসমেত

সবুজ কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বীজপত্রদ্বয় ক্রমশ শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায় এবং উদ্‌ভিদ্‌গুলির মূল ও কাণ্ড ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। অতঃপর গাছগুলি পুষ্ট হইলে উহাদের শাখায় ফুল ধরে; ফুল প্রস্ফুটিত হইলে কি প্রকারে পরাগযোগ, নিষেক এবং নূতন বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছ। বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গমনের নাম **অঙ্কুরোদ্গম** (Germination)। অঙ্কুরোদ্গম হইতে বৃদ্ধি, বীজ উৎপাদন এবং মৃত্যু পর্যন্ত উদ্‌ভিদের জীবনেতিহাস।

ধানগাছ

তোমরা ধান্য এবং চাউল নিশ্চয় দেখিয়াছ। ধানগুলি মটরের ন্যায় বীজ নহে, উহারা এক একটি ফল। ছাঁটা চাউলগুলির একটি কোণ ভগ্ন থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তুষ খুলিয়া ফেলিলে ধান্যের উক্ত অংশে বীজ দেখিতে পাইবে। ছাঁটিবার সময় এই বীজগুলি পৃথক্ হইয়া যায় বলিয়া চাউলের কোণগুলিকে ভগ্ন বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি ধান্য জলে ভিজাইয়া দাও। দুইদিন পরে একটি ধান্যকে লম্বালম্বি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে (৩৩নং চিত্র দেখ)। চাউলের এক কোণে অবরণাবৃত (২) বীজ দেখিতে পাইবে। একখানি লেন্সের সাহায্যে বিভক্ত বীজটি পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যেও মটর বীজের ন্যায় ভ্রূণমূল (১) ও ভ্রূণমুকুল (৩) দেখিতে পাইবে, তবে মটরের তুলনায় ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ধান্যবীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, উহার নাম **শস্যশোষক** (Scutellum) (৪)।
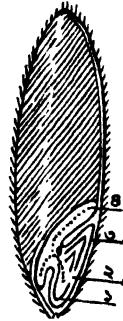
৩৩নং চিত্র

অঙ্কুরোদ্গমের সময় মটরের ন্যায় ধান্য হইতেও প্রথমে মূল ও পরে কাণ্ড বহির্গত হয়। ধান গাছের ভ্রূণমূল বড় হয় না, প্রথমে কাণ্ডের নিম্নপ্রান্ত হইতে তিন চারিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখামূল নির্গত হয়। মটর গাছের বীজপত্র যেমন ভ্রূণমুকুলের সহিত জমির উপরে উঠিয়া আইসে, ধানগাছে সেরূপ আইসে না, ধানসমেত বীজপত্র জমির নীচে থাকিয়া যায়। যতদিন পর্যন্ত না গাছের যথেষ্ট পরিমাণে মূল উৎপন্ন হয়, ততদিন চাউল শিশুগাছের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভ্রূণের বীজপত্র (শস্যশোষক) চাউল হইতে খাদ্য শোষণ করে।

কাণ্ডের অগ্রভাগে ধান্যের যে শিষ বা মঞ্জরী দেখা যায় তাহার নাম **পুষ্পস্তবক**। প্রত্যেক মঞ্জরীতে চার পাঁচ শত পুষ্প থাকে। ধান্য-পুষ্পের পরাগ পতঙ্গ কর্তৃক বাহিত হয় না, বায়ুপ্রবাহে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইয়া স্ত্রীবীজের নিষেক হয়। এইরূপ নিষেকের পর পুষ্পের আবরক সবুজ খোলা দুইখানি বন্ধ হইয়া যায়, এবং উহার মধ্যে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহা ক্রমশ কঠিন হইয়া চাউলে পরিণত হইয়া থাকে। ধান গাছেও অঙ্কুরোদ্গম, বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদন উহার জীবনেতিহাস। কেবল মটর ও ধান গাছের নহে, সমস্ত উদ্ভিদেরই জীবনেতিহাস এইরূপ।

৩৪নং চিত্র
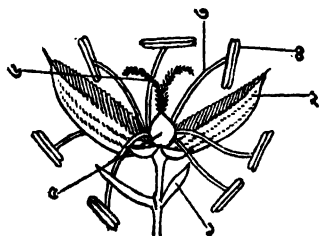
ধান্যপুষ্প: ১—বৃত্যংশ ; ২—দল ; ৩—কেশর দণ্ড ; ৪—পরাগধানী ; ৫—গর্ভাশয় ; ৬—গর্ভমুণ্ড।

প্রাণীর জীবনেতিহাস

পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, মশক, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য ইহাদিগকে সমজাতীয় প্রাণী বলা হয়; এই জাতীয় প্রাণিদিগের নাম **কীট** (Insects)। কীটগণ অস্থিহীন প্রাণী। সমস্ত কীটের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মস্তকে দুইটি করিয়া শুঁড় (Antenna) ও তিন জোড়া করিয়া চোয়াল আছে। শুঁড়গুলি কীটের স্পর্শেন্দ্রিয়। ইহাদিগের বক্ষের প্রত্যেক পার্শ্বে তিনটি করিয়া সন্ধিযুক্ত পা ও দুইখানি করিয়া ডানা থাকে। মশকের কিন্তু প্রত্যেক পার্শ্বে একখানি করিয়া ডানা আছে; কোন কোন পিপীলিকার মোটেই ডানা নাই। দেহের দুই পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল (Tracheæ) দ্বারা ইহারা শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। জীবনেতিহাসে ইহাদিগের অদ্ভুত রূপান্তর (Metamorphosis) হইয়া থাকে।

পিপীলিকা

পিপীলিকা কীট জাতীয় প্রাণী; ইহাদিগের মধ্যে আবার নানা প্রকারভেদ আছে। পিপীলিকাগণ দলবদ্ধ হইয়া গাছের মধ্যে, দেওয়ালের ফাটলে অথবা মাটির মধ্যে গর্তে বাস করে। এক একটি দলে একটি মাত্র স্ত্রীপিপীলিকা থাকে; স্ত্রীপিপীলিকাটি দলের **রানি**। রানির সহিত অল্পসংখ্যক পুরুষ পিপীলিকা বাস করে, ইহারা সাধারণত দুর্বল ও শ্রমবিমুখ হয়, ইহাদিগকে **প্রজনক** (Drone) কহে। দলের অবশিষ্ট পিপীলিকাগুলি **শ্রমিক**। রানির কার্য কেবল ডিম্ব প্রসব করা, সাধারণত বসন্তকালে রানি প্রজনকপিপীলিকার সহিত মিলিত

হয় এবং তৎপরে কয়েক মাস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সহস্র ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। শ্রমিক পিপীলিকারা এই সকল ডিম্ব সঙ্গে সঙ্গে পালন-গৃহে লইয়া যায়, তথায় ডিম্ব হইতে **শূক** (Larva) নির্গত হয়। শূকগুলির পা বা ডানা কিছুই থাকে না। শ্রমিক পিপীলিকাগণ ইহাদিগকে লালন পালন করে এবং ইহারা শ্রমিকদিগের চর্বিত খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে শূকগুলি বহুবার খোলস পরিত্যাগ করে এবং পরে নিজদেহ নিঃসৃত এক প্রকার লালায় আবৃত হয়, এই লালা ক্রমশ কঠিন হইয়া রেশমের সূতার ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাদিগকে **গুটি** (Cocoon) বলা হয়; এই সকল গুটির মধ্যে মূককীট (Pupa) অবস্থান করে। এই সময় ইহারা কিছু আহার করে না বা নড়াচড়াও করে না; শ্রমিক পিপীলিকারা ইহাদিগকে বাহিরের রৌদ্রে লইয়া যায়। পুনরায় দুই তিন সপ্তাহ পরে শ্রমিকদিগের সাহায্যে পূর্বোক্ত গুটি কাটিয়া শিশুপিপীলিকা বহির্গত হয়। কিছুদিন শ্রমিকগণ শিশুপিপীলিকা-দিগের আহার যোগায়, পরে উহারাও শ্রমিকের কার্যে যোগদান করে। রানি যে সকল ডিম্ব প্রসব করে, তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ডিম্ব হইতে রানি বা প্রজনক পিপীলিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, অধিকাংশ পিপীলিকা হয় শ্রমিক। শ্রমিক পিপীলিকাগণ সাধারণত সন্তান উৎপাদন করে না; প্রয়োজন হইলে অবশ্য শ্রমিকগণও সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল সন্তান সাধারণত প্রজনক পিপীলিকা হয়। রানি পিপীলিকাদিগের ডানা হয়, ইহারা প্রায় ১৫ বৎসর জীবিত থাকে। শ্রমিক পিপীলিকাগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পজীবী হয়, ইহারা সাধারণত সাত, আট বৎসর জীবিত থাকে।

মধুমক্ষিকা

মধুমক্ষিকাগণও একজাতীয় কীট। পিপীলিকার ন্যায় ইহাদের মধ্যেও রানি, প্রজনক ও শ্রমিক আছে। শীতের শেষে বা বসন্তের প্রারম্ভে প্রজনক ও রানি মধুমক্ষিকা মিলিত হয় এবং কতকগুলি শ্রমিক নিজেদের দেহ নিঃসৃত লালা দ্বারা প্রসবগৃহ নির্মাণ করিতে থাকে। উক্ত লালাকে মোম কহে, এবং প্রসবগৃহকে মধুচক্র বা মৌচাক্ বলা হয়। মৌচাকের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়কোণা কক্ষ থাকে। মৌচাক নির্মাণ আরম্ভ হইলেই রানি প্রত্যহ প্রায় তিন সহস্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। মধুচক্রের এক একটি কক্ষে এক একটি ডিম্ব প্রসূত হয়, সুতরাং শ্রমিকদিগকে এই সময় অতি দ্রুত কক্ষ নির্মাণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে অপর শ্রমিকগণ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকে, এবং সংগৃহীত মধু আংশিকভাবে হজম করিয়া তদ্দ্বারা মধুচক্রের কক্ষগুলি পূর্ণ করিতে থাকে। দুই চারি দিনের মধ্যে ডিম্ব হইতে শূক বহির্গত হইয়া কক্ষস্থ মধুর মধ্যে ভাসিতে থাকে, এই সময় ইহাদিগের মস্তক কক্ষের উপরে থাকে এবং শ্রমিকগণ উহাদিগকে মধু খাওয়াইয়া দেয়। ৮।১০ দিনের মধ্যে শূক দুই তিন বার উল্টাইয়া কক্ষের নিম্নে পতিত হয় এবং তথায় খোলস ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকবার উঠিয়া আইসে। পরে উহারা পিপীলিকার ন্যায় রেশমের সূত্রে নিজদেহ আবৃত করিয়া গুটি প্রস্তুত করে। এই অবস্থায় উহাদিগের আহারাদি বন্ধ থাকে ; এই সময় মধুচক্রের কক্ষের মুখগুলি বন্ধ হইয়া যায়। প্রায় তিন সপ্তাহ এইরূপে বদ্ধ থাকিবার পর গুটি কাটিয়া এবং কক্ষপ্রাচীরের মোম আংশিক ভাবে খাইয়া ফেলিয়া শিশু-মধুমক্ষিকা বাহির হইয়া আইসে। বাহির হইবার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা

উহারা অত্যন্ত দুর্বল থাকে, ২৪ ঘণ্টা পরে উহারাও শ্রমিকের কার্যে যোগদান করে। মধুমক্ষিকা বর্ষজীবী প্রাণী, রানি কিন্তু ২।৩ বৎসর জীবিত থাকে।

মাকড়সা

মাকড়সা অস্থিহীন প্রাণী হইলেও কীট জাতীয় নহে, কিন্তু কীটের ন্যায় ইহাদিগের দেহও কঠিন ত্বকে বা কাইটিনে (Chitin) আবৃত এবং পদগুলি সন্ধিযুক্ত। ইহাদিগের আটখানি সন্ধিযুক্ত পদ আছে। কীটের দেহ যেমন তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত, মাকড়সার দেহ সেরূপ নহে। ইহাদিগের মস্তক ও বক্ষ এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগের দেহ দুইটি মাত্র সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। একভাগের নাম **শিরোবক্ষ** (Cephalothorax) এবং অপর ভাগের নাম **উদর** (Abdomen)। ইহাদিগের মস্তকে দুইটি ক্ষুদ্র শুণ্ড (Antenna) আছে বটে, কিন্তু তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য করে না; ইহাদিগের দেহ হইতে এক প্রকার লালা নিঃসৃত হইয়া সূতার ন্যায় কঠিন হইয়া যায়। মাকড়সাগণ তদ্দ্বারা জাল বয়ন করে। এই জালে কোন কীট-পতঙ্গ উপবিষ্ট হইলে মাকড়সা তথায় দ্রুত গমন করিয়া উহাদিগকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহা-দিগের দেহরস পান করিয়া জীবন ধারণ করে। মাকড়সার মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক্। পুরুষের সহিত মিলনের ফলে স্ত্রী মাকড়সার বীজের নিষেক হয়। অতঃপর কোন নিরাপদ স্থানে গিয়া স্ত্রী-মাকড়সা লালা দ্বারা একটি সাদা টুপির ন্যায় আবরণ প্রস্তুত করে, এবং এই টুপির মধ্যে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার উপর বসিয়া থাকে। কিছুদিন পরে ডিম্ব হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা-শিশু নির্গত হয়। কীটের ন্যায় ইহারা শূক বা মূক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ডিম্ব হইতে

একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা-শিশু বহির্গত হইয়া থাকে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ মাকড়সাশিশুগুলি অনাহারে থাকে, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সেই সময় তাহারা মাতার দেহ হইতে রস শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কিছুদিন পরে তাহারা মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং নিজেরা জাল বয়ন করিয়া শিকার করিতে থাকে।

মশক

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে মশক সুপরিচিত। ইহারা পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার ন্যায় এক জাতীয় কীট। বর্ষাকালে মশকের সহিত মিলনের পর স্ত্রীমশা কোন বদ্ধ জলাশয়ের নিকট গমন করিয়া জলের উপর এককালে দুই তিন শত কৃষ্ণবর্ণ ডিম্ব প্রসব করে, এবং পশ্চাতের পদ দ্বারা ডিম্বগুলিকে পাশাপাশি সাজাইয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেয়। দুই তিন দিন পরে ডিম্ব হইতে শূক (Larva) বাহির হয় এবং দ্রুত সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে। বদ্ধ জলে সাধারণত যে সকল পোকা লাফাইতে দেখা যায়, তাহারা মশকের শূক। একটি কাচের গ্লাসে এইরূপ কতকগুলি পোকা কিঞ্চিৎ জলের সহিত সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ পরীক্ষা কর। এই সকল শূক অধিকাংশ সময় জলপৃষ্ঠের নিম্নে স্থির হইয়া ভাসিতে থাকে। এই সময় উহাদের মস্তক নিম্নে এবং সমস্ত দেহ প্রায় ঊর্ধ্বাধ:ভাবে জলে ডুবিয়া থাকে, কেবল পুচ্ছদেশের নিকট অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নল জলপৃষ্ঠে থাকে। এই নল দ্বারা শূকের শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়। প্রায় ১০।১২ দিন পরে শূক মূককীটে (Pupa) রূপান্তরিত হয়। তৎপূর্বে অর্থাৎ উক্ত ১০।১২ দিনের মধ্যে শূক ৩।৪ বার খোলস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মূকের মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, এবং উহার পাৎলা ত্বকের

ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ পদ, চক্ষু ও ডানা দেখিতে পাওয়া যায়। মূকগণ আহার ত্যাগ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় জলে ভাসিতে থাকে। এই সময় কিন্তু উর্ধ্বাধভাবে থাকিলেও উহাদের মস্তক নিম্নে থাকে না। স্পর্শ করিলে মূক মশক তাহার পুচ্ছের সাহায্যে জলের নিম্নে নামিয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভাসিয়া উঠে। দুই এক দিন পরে মূককীটের বহিরাবরণ পৃষ্ঠের দিকে বিভক্ত হইয়া যায় এবং উহারা
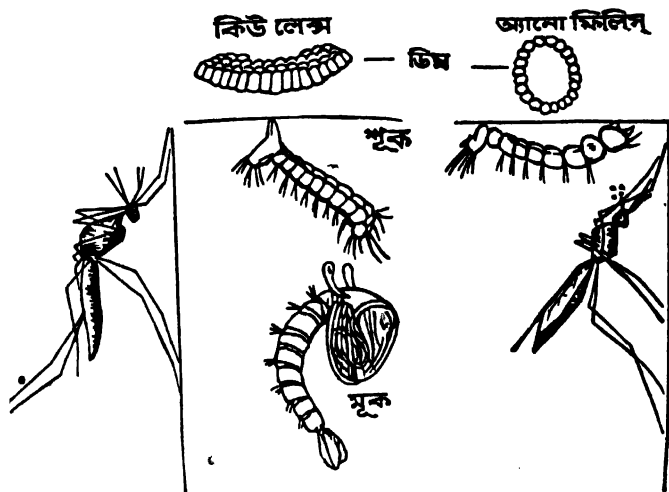
৩৫নং চিত্র

ধীরে ধীরে উক্ত আবরণের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম পদ ও ডানাগুলি সমেত বাহির হইয়া পড়ে। এই সময় ইহাদিগের দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ইহাদিগকে এক্ষণে পূর্ণকীট (Imago) বলা হয়।

তোমরা বোধ হয় জান যে মশক ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। সকল মশক

কিন্তু এই দোষে দোষী নহে। সাধারণত দুই জাতীয় মশক দেখা যায়ঃ (১) **কিউলেক্স্** (Culex) ও (২) **অ্যানোফিলিস্** (Anopheles)। উপরে কিউলেক্স্ জাতীয় মশকের জীবনেতিহাস দেওয়া হইয়াছে; অ্যানোফিলিস্ জাতীয় মশকের জীবনেতিহাসের সহিত উহার যে যে স্থানে পার্থক্য আছে, এইবার তাহা দেখ। অ্যানোফিলিস্ মশকী এককালে একশত হইতে দেড়শত লম্বা লম্বা শুভ্র বর্ণের ডিম্ব প্রসব করে; পরে অবশ্য এই সকল ডিম্বও কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্তিত হয়। এই সকল ডিম্ব পরস্পর সংলগ্ন না থাকিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকে। তিনদিনের মধ্যে অ্যানোফিলিসের ডিম্ব হইতে শূক বহির্গত হয়। শূককীটগুলি জলমধ্যে ঊর্ধ্বাধ ভাবে না থাকিয়া জলপৃষ্ঠের তলে অনুভূমিক ভাবে থাকে। উভয় জাতীয় মশকের শূক অত্যন্ত আহার করে, সাধারণত জলজ উদ্‌ভিদ্ ও কীট উহাদের প্রধান খাদ্য।

উভয় শ্রেণীর মূকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পূর্ণ কীট অবস্থায় অ্যানোফিলিসের ডানায় কাল কাল বিন্দুর ন্যায় দাগ দেখা যায়। কিউলেক্সের ডানার এরূপ কোন দাগ থাকে না। অ্যানোফিলিস্ মশক যে স্থানে উপবিষ্ট হয়, উহার দেহ কিউলেক্সের দেহের ন্যায় সেই স্থানের সহিত সমান্তরাল থাকে না। উহাদের সম্মুখ ভাগ বসিবার স্থানের যত নিকটে থাকে, পশ্চাদ্ভাগ তদপেক্ষা দূরে থাকে, অর্থাৎ উহাদের দেহ বসিবার স্থানের সহিত সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

প্রজাপতি

তোমরা নিশ্চয় নানাবিধ বিচিত্রবর্ণের ও নানা আকারের প্রজাপতি দেখিয়াছ। ইহারাও এক জাতীয় কীট। প্রজাপতি দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ইহাদের শূকগুলির অধিকাংশই কদাকার। প্রজাপতি সমূহের মধ্যে কতকগুলিকে রাত্রে, এবং কতকগুলিকে দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়, অর্থাৎ কতকগুলি প্রজাপতি দিনচর, এবং কতকগুলি নিশাচর। নিশাচর প্রজাপতিদিগকে **মথ** (Moth) বলা হয়। বসিবার সময় যে সকল প্রজাপতির ডানা পিঠের উপর খাড়া হইয়া থাকে, তাহারা দিনচর, এবং ঐ সময় যাহাদের ডানা পড়িয়া থাকে, তাহারা নিশাচর প্রজাপতি। পুরুষের সহিত মিলনের পর স্ত্রী প্রজাপতিগুলি গাছের পাতায় বা ফলের গায়ে কোন নির্জন স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। সকল প্রজাপতির ডিম্বের বর্ণ ও আকার সমান নহে, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রকার প্রজাপতির ডিম্বের বর্ণ ও আকার প্রায় নির্দিষ্ট। প্রজাপতি সাধারণত গ্রাষ্মের প্রারম্ভে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, কখন কখন উহারা বৎসরে দুইবার (গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে) ডিম্ব প্রসব করে, কিন্তু শরৎ কালে যে সকল শূক বাহির হয়, তাহারা সাধারণত বহুদিন যাবৎ মূক অবস্থায় জীবন যাপন করে।

ডিম্ব প্রসূত হইবার কিছুদিন পরে, উহার খোলা ভাঙ্গিয়া শূক (Larva) বাহির হয়। কপি, বেগুন প্রভৃতির মধ্যে, তুঁত প্রভৃতি গাছের পাতায় যে সকল পোকা দেখা যায়, তাহারাই প্রজাপতির শূক; কদাকার শুঁয়াপোকাগুলিও প্রজাপতির শূক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই ইহারা রাক্ষসের ন্যায় বৃক্ষপত্রাদি খাইতে আরম্ভ করে। শূকগুলির বক্ষে তিন জোড়া করিয়া কঠিন

পা থাকে এবং তাহার পশ্চাতে আরও চার জোড়া করিয়া নরম ও মাংসল পা দেখা যায়। এই পাগুলির নাম উপপদ। শূকগুলি কেঁচোর ন্যায় গুড়ি মারিয়া চলে। মূকে রূপান্তরিত হইলে পূর্বোক্ত উপপদগুলি লুপ্ত হয়। শ্বাসকার্যের জন্য ইহাদিগের দেহের দুইপার্শ্বে কতকগুলি করিয়া নল থাকে। অন্যান্য শূককীটের ন্যায় প্রজাপতির শূকও বারংবার খোলস পরিত্যাগ করে। প্রত্যেকবার খোলস ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই এই সকল ক্ষুদ্র রাক্ষসের আহার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। কোন কোন শুকের গাত্রে শুঁয়া থাকে, কাহারও
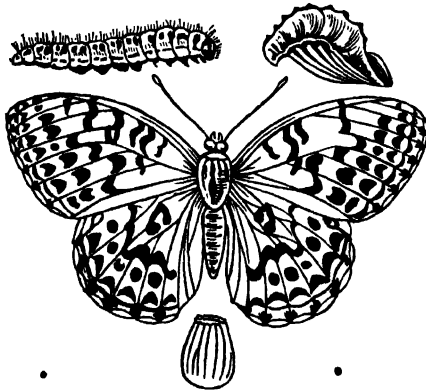
৩৬নং চিত্র

গাত্রে কাঁটা থাকে, আবার কাহারও গাত্রে কিছুই থাকে না। ইহাদের চক্ষু, চোয়াল ও শুণ্ড (স্পর্শেন্দ্রিয়) দেখা যায়। কোন কোন প্রজাপতি শূক অবস্থায় দুই দিন থাকে, কোন কোন প্রজাপতি এই অবস্থায় দুই তিন বৎসর অতিবাহিত করে। ইহারা শেষ বারের মত কঠিন খাদ্য আহার করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে গমন করিয়া শেষ বার খোলস

পরিত্যাগ করে, এবং দেহ নিঃসৃত লালার সূতায় নিজেকে জড়াইতে থাকে। ইহার নাম গুটি (Cocoon)। প্রজাপতির মূক অবস্থাকে ক্রাইসেলিস (Chrysalis) বলা হয়। ক্রাইসেলিসগণ নিশ্চল অবস্থায় অনাহারে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণকীটে রূপান্তরিত হয়। কিছুদিন পরে গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া আইসে। প্রজাপতি হইবার পর ইহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না ; যতদিন জীবিত থাকে। অতি অল্প পরিমাণে ফুলের মধু প্রভৃতি তরল বস্তু পান করিয়া থাকে।

তোমরা যে সকল রেশম, গরদ প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার কর তাহা কোথা হইতে উৎপন্ন হয় জান? এক শ্রেণির মথ আছে তাহার নাম রেশম মথ। ইহারা শূক অবস্থায় দেহ নিঃসৃত যে লালার সূতায় গুটি প্রস্তুত করে, তাহাই রেশমের সূতা। এক একটি গুটি হইতে চার, পাঁচ শত গজ দীর্ঘ রেশম পাওয়া যায়। অনেকে রেশমের জন্য গুটির 'চাষ' করে। গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইবার পূর্বে গুটিগুলিকে গরম জল ফেলিয়া ক্রাইসেলিসদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, পরে গুটি হইতে ধীরে ধীরে রেশমের সূতা খুলিয়া লওয়া হয়।

ভেক

এতক্ষণ যে সকল প্রাণীর কথা বলা হইল তাহারা সকলেই অস্থিহীন। এইবার আমরা একটি অস্থিমান প্রাণীর জীবনেতিহাস আলোচনা করিব।

অধিকাংশ প্রাণীর স্ত্রীবীজের নিষেক স্ত্রীপ্রাণীর দেহাভ্যন্তরে হয়, ভেকের কিন্তু সেরূপ হয় না। ডিম্ব নিষেকের পূর্বে স্ত্রীভেক কোন

জলাশয়ের নিকট গমন করিয়া এককালে শত শত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ক্ষুদ্র ও গোলাকার, উহাদিগের অর্ধাংশ সাদা অপর অর্ধাংশের বর্ণ কৃষ্ণ হয়। ডিম্বগুলির চারিদিকে আঠার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ লাগান থাকে, তদ্বারা উহারা পরস্পর সংলগ্ন থাকে। ডিম্ব বা স্ত্রীবীজগুলি এখনও নিষিক্ত হয় নাই; স্ত্রীভেকের পৃষ্ঠাবস্থিত পুরুষ ভেকের দেহ হইতে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ, প্রসূত ডিম্বের উপর পতিত হয়, ইহার মধ্যে অসংখ্য পুংবীজ থাকে। পুংবীজগুলি স্ত্রীবীজ বা ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম্বগুলিকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া ভেক দুইটি চলিয়া যায়। ডিম্বের গাত্রে যে আঠা লাগান থাকে, ক্রমশ তাহা স্ফীত হয়, এবং ডিম্বটি লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে থাকে। এক্ষণে ডিম্বটি ভেকের **লার্ভায়** (Larva) রূপান্তরিত হইল।. এই সময় উহাদের বৃহত্তর মস্তক ও ক্ষুদ্রতর পুচ্ছ ব্যতীত হস্ত পদাদি কোন প্রত্যঙ্গ থাকে না। ইহারা ক্রমশ আঠার খোলস হইতে বাহির হইয়া আইসে, এবং মস্তকের কাঁটার সাহায্যে জলে ভাসমান কোন উদ্‌ভিদের পত্র বা শাখার নিম্নে সংলগ্ন হয়। এই সময় কিছুক্ষণের জন্য উহারা আহার বন্ধ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকে। ক্রমশ তাহাদের মস্তকের দুইপার্শ্বে তিনটি শাখা বিশিষ্ট এক একটি শুণ্ড বাহির হয়। ইহাদের নাম ফুলকো (Gill)। মৎস্যের ন্যায় ইহারা ফুলকোর সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। কিছুদিন পরে উহাদের মুখ উৎপন্ন হয়, তখন উহারা আহার আরম্ভ করে। এই সময় উহারা উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ হইতে রস শোষণ করিয়া থাকে মাত্র। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইহাদের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। ফুলকো-গুলি ক্রমশ ছোট হইতে আরম্ভ হয়, এবং উহারা মধ্যে মধ্যে প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই সময় ফুস্‌ফুস্ প্রস্তুত

হইয়াছে। ক্রমশ উহাদের পশ্চাৎ দিকে তুইটি পা বাহির হয় এবং পুচ্ছটি স্থূল হইতে থাকে। যত দিন যায়, উহারা তত ঘন ঘন জলের উপর ভাসিয়া উঠে, কারণ এই সময় উহাদের ফুল্‌কো ক্রমশ ছোট হইতে এবং ফুস্‌ফুস্‌ বড় হইতে থাকে, এই সকল পরিবর্তনের পরে মস্তকের নিম্নে তুইটি ক্ষুদ্র হস্ত দেখা যায়। এই সময় কয়েক দিনের
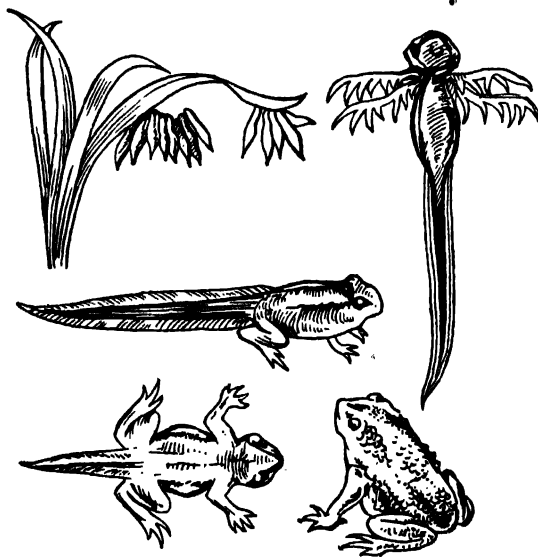
৩৭নং চিত্র

জন্য উহারা আহারাদি বন্ধ করে এবং লেজে উহাদের যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে তদ্বারা জীবন ধারণ করে, সুতরাং লেজটি ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার হয়। অতঃপর উহাদের ত্বক বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র লেজ, মুখ প্রভৃতি সমেত পরিণত ভেক বাহির হয় এবং স্থলে লাফালাফি আরম্ভ করে। লেজটি

ক্রমশ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, এবং উহারা কীট পতঙ্গ আহার করিয়া বর্ধিত হইতে থাকে। ভেক সাধারণত ৩।৪ বৎসর জীবিত থাকে। তোমরা দেখিলে যে ভেক প্রথমে থাকে জলচর প্রাণী, তৎপরে হয় উভচর, পরে স্থলচর প্রাণী হইয়া যায়।

উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণীর সখ্য

জীবগণের দুই প্রধান শাখা উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণী, পৃথিবীতে সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করে। জীবন ধারণের জন্য উদ্‌ভিদ্‌গণকে প্রাণিগণের উপর এবং প্রাণিগণকে উদ্‌ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহারা পরস্পরকে কিরূপভাবে সাহায্য করে, অর্থাৎ একের অন্যের উপর কতখানি নির্ভর করিতে হয়, নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

বায়ু। জীবন ধারণের জন্য জীবের আহার ও শ্বাসকার্য অপরিহার্য। শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন নামক গ্যাস প্রয়োজন। বায়ুতে অতিরিক্ত কার্বণডাইঅক্সাইড থাকিলে প্রাণিগণের শ্বাসকার্য চলে না। শ্বাসক্রিয়াদ্বারা প্রাণিগণ বায়ুতে কার্বণডাইঅক্সাইড বাড়াইতেছে এবং অক্সিজেন কমাইতেছে। উদ্‌ভিদ্‌গণ যদি কার্বণ স্বাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াদ্বারা বায়ুর এই অতিরিক্ত কার্বণডাইঅক্সাইড না কমাইয়া দিত, তাহা হইলে বায়ুতে অতিরিক্ত কার্বণডাইঅক্সাইড থাকা বশত স্থলচর প্রাণিগণের জীবিত থাকা সম্ভব হইত না। আবার কার্বণডাইঅক্সাইড উদ্‌ভিদ্‌গণের অন্যতম প্রধান খাদ্য, সুতরাং প্রাণিগণ বায়ুতে কার্বণডাইঅক্সাইডের ভাগ বর্ধিত করিয়া উদ্‌ভিদ্‌গণকে খাদ্য সরবরাহ করিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে উদ্‌ভিদ্‌গণের কার্বণস্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া ও প্রাণিগণের শ্বাসক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভর করে।

খাদ্য। প্রাণিগণ উদ্‌ভিদ্‌কে যে কেবল পূর্বোক্তরূপে কার্বণ নামক খাদ্য উপাদান করে তাহা নহে, জীবিত প্রাণীর মল-মূত্র, মৃত প্রাণীর গলিত দেহ প্রভৃতি জমির সহিত মিশ্রিত হইয়া উদ্‌ভিদ্‌কে নাই-ট্রোজেন ও বহু ধাতবলবণ খাদ্যউপাদানরূপে প্রদান করিয়া থাকে। মটর জাতীয় উদ্‌ভিদের মূলে যে সকল জীবাণু বাস করে তাহারাও উক্ত উদ্‌ভিদ্‌গণকে নাইট্রোজেন নামক খাদ্য উপাদান প্রদান করে। আবার কতকগুলি পতঙ্গভুক উদ্‌ভিদ্‌ আছে তাহারা জীবন্ত কীট পতঙ্গ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব উদ্‌ভিদের অধিকাংশ খাদ্যউপাদান প্রাণিজগৎ প্রদান করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, প্রাণিগণেরও প্রায় সমস্ত খাদ্য উদ্‌ভিদ্‌ হইতে সংগৃহীত হয়। নিরামিষাশী প্রাণিগণ প্রত্যক্ষ ভাবে এবং আমিষাশী প্রাণিগণ পরোক্ষভাবে উদ্‌ভিদ্‌ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, কারণ আমিষাশিগণ প্রাণীর যে শরীর বা শরীরের অংশ আহার করে, সেই শরীরের প্রত্যেক উপাদান উদ্‌ভিদ্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পরাগযোগ ও বীজবিস্তার। তোমরা দেখিয়াছ যে পুষ্পগণ পতঙ্গদিগকে আহারার্থ মধু প্রদান করে, এবং তৎপরিবর্তে পতঙ্গগণ উদ্‌ভিদের পরাগযোগের সহায়তা করে। মনুষ্য, পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ উদ্‌ভিদ্‌ হইতে ফলরূপে খাদ্য প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্তে উদ্‌ভিদের বীজ স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহা উদ্‌ভিদের বীজ বিস্তারের অন্যতম প্রধান উপায়।

আশ্রয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণকে থাকিবার স্থান দিয়া উদ্‌ভিদ্‌গণ উহাদিগকে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে সুশীতল ছায়া দান করিয়া উদ্‌ভিদ্‌গণ সখ্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে মনুষ্যগণ উহাদের

সুন্দর পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া প্রভৃতির জন্য সযত্নে উহাদিগের বাসের জন্য জমি প্রদান করে, জল সিঞ্চন করে এবং প্রাণিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষার চেষ্টা করে।

বিবিধ। পাট, তুলা প্রভৃতি পরিধেয়, নানাবিধ বাণিজ্য উপকরণ, কাষ্ঠ, মৃদঙ্গার প্রভৃতি ইন্ধন, নানাবিধ রং, সুগন্ধ, রাসায়নিক বস্তু এবং ঔষধ প্রভৃতি আমরা উদ্‌ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব দেখিতে পাইলে যে উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণিগণ জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য পরস্পরের উপর কত নির্ভর করে।

Questions :—(1) Describe the structures of (*a*) root (*b*) leaf and (*c*) flower of a plant ; enumerate their respective functions. (2) What is carbon assimilation ? How does it differ from respiration of plants ? (3) How the living differ from non-living ? (4) Describe briefly the life history of (*a*) frog, (*b*) mosquito and (*c*) butterfly. (5) How the plants and animals depend on one another ? (6) Give a few examples of adaptation of the living to environments.

চতুর্থ অধ্যায়

শারীর বিদ্যা (Physiology)

Syllabus :—Simple consideration of Human body, and its principal systems, *viz.* circulatory, respiratory and digestive systems. Foods, their relative values and their essential ingredients. Functions of the skin and nerves.

উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণিগণের কথা জানিবার পর তোমাদিগের নিজের শরীর সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এই অধ্যায়ে আমরা মনুষ্য শরীরের বিভিন্ন অংশের সংস্থান (Anatomy) ও তাহাদের কার্য প্রণালীর বা বৃত্তির (Physiology) বিষয় আলোচনা করিব।

সমগ্র মনুষ্যদেহটি পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। (১) **মুণ্ড** (Head), (২) **গ্রীবা** (Neck), (৩) **ধড়** (Trunk), (৪) **উর্ধ্বশাখা** (Upper Limb) ও (৫) **অধঃশাখা** (Lower Limb)। ইহাদের মধ্যে আবার মুণ্ডকে **মস্তক** ও **মুখমণ্ডলে**, ধড়কে **বক্ষ** (Thorax) ও **উদরে** (Abdomen), এবং শাখাদিগকে বাম ও দক্ষিণ ভাগে ভাগ করিতে পার।

আমাদিগের শরীর একটি প্রকাণ্ড কারখানা বিশেষ। ইহার নির্মাণ বৈচিত্র্য অতীব বিস্ময়কর। এই ক্ষুদ্র শরীরটুকুর মধ্যে এত অদ্ভুত প্রকারের কলকব্জা আছে, এবং তাহারা এরূপ আশ্চর্য ভাবে নিজেদের কার্য সম্পন্ন করে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই আমাদিগকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। বড় বড় কারখানার মধ্যে যেমন বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে,

এবং প্রত্যেক বিভাগে নানা প্রকার যন্ত্র, প্রত্যেক যন্ত্রে নানা প্রকার অংশ ও প্রত্যেক অংশে নানাপ্রকার উপাদান থাকে, সেইরূপ আমাদিগের শরীরে পাচন (Digestion), রেচন (Excretion), রক্তসংবহন (Circulation) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা **তন্ত্র** (System) আছে; আবার প্রত্যেক তন্ত্র নানা প্রকার **যন্ত্রে** (Organ), প্রত্যেক যন্ত্র এক বা একাধিক **কলায়** (Tissue) ও প্রত্যেক কলা নানা প্রকার **কোষক** বা **সেলে** (Cell) বিভক্ত। সমস্ত জীবের ন্যায় মনুষ্য-শরীরও কতকগুলি কোষকের সমষ্টি। কোষকগুলির আকার ও আয়তন একরূপ নহে। আমাদিগের শরীরে বহু প্রকার আকারের ও আয়তনের কোষক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কোষক এক প্রকার যোজক (Cement) পদার্থ দ্বারা যুক্ত হইয়া, এক এক প্রকার কলা গঠন করে। বিভিন্ন প্রকার কলায় বিভিন্ন প্রকারের কোষক এবং বিভিন্ন প্রকার ও পরিমাণের যোজক পদার্থ থাকে। শরীরের কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কতকগুলি কলা একত্রিত হইয়া এক একটি যন্ত্র (Organ) হয়। কতকগুলি যন্ত্র একযোগে শরীরের পেশিসঞ্চালন, রক্তসংবহন প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিয়া থাকে, এই এক এক প্রকার কার্য-নির্বাহক যন্ত্রগুলিকে একত্রে এক একটি তন্ত্র বলা হয়। বিভিন্ন তন্ত্রের কার্য আবার পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, যেমন নার্ভতন্ত্র অচল হইলে রক্তসংবহন প্রভৃতি তন্ত্র অচল হইবে, রক্তসংবহন তন্ত্র অচল হইলে শ্বসন, পাচন, নার্ভ প্রভৃতি তন্ত্র অচল হইবে। ঘড়ির একখানি চাকা অচল হইলে যেমন সমস্ত চাকা অচল হইয়া যায়, সেইরূপ কোন একটি তন্ত্র অচল হইলে সমস্ত তন্ত্র অচল হইয়া আমাদিগের মৃত্যু হইবে।

এইবার আমরা কয়েকটি প্রধান তন্ত্রের গঠন ও কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কঙ্কাল (Skeleton)

আমাদিগের এই সুদৃশ্য শরীরের মধ্যে একটি হাড়ের কাঠামো আছে, তাহার নাম **কঙ্কাল** (Skeleton)। দুই শতাধিক অস্থি সংযোগে এই কঙ্কাল গঠিত। (১) অস্থি না থাকিলে আমাদিগের দেহের এই প্রকার আকৃতি রক্ষিত হইত না, আমরা জড়ভরতের ন্যায় মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করিতাম, কারণ অস্থি ব্যতীত দেহের প্রত্যেক অংশই নরম ও তাহাদিগের আকৃতি রক্ষা করিবার শক্তি নাই। (২) দেহের কঙ্কাল-পেশিসমূহ (Skeletal Muscles) অস্থিতেই সংলগ্ন থাকিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালিত করিয়া থাকে। (৩) অস্থির আর একটি বিশেষ কার্য এই যে, ইহা মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌, হৃদয় প্রভৃতি দেহের বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে।

আমাদিগের মাথা ও মুখমণ্ডলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে। নিম্নের চোয়াল ব্যতীত এই সমস্ত অস্থি যুক্ত হইয়া একটি অস্থি-গোলকের ন্যায় দেখায়, উহার নাম **করোটি** (Skull)। উক্ত অস্থি-গোলক হইতে পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগ দিয়া একটি হাড়ের মালা নামিয়া আসিয়াছে, তাহাকে **কশেরু** বা **পৃষ্ঠবংশ** (Back Bone) কহে। ছাব্বিশখানি অস্থি গ্রথিত হইয়া এই পৃষ্ঠবংশের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃষ্ঠবংশের এক একখানি অস্থির নাম **কশেরুকা** (Vertebra)। ইহাদের মধ্যে সাতখানি গলদেশে, বারখানি পৃষ্ঠদেশে, পাঁচখানি কোমরে ও দুইখানি নিতম্বদেশে থাকিয়া আমাদিগের মস্তকের ভার বহন করিতেছে। নিতম্বদেশের অস্থি দুইখানির নাম যথাক্রমে **ত্রিকাস্থি** (Sacrum) এবং **অনুত্রিকাস্থি** (Coccyx)। প্রত্যেক দুইখানি কশেরুকার মধ্যে একখানি করিয়া নরম চাকৃতি থাকে। উহাদিগকে দেখিতে প্রায় অস্থির ন্যায়, কিন্তু তাহাদিগকে ছুরিকা দ্বারা অনায়াসে ছেদন

অস্থি
করোটি
পৃষ্ঠ বংশ
অক্ষক
উরঃফলক
অংসফলক
প্রগণ্ডাস্থি
সৎপঞ্জর
অসৎ পঞ্জর
মুক্ত পঞ্জর
বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি
শ্রোণিচক্র
অনুত্রিকাস্থি
অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থি
করকূর্চাস্থি
করাঙ্গুলি মূল শলাকা
অঙ্গুলি নলক
ঊর্বস্থি
জান্বস্থি
জংঘাস্থি
অনু জংঘাস্থি
পদাঙ্গুলিমূল শলাকা
অঙ্গুলি নলক

৩৮ নং চিত্র
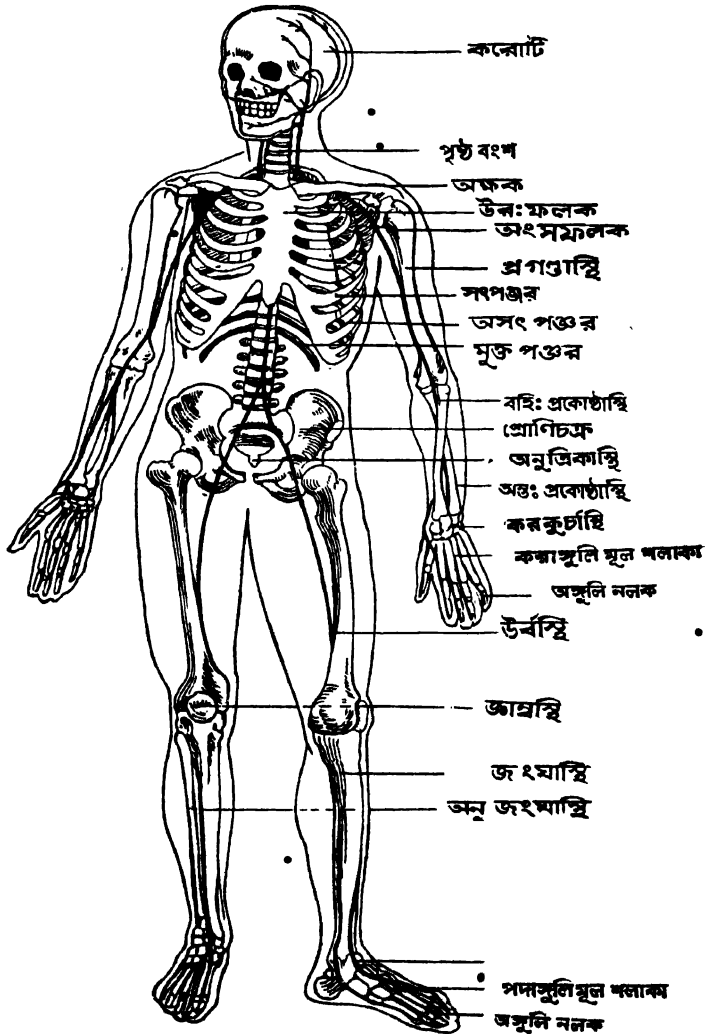
করা যায়। ইহাদিগকে **তরুণাস্থি** (Cartilage) কহে। সমগ্র পৃষ্ঠবংশটি ঠিক সরল নহে, উহা দেখিতে অনেকটা গমনশীল সর্পের ন্যায়।

বক্ষস্থলের মধ্যভাগে ছোরার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একখানি অস্থি আছে, তাহার নাম **উরঃফলক** (Breast Bone)। ইহার নিম্নের অংশটি অর্থাৎ ছোরার ডগাটি তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত।

পৃষ্ঠবংশ ও বক্ষাস্থিকে যোগ করিয়া কতকগুলি সরু সরু অস্থি আমাদিগের বক্ষের দুই পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাদিগের নাম **পর্শুকা** বা **পঞ্জর** (Ribs)। এক একদিকে বারখানি করিয়া চব্বিশ-খানি পঞ্জর আছে। প্রত্যেক পঞ্জরের সম্মুখভাগ তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত।

নিতম্ব দেশের দুই পার্শ্বে দুইখানি অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **নিতম্বাস্থি** (Hip Bones) ; নিতম্বাস্থি দুইখানি সম্মুখের দিকে একখানি ক্ষুদ্র তরুণাস্থি দ্বারা এবং পশ্চাদ্দিকে ত্রিকাস্থি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। নিতম্বাস্থি, ত্রিকাস্থি এবং অনুত্রিকাস্থি মিলিত হইয়া নিতম্বদেশে গামলার আকারের একটি কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছে, উহার নাম **শ্রোণিচক্র** (Pelvis) ; ইহা বস্তি প্রভৃতি দেহের অনেক-গুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্রকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে।

পৃষ্ঠদেশের দুই পার্শ্বে, স্কন্ধের নিম্নে, দুইখানি ত্রিভুজাকৃতি অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **অংসফলক** (Scapulæ) ; এই ফলকের সহিত আমাদিগের বাহু সংলগ্ন থাকে।

গ্রীবার নিম্নে দুই দিকে দুইখানি লম্বা ইংরাজী অক্ষর 'S'-এর আকারের অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **অক্ষক** (Clavicle বা Collar Bones) ; ইহারা সম্মুখে উরঃফলকের সহিত এবং পার্শ্বে অংসফলকের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে।

স্কন্ধ হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত আমাদিগের হস্তে তিনখানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। একখানি স্কন্ধ হইতে কনুই পর্যন্ত, তাহার নাম **প্রগণ্ডাস্থি** (Humerus), এবং দুইখানি কনুই হইতে কব্জি পর্যন্ত পাশাপাশি ভাবে থাকে, তাঁহাদের নাম **বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি** (Radius) ও **অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি** (Ulna)। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি অঙ্গুষ্ঠের দিকে এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি কনিষ্ঠার দিকে অবস্থিত। প্রগণ্ডাস্থির উপরিভাগ গোলাকার, উহা অংসফলকের সহিত সংলগ্ন। উহার নিম্নভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত সংলগ্ন হইয়া কনুইএর সৃষ্টি করে। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের নিম্নে, অর্থাৎ কব্জিতে আটখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **করকুর্চাস্থি** (Carpal Bones)। ইহাদিগের নিম্নে, হাতের চেটোর মধ্যে অঙ্গুলির সহিত সমরেখায় পাঁচখানি লম্বা অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **করাঙ্গুলিমূল শলাকা** (Metacarpal Bones)। তন্নিম্নে প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনখানি করিয়া অস্থি আছে, উহাদিগের নাম **অঙ্গুলিনলক** (Phalanges)। অঙ্গুষ্ঠে তিনখানির পরিবর্তে দুইখানি অঙ্গুলিনলক থাকে। এক একখানি নলক অঙ্গুলির এক একটি পর্বের সৃষ্টি করে।

হস্তের ন্যায় পদেও, কোমর হইতে জানু পর্যন্ত একখানি লম্বা অস্থি আছে, তাহার নাম **উর্বস্থি** (Femur বা Thigh Bone)। জানু হইতে গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত দুইখানি অস্থি পাশাপাশি ভাবে আছে, তাহাদিগের নাম **জংঘাস্থি** (Tibia) এবং **অনুজংঘাস্থি** (Fibula)। উর্বস্থির উপরের অংশ শ্রোণিচক্রের সহিত এবং নীচের অংশ জংঘাস্থির সহিত সংলগ্ন ; শেষোক্ত সন্ধিস্থলের নাম **জানু** (Knee)। জানুর সম্মুখে একখানি ভাসমান অস্থি আছে, তাহার নাম **জান্বস্থি**

(Patella বা Knee Cap)। জংঘাস্থির নিম্নে সাতখানি অস্থি থাকে তাহাদিগের নাম **পদকূর্চাস্থি** (Tarsal Bones)। ইহার পর অঙ্গুলির সমরেখায় পাঁচখানি লম্বা অস্থি আছে, তাহাদিগের নাম **পদাঙ্গুলিমূল শলাকা** (Metatarsal Bones)। হস্তের ন্যায় পদেও বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনখানি করিয়া অঙ্গুলিনলক (Phalanges) থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অঙ্গুলিনলকের সংখ্যা তিনখানির পরিবর্তে দুইখানি।

সন্ধি (Joint)

দুই বা ততোধিক অস্থি যে স্থলে সংলগ্ন হয় তাহার নাম **সন্ধি** (Joint)। সন্ধির নিকট প্রত্যেক অস্থি, তরুণাস্থি দ্বারা বেষ্টিত এবং অস্থিগুলি **স্নায়ু** বা **সন্ধিবন্ধনী** (Ligament) নামক রজ্জুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। স্নায়ু না থাকিলে একখানি অস্থি অপর অস্থি হইতে অল্পায়াসে বিভিন্ন হইয়া যাইত। সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সন্ধিতে Synovial Fluid নামক এক প্রকার তৈলের ন্যায় পদার্থ থাকে; উহা না থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের সময় পুরাতন কব্জার ন্যায় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া শব্দ হইত, এবং অস্থিপ্রান্তগুলি শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হইত।

সন্ধি দুই প্রকার, (১) কতকগুলি **অচল** (Fixed), উহারা কখনও সঞ্চালিত হয় না; (২) অবশিষ্টগুলি **চল** (Movable) সন্ধি। চলসন্ধি আবার দুই প্রকার, (১) **কোটর সন্ধি** (Ball and Socket Joint) এবং (২) **কপাট সন্ধি** (Hinge Joint)। করোটির অস্থিগুলি অচল শ্রেণির সন্ধি দ্বারা সংযুক্ত। স্কন্ধ এবং নিতম্বের সন্ধি কোটর শ্রেণির; কনুই, জানু প্রভৃতির সন্ধি কপাট শ্রেণির।

পেশি (Muscle)

পেশিকে চলিত ভাষায় মাংস কহে। দেহের প্রত্যেক অংশের সঞ্চালন এই পেশি দ্বারা সাধিত হয়। পেশি দুই প্রকার, (১) **ইচ্ছানুগ** (Voluntary) ও (২) **অনৈচ্ছিক** (Involuntary)। যে সকল পেশি আমরা ইচ্ছানুযায়ী চালনা করিতে পারি, তাহাদিগের নাম ইচ্ছানুগ পেশি। উহারা প্রায়ই কোন না কোন অস্থিতে সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য ইহাদিগকে **কঙ্কাল**-(Skeletal) **পেশি**ও বলা হয়। কতকগুলি সূক্ষ্ম পেশিতন্তুর (Muscle-fibre) গুচ্ছ লইয়া এক একটি পেশির সৃষ্টি হয়। কঙ্কাল পেশির প্রান্তদ্বয় অধিকাংশ স্থলে শক্ত রজ্জুর ন্যায় আকার ধারণ করে, তাহাদিগের নাম পেশিপ্রান্ত (Tendons)। সন্ধির সন্নিহিত পৃথক অস্থির সহিত প্রত্যেক কঙ্কাল-পেশির পৃথক প্রান্তসমূহ সংযুক্ত থাকে। যখন সংকুচিত হয়, তখন পেশির দৈর্ঘ্য কমিয়া যায় এবং উহাকে স্থূলতর দেখায়।

পেশির তন্তুগুলিই এক একটি সেল ; অণুবীক্ষণের সাহায্যে কঙ্কাল-পেশির ও হৃদয়ের পেশির তন্তুগুলি আড়াআড়ি ভাবে, এবং হৃদয়ের ব্যতীত সমস্ত অনৈচ্ছিক পেশির তন্তুগুলি লম্বালম্বি ভাবে ডোরা কাটা দেখায়। প্রত্যেক অনৈচ্ছিক পেশির সেলে একটি করিয়া, এবং কঙ্কাল-পেশির সেলে একাধিক নিউক্লিয়স্ থাকে।

যখন আমরা দেহের কোন অংশ সঞ্চালিত করিবার ইচ্ছা করি, তখন সেই অংশের কঙ্কাল-পেশিগুলি সংকুচিত হইয়া উক্ত অংশের অস্থিকে সন্ধির উপর সঞ্চালিত করে।

অনৈচ্ছিক পেশিগুলিকে আমরা ইচ্ছা করিয়া সঞ্চালিত করিতে পারি না অথবা উহাদিগের সঞ্চালন বন্ধ করিতে পারি না। আমাদিগের

নিদ্রাবস্থাতেও তাহারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সাধারণত তাহাদিগের কার্য আমাদিগের অজ্ঞাতসারে হয়। হৃদয়, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রগুলি অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

রক্তসংবহন তন্ত্র (Circulatory System)

রক্ত। রক্ত আমাদিগের দেহের ভিত্তি স্বরূপ। ইহা লোহিত বর্ণের তরল পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার তরল অংশ বা **রক্তরস** (Plasma) বর্ণহীন, ইহাতে অসংখ্য **লোহিত রক্তকণিকা** (Red Blood Corpuscles) ভাসমান থাকে বলিয়া রক্তের বর্ণ লোহিত দেখায়। লোহিত রক্তকণিকা ব্যতীত কতকগুলি **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles) এবং **অনুচক্রিকা** (Platelets) শোণিতে বিদ্যমান থাকে। কণিকাগুলি এক একটি সেল (Cell)। লোহিত কণিকাগুলির মধ্যে নিউক্লিয়স নাই, শ্বেত কণিকাগুলি কিন্তু এক বা একাধিক নিউক্লিয়সযুক্ত হয়। জীবাণু প্রভৃতি বাহিরের কোন পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে শ্বেতকণিকা সকল তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে। লোহিত কণিকার মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** (Hæmoglobin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে, উহা আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত গৃহীত অক্সিজেন নামক গ্যাসের সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে। লোহিত কণিকার সংখ্যা শ্বেতকণিকার সংখ্যার পাঁচ ছয় শতগুণ অধিক। অস্থিমজ্জা, যকৃত ও প্লীহায় এই সকল কণিকা প্রস্তুত হয়।

তঞ্চন। শরীর হইতে রক্তপাত হইলে উহা সাধারণত ৩।৪ মিনিটের মধ্যে জমিয়া যায়, ইহার নাম **তঞ্চন** (Coagulation) ; উহা হইতে পরে **রক্তমস্তু** (Serum) নামক হরিদ্রাভ বর্ণের এক প্রকার তরল

পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। রক্তরসে **ফাইব্রিনোজেন** (Fibrinogen নামক এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে, রক্তের সহিত বাহিরে আসিলে তরল ফাইব্রিনোজেন কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়া জালির আকার ধারণ করে। কঠিন অবস্থায় ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন (Fibrin) কহে। ফাইব্রিন নির্মিত জালের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা সমূহ আবদ্ধ হইয়া যায়, এবং ফাইব্রিন বর্জিত রক্তরস (রক্তমস্ত) বাহির হইয়া আইসে।

হৃদয়। আমাদিগের দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত শোণিত
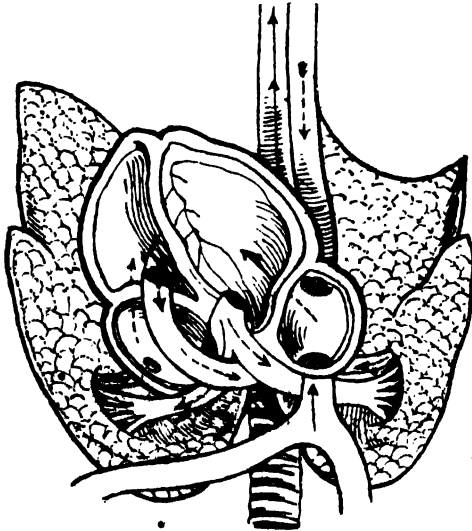
৩৯নং চিত্র

প্রবাহিত হইতেছে। যে মুহূর্তে এই শোণিত প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্তেই আমাদিগের মৃত্যু। শোণিত সঞ্চালনের জন্য বক্ষের অভ্যন্তরে, বামপার্শ্বে **হৃদয়** (Heart) নামে একটি

অদ্ভুত যন্ত্র আছে; ইহা দেখিতে আম্রের ন্যায়, নীচের দিকে সরু ও উপরের দিকে চওড়া। পূর্ণায়তন হৃদয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। দুইখানি পর্দা দ্বারা হৃদয় আবৃত থাকে, এই পর্দাদ্বয়ের নাম **হৃদয়ধরাকলা** (Pericardium)। দিনে বা রাত্রে, আমাদিগের নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় হৃদয় আজীবন বিশ্বস্তভাবে আমাদিগের সেবা করিয়া থাকে। গর্ভ-জীবন হইতে সেই যে নিয়মিতভাবে ইহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মুহূর্ত বিরাম নাই, অনিয়ম নাই, সমভাবে উহা আপনার কার্য সাধন করিতেছে এবং আমাদিগের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সাধন করিবে। এত প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলিয়াই প্রকৃতি ইহাকে পঞ্জরের মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকে।

হৃদয়ের কার্য সংকোচন, বিরাম এবং প্রসারণ। ইহার এই কার্য-সমষ্টিই অহর্নিশি আমাদিগের দেহে শোণিতপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদয় প্রতি মিনিটে ৭২ বার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে চারিটি কক্ষ আছে, উপরের দুইটি কক্ষের নাম **অলিন্দ** (Auricles), এবং নিম্নের দুইটি কক্ষের নাম **নিলয়** (Ventricles)। বাম দিকের নিলয় হইতে একটি মোটা নল বহির্গত হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রধান রক্তনলীর নাম **মহাধমনী** (Aorta), এবং ইহার শাখা প্রশাখাগুলির নাম **ধমনী** (Arteries)। ধমনী দ্বারাই দেহের সর্বত্র শোণিত সরবরাহ হয়। ধমনীগুলি যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানে তাহারা অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত হইয়া জালের মত দেখায়, ইহাদের নাম **জালক** (Capillaries)। জালকগুলি পুনরায় সংযুক্ত হইয়া আর একপ্রস্থ নলের সৃষ্টি করে, এই সকল নল দিয়া রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া যায়, ইহা-দিগের নাম **শিরা** (Veins)। শিরাগুলি হৃদয়ে যাইবার পূর্বে

পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দুইটি মাত্র মোটা শিরায় পরিণত হয়, তন্মধ্যে একটি আমাদিগের মাথা, মুখ, গলা ও হাত হইতে শোণিত বহন করিয়া আনে, ইহার নাম **উত্তরা মহাশিরা** (Supeior Vena Cava) ; এবং অপরটি পা ও শরীরের অন্যান্য ভাগ হইতে শোণিত বহন করিয়া আনে, ইহার নাম **অধরা মহাশিরা** (Inferior Vena Cava)। এই প্রধান শিরা দুইটি দ্বারা বাহিত হইয়া রক্ত, হৃদয়ের দক্ষিণদিকের অলিন্দে পতিত হয়, তথা হইতে উহা দক্ষিণ দিকের নিলয়ে প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকের নিলয় হইতে একটি ধমনী বাহির হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদিগের নাম **ফুস্‌ফুস্‌ধমনী** (Pulmonary Arteries), ইহা দিগের দ্বারা শোণিত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। ইহারাও অন্যান্য ধমনীর ন্যায় বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া জালকে পরিণত হয় এবং পরে শিরায় পরিণত হইয়া হৃদয়ের বাম অলিন্দে রক্ত বহন করিয়া আনে। এই শিরাগুলির নাম **ফুস্‌ফুসোত্থ শিরা** (Pulmonary Veins)।

কপাটক। অলিন্দ ও নিলয়দ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া দুইটি দ্বার আছে ; এই দ্বার দুইটি **কপাটক** (Valve) দ্বারা এরূপভাবে রক্ষিত যে হৃদয়ের প্রসারণকালে শোণিত অলিন্দ হইতে নিলয়ে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের সংকোচনের সময় নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। হৃদয়ের যে স্থান হইতে মহাধমনী ও ফুস্‌ফুস্‌ধমনী বাহির হইয়াছে, সেই সকল স্থানেও এরূপ কৌশলে কতকগুলি কপাটক সন্নিবিষ্ট আছে যে, হৃদয়ের সংকোচনের সময় শোণিত ধমনী দিয়া বাহির হইতে পারে, কিন্তু প্রসারণের সময়ে হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতে পারে না।

হৃৎশব্দ। হৃদয় যখন সংকুচিত হয়, তখন অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগস্থলস্থিত কপাটকগুলি, এবং হৃদয়ের প্রসারণের সময় মহাধমনী

ও ফুস্‌ফুস্‌ধমনীর সহিত হৃদয়ের সংযোগস্থলস্থিত কপাটকগুলি সশব্দে বন্ধ হয়। কাহারও বক্ষের উপর কর্ণ স্থাপন করিলে আমরা যে টিপ্‌ টিপ্‌ শব্দ শুনিতে পাই, তাহা উক্ত কপাটক বন্ধ হইবার শব্দ।

ধমনী। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহাধমনী হৃদয়ের বাম নিলয় হইতে বাহির হয়। প্রথমত ইহা উপরের দিকে যায়, পরে গলার কিছু নিম্নে (ছাতার বাঁটের ন্যায়) বাঁকিয়া বক্ষের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া নীচে নামিয়া আইসে ; এই সময় ইহা পৃষ্ঠবংশের প্রায় সম্মুখে অবস্থিত থাকে। কটিদেশে মহাধমনী দুইভাগে বিভক্ত হয়, এবং শ্রোণিচক্রের মধ্য দিয়া অধঃশাখাদ্বয়ে গমন করে। মহাধমনী হৃদয়ের উপরে যে স্থানে বাঁকিয়াছে, তথা হইতে তিনটি শাখা বহির্গত হয়, তন্মধ্যে একটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্বসমেত চারিটি ধমনী সৃষ্টি করে। ইহারা মুণ্ড ও উধ্বর্শাখায় শোণিত সরবরাহ করিয়া থাকে। মূলধমনী ও তাহার উক্ত প্রধান শাখাসমূহ হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া পারিপার্শ্বিক অস্থি, ত্বক প্রভৃতি দেহের সর্ব অংশে শোণিত বহন করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে হৃদয় সর্বদাই সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। হৃদয় যখন সংকুচিত হয়, তখন বাম নিলয় হইতে মূলধমনী দ্বারা শোণিত নির্গত হইয়া ধমনী ও তাহাদিগের শাখা প্রশাখা দ্বারা দেহের সর্বত্র সংবাহিত হয়। এই সময় দেহের আভ্যন্তরিক দূষিত গ্যাসসকল শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাকে কলুষিত করে। কলুষিত শোণিত শিরা দ্বারা হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আইসে। এই সময় অলিন্দ সংকুচিত ও নিলয় প্রসারিত হয় এবং শোণিত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। তথা হইতে হৃদয়ের সংকোচন দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত কলুষিত শোণিত ফুস্‌ফুস্‌ধমনী দ্বারা ফুস্‌ফুসে নীত হয়, তথায় আমরা প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি সেই বায়ুস্থিত

অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, এবং রক্তমিশ্রিত দূষিত কার্বণ-ডাইঅক্সাইড্ নামক গ্যাস নিশ্বাসের সহিত নির্গত হয়। অক্সিজেন মিশ্রিত শোণিত ফুস্ফুসোত্থ শিরা দ্বারা বাম অলিন্দে ও তথা হইতে বাম নিলয়ে গমন করে, এই সময় নিলয় প্রসারিত থাকে। ইহার পর নিলয়ের সংকোচন হয় ও মহাধমনী দ্বারা অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত পুনরায় দেহে সঞ্চালিত হয়। এইরূপ প্রতিনিয়ত শোণিত দেহের মধ্যে ঘুরিতেছে, কার্বণডাইঅক্সাইড্ নামক গ্যাস ফুস্ফুসে বহন করিয়া তথায় পরিত্যাগ করিতেছে, এবং অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহে সঞ্চালিত হইতেছে।

শ্বসন তন্ত্র (Respiratory System)

শ্বসন যন্ত্রাবলীর নাম যথাক্রমে (১) **নাসরন্ধ্র**, (২) **নাসাপথ**, (৩) **ক্লোমনলিকা** (Wind Pipe), (৪) **ক্লোমশাখা** (Bronchial Tubes) এবং (৫) **ফুস্ফুস্** (Lungs)।

আমরা নাক বা মুখ দ্বারা প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। (যদিও মুখ দ্বারা প্রশ্বাস গ্রহণ করা উচিত নহে)। প্রশ্বাসবায়ু যথাক্রমে ক্লোমনলিকা ও ক্লোমশাখার ভিতর দিয়া ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। গ্রীবার সম্মুখভাগে যে উচ্চ ত্রিভুজাকৃতি অংশটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম **কণ্ঠমণি** (Adam's Apple)। ত্বকাবৃত **স্বরযন্ত্রই** (Larynx) বাহির হইতে কণ্ঠমণিরূপে দেখা যায়। স্বরযন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে ক্লোমনলিকা আরম্ভ হইয়াছে এবং বক্ষের মধ্যস্থলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বের ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিভক্ত দুই ভাগের নাম ক্লোমশাখা। ক্লোমনলিকা দেখিতে স্প্রিংএর নলের ন্যায়। ফুস্ফুসের মধ্যে ক্লোমশাখা

বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিতে পরিণত হয়। এই থলিগুলির নাম **বায়ুস্থলি** (Air Sacs)।

হৃদয়ের দুই পার্শ্বে দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ অবস্থিত। হৃদয়ের ন্যায় ফুস্‌ফুস্‌ও দুইখানি পর্দা দ্বারা আবৃত, ইহাদিগের নাম **ফুস্‌ফুস্‌ধরা কলা** (Pleuræ)। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, তখন ফুস্‌ফুস্‌ দুইটির অন্তর্গত বায়ুস্থলীসমূহ বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া স্ফীত হয় এবং যখন আমরা নিশ্বাস ত্যাগ করি তখন তাহারা সংকুচিত হয়। প্রতি মিনিটে ফুস্‌ফুস্‌ ষোল বা আঠার বার এইরূপ স্ফীত ও সংকুচিত হইয়া থাকে। আমরা হৃদয়ের ক্রিয়া ইচ্ছানুসারে একবারও বন্ধ করিতে পারি না, কিন্তু ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি।

প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করা হয়, তাহার অক্সিজেন অংশ ফুস্‌ফুসে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সমস্ত অংশে নীত হয়, এবং শরীরজাত কার্বণডাইঅক্সাইড্‌ শোণিতের সহিত ফুস্‌ফুসে ফিরিয়া আইসে এবং আমাদের নিশ্বাস দ্বারা বাহির হইয়া যায়। ফুস্‌ফুসের নিম্নে বক্ষ ও উদরকে বিভিন্ন করিয়া একখানি পেশি নির্মিত বিভাজক আছে, তাহার নাম **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm)। প্রধানত এই মধ্যচ্ছদার সাহায্যে ফুস্‌ফুসের সংকোচন ও প্রসারণ হইয়া থাকে।

ফুস্‌ফুস্‌-ধমনী দ্বারা শোণিত ফুস্‌ফুসে গমন করে। তথায় ধমনী নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালকে পরিণত হইয়া ফুস্‌ফুসের বায়ুস্থলিগুলির গাত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলগ্ন থাকে। প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ুস্থলীগুলি বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়। বায়ুস্থলির মধ্যস্থ বায়ু ও জালকের মধ্যস্থ শোণিত কেবল বায়ুস্থলী ও জালকের আবরণী দ্বারা বিভিন্ন থাকে। এই আবরণীদ্বয় এরূপ সূক্ষ্ম যে, কোন তরল পদার্থ উহাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে না, কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থসমূহ অনায়াসে

গমনাগমন করিতে পারে। শোণিতের লোহিত রক্তকণিকা সমূহে হিমোগ্লোবিন (Hæmoglobin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে; প্রশ্বাস বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজেনের অধিকাংশ উক্ত হিমোগ্লোবিনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসোত্থশিরা দ্বারা হৃদয়ে এবং তথা হইতে ধমনী সমূহ দ্বারা শরীরের সমুদয় অংশে গমন করিয়া থাকে। অক্সিজেন তথায় হিমোগ্লোবিন হইতে পৃথক হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে, এবং দৈহিক সেলসমূহের কার্বণের কতক অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্বণডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই কার্বণডাইঅক্সাইড্ শোণিতের সহিত সংযুক্ত হইয়া যথাক্রমে শিরা, হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ধমনী দ্বারা ফুস্‌ফুসে গমন করে; তথায় ইহা শোণিত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বায়ুস্থলীতে প্রবেশ করে এবং নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়।

নার্ভতন্ত্র (Nervous System)

পেশিসমূহ যে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে, তাহার মূল **নার্ভ** (Nerve)। করোটিকার মধ্যে **মস্তিষ্ক** (Brain) নামক একটি অদ্ভুত যন্ত্র আছে; ইহাই এই সকল নার্ভমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র। ইহা আমাদিগের শরীর ও মনকে পরিচালিত করিতেছে। (১) স্মৃতি, চিন্তাশক্তি, বিচারক্ষমতা প্রভৃতি উচ্চ গুণাবলী মানব ব্যতীত অপর কোন প্রাণীর নাই, অন্তত এত পরিস্ফুট নহে, তাহার কারণ, মানবের মস্তিষ্ক অপর প্রাণীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২) দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীও এই মস্তিষ্কের সাহায্যে হইয়া থাকে। (৩) শরীরের বিভিন্ন অংশকে পরিচালনার নিমিত্ত, এবং (৪) বিভিন্ন স্থান হইতে অনুভূতি গ্রহণ করিবার জন্য মস্তিষ্কে বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে, ইহাদিগের নাম

যথাক্রমে **চেষ্টাকেন্দ্র** (Motor Centre) এবং **সংজ্ঞাকেন্দ্র** (Sensory Centre)। চিন্তা, স্মৃতি, বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনার নিমিত্তও ইহাতে পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট আছে। মস্তিষ্কের নিম্নদেশ হইতে **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal Cord) নামক অংশ বহির্গত হইয়া পৃষ্ঠবংশের মধ্যে অবস্থান করে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বহু শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া আমাদিগের দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই সকল শাখা প্রশাখার নাম **নার্ভ** (Nerve)। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে **কেন্দ্রীয়** (Central) নার্ভতন্ত্র এবং নার্ভগুলিকে **বহিঃ** (Peripheral) নার্ভতন্ত্র কহে।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে অসংখ্য নার্ভসেল বিদ্যমান আছে, এই সকল সেলের মধ্যে যেগুলি হইতে **উত্তেজনা** (Impulse) প্রবাহিত হয়, তাহাদিগের নাম **প্রেরক নার্ভসেল** (Efferent Nerve Cell), এবং যেগুলি **অনুভূতি** বা **সংজ্ঞা** (Sensation) গ্রহণ করে, তাহাদের নাম **গ্রাহক নার্ভসেল** (Afferent Nerve Cell)। প্রত্যেক নার্ভ কতকগুলি নার্ভতন্তুর সমষ্টি। নার্ভগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। (১) যে সকল নার্ভের তন্তু (Fibre) মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের প্রেরকসেল হইতে বহির্গত হয় এবং তথা হইতে উত্তেজনা বহন করিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া যায়, তাহাদিগকে **বহির্মুখ** (Efferent) নার্ভ কহে। (২) যে সকল নার্ভ ইন্দ্রিয়াদি দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে মস্তিষ্কে বা সুষুম্নাকাণ্ডে অনুভূতি বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের নাম **অন্তর্মুখ** (Afferent) নার্ভ। (৩) কতকগুলি নার্ভ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের অন্তর্গত নার্ভসেলগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করে, ইহাদিগকে **কেন্দ্রীয়** (Intercentral) নার্ভ

বলা হয়। বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়া যেরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয়, নার্ভের মধ্য দিয়া সেইরূপে উত্তেজনা ও অনুভূতি প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেহের প্রত্যেক ইচ্ছানুগপেশি বহির্মুখ নার্ভ দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহাদিগের নাম **চেষ্টীয়** (Motor) নার্ভ। ত্বক প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক স্থানেই অন্তর্মুখ নার্ভের সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

দেহের কোন অংশ সঞ্চালিত করিতে হইলে, উক্ত অংশ সংশ্লিষ্ট পেশির সঞ্চালন আবশ্যক। এই সঞ্চালন চেষ্টীয় নার্ভ দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা যখন হস্ত পদাদি কোন অঙ্গ সঞ্চালন করিবার, অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার ইচ্ছা করি, তখন মস্তিষ্ক হইতে উত্তেজনা বিভিন্ন চেষ্টীয় নার্ভ দ্বারা বাহিত হইয়া যে অংশের সঞ্চালন আবশ্যক উক্ত অংশের অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশিতে উপস্থিত হইয়া উহাকে সংকুচিত করে, ফলে উক্ত অস্থি সন্ধির উপর চালিত হইয়া ইপ্সিত অঙ্গকে পরিচালিত করিয়া থাকে। **ধম্মিলক** (Cerebellum) নামক মস্তিষ্কের পশ্চাদংশ উভয়পার্শ্বীয় পেশি সমন্বয় (Bilateral Co-ordinatlon) করিয়া অঙ্গ পরিচালনার সৌষ্ঠব প্রদান করে।

বহির্মুখ নার্ভতন্তু সমূহ মস্তিষ্কের **প্রেরক নার্ভ সেল** (Motor Nerve Cell) হইতে বহির্গত হইয়া সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ নার্ভ সেল্ পর্যন্ত আসিয়া সমাপ্ত হয়। আবার শেষোক্ত নার্ভ সেল হইতে পৃথক্ নার্ভতন্তু বহির্গত হইয়া হস্তপদাদির পেশিতে প্রবেশ করে, তথায় প্রত্যেক নার্ভতন্তু দুই তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া এক একটি শাখা এক একটি পেশিতন্তুতে প্রবেশ করিয়া সমাপ্ত হয়। যে স্থলে বহির্মুখ নার্ভতন্তুগুলি সমাপ্ত হয়, তাহার নাম **নার্ভ**

প্রান্ত (End Plates)। সুষুম্নাকাণ্ডের সন্নিকটে কতকগুলি **নার্ভগ্রন্থি** (Ganglia) আছে ; এই গ্রন্থিগুলিতে বহু **সংজ্ঞা নার্ভ সেল** (Sensory Nerve Cells) অবস্থিত। এই সকল সেল হইতে নার্ভতন্তু বহির্গত হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়, একটি শাখা ত্বকে গমন করে ও অপর শাখাটি সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কে যায় এবং তথাকার গ্রাহক নার্ভসেলের নিকট সমাপ্ত হয়।

দেহের বিভিন্ন অংশকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিবার জন্য যে শাসন বিভাগ আছে, মস্তিষ্ক তাহার প্রধান কার্যালয় (Head Office), সুষুম্নাকাণ্ড তাহার শাখা কার্যালয় (Sub Office), এবং নার্ভ সকল তাহার সংবাদ ও শক্তিবাহক। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী বর্ণনা করিতেছি। আমার পদে একটি মশক দংশন করিল। পদের এই অংশের সংজ্ঞানার্ভ মশক-দংশন সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডে প্রেরণ করিল। সুষুম্নাকাণ্ড উক্ত সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র চেষ্টীয় নার্ভ দ্বারা পদের পেশিদিগকে পা সরাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিল, পেশিগণও তৎক্ষণাৎ আদেশ মান্য করিয়া পা সরাইয়া লইল। ইতিমধ্যে সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছে যে, পায়ের অমুক স্থানে বিপদ উপস্থিত। মস্তিষ্ক সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র চক্ষুকে কি হইয়াছে দেখিবার জন্য আদেশ করিল। চক্ষু দেখিল একটি মশা বসিয়া আছে। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ডের মারফৎ হাতের জন্য নির্দিষ্ট চেষ্টীয় কেন্দ্রদিগকে হুকুম করিল বিভিন্ন পেশিকে পরিচালিত করিয়া মশাটিকে মারিয়া ফেল। মশা মারিবার জন্য হাতের যে যে পেশির সঞ্চালন আবশ্যক, নার্ভ দ্বারা সেই সকল পেশিতে মস্তিষ্ক হইতে উত্তেজনা সঞ্চালিত হইল, উক্ত উত্তেজনা দ্বারা চালিত হইয়া হাত মশাটিকে মারিয়া ফেলিল। এত কাণ্ড হইল কিন্তু চক্ষের

নিমিষে। কি সুন্দর বন্দোবস্ত! দেহের সর্বত্রই এইরূপ বন্দোবস্তে কার্য চলিতেছে। এই কার্য প্রণালী কি অতীব বিস্ময়কর নহে?

কেন্দ্রীয় ও বহিঃনার্ভতন্ত্র ব্যতীত আর এক প্রস্থ নার্ভতন্ত্র আছে। তাহার নাম **স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র** (Sympathetic Nervous System)। ইহা পৃষ্ঠবংশের সম্মুখে অবস্থিত দুইটি নার্ভের শৃঙ্খল ও তাহাদিগের শাখা প্রশাখা দ্বারা গঠিত। এই তন্ত্রই হৃদয়, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশিদিগকে পরিচালনা করে। মস্তিষ্ক কিন্তু পরোক্ষভাবে এই তন্ত্রের কার্যও পরিদর্শন করিয়া থাকে।

নার্ভের কার্য। (ক) বহির্মুখ নার্ভ সমূহ মনুষ্যদেহে সাধারণত পাঁচ প্রকার কার্য সম্পন্ন করে এবং তদনুসারে তাহাদিগকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। (১) কতকগুলি বহির্মুখ নার্ভ প্রেরকসেল হইতে **পেশিসমূহে** উত্তেজনা বহন করিয়া উহাদিগকে সঞ্চালিত করে; ইহাদিগের নাম চেষ্টীয় (Motor) নার্ভ। (২) কতকগুলি নার্ভ হৃদয় প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ যন্ত্রসমূহের গতি **দ্রুততর** করে; (৩) কতকগুলি, উক্ত যন্ত্র সমূহের গতি **মন্দীভূত** করে; (৪) কতকগুলি বহির্মুখ নার্ভ লালা, ঘর্ম প্রভৃতি **নিঃসারক গ্রন্থিকে** রসনিঃসরণে উত্তেজিত করে; (৫) কতকগুলি নার্ভ দেহের বিভিন্নাংশে **পুষ্টিকারক** (Trophic) উত্তেজনা বহন করে।

(খ) অন্তর্মুখ নার্ভগুলি শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে মস্তিষ্কে বা সুষুম্নাকাণ্ডে অনুভূতি বহন করিয়া থাকে, ইহাদিগের নাম সংজ্ঞা (Sensory) নার্ভ। অনুভূতি প্রধানত তিন প্রকার, তদনুসারে অন্তর্মুখ নার্ভদিগকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) কতকগুলি নার্ভ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে

বিশেষ অনুভূতি বহন করে। (২) কতকগুলি নার্ভ সমস্ত শরীরের সাধারণ **স্বস্তি** ও **অস্বস্তির** অনুভূতি বহন করে। (৩) অবশিষ্ট অন্তর্মুখ নার্ভগুলি দৈহিক **বেদনার** অনুভূতি বহন করে।

(গ) কেন্দ্রীয় নার্ভগুলি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন নার্ভ সেলকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া উহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে উত্তেজনা ও অনুভূতি বহন করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয় স্থান (Sense Organs)

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক এই পাঁচটিকে ইন্দ্রিয়স্থান (Sense Organs) কহে।

চক্ষু। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। ইহা করোটির অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থিত থাকে। সমগ্র চক্ষু দেখিতে গোল বলের ন্যায়। নেত্র গোলকে দুইটি আবরণ আছে, বহিরের আবরণের নাম **শ্বেতমণ্ডল** (Sclerotic Coat), এবং ভিতরের আবরণের নাম **কৃষ্ণমণ্ডল** (Choroid coat)। বাহির হইতে চক্ষের যে সাদা অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা শ্বেতমণ্ডলের অংশ। ইহার সম্মুখ ভাগের গোল স্বচ্ছ অংশের নাম **অচ্ছোদ পটল** (Cornea)। কৃষ্ণমণ্ডল ও অচ্ছোদ পটলের সংযোগস্থলে কাল ঝিল্লির একখানি চাকৃতি আছে, ইহাকে **কনীনিকা** (Iris) কহে। কনীনিকার কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, উহা প্রয়োজন মত ছোট বা বড় হইতে পারে, এই ছিদ্রের নাম **তারারন্ধ্র** (Pupil)। কনীনিকার পশ্চাৎভাগে বাদামের আকারে একটি স্বচ্ছ পদার্থ আছে তাহার নাম **নেত্র-লেন্স** (Lens)। অচ্ছোদ পটলের ও লেন্সের মধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ (Aqueous Humour), এবং লেন্সের পশ্চাতে সমগ্র

অক্ষি গোলককে পূর্ণ করিয়া এক প্রকার সান্দ্র (Viscous) পদার্থ (Vitreous Humour) আছে। অক্ষিগোলক একটি নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংবদ্ধ। এই নার্ভ অক্ষি গোলকের মধ্যে পাতলা কাগজের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণমণ্ডলের অন্তরাবরণ রূপে বিস্তৃত থাকে, ইহার নাম **অক্ষিপট** (Retina)। একটি ক্ষুদ্র পেশি দ্বারা চক্ষুর লেন্স অক্ষি গোলকের সহিত সংযুক্ত থাকে। আমরা চক্ষুর যে অংশ দেখিতে পাই, উহা **নেত্রবর্ত্মকলা** (Conjunctiva) নামক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

যখন আমরা কোন বস্তু দর্শন করি, তখন সেই বস্তু হইতে
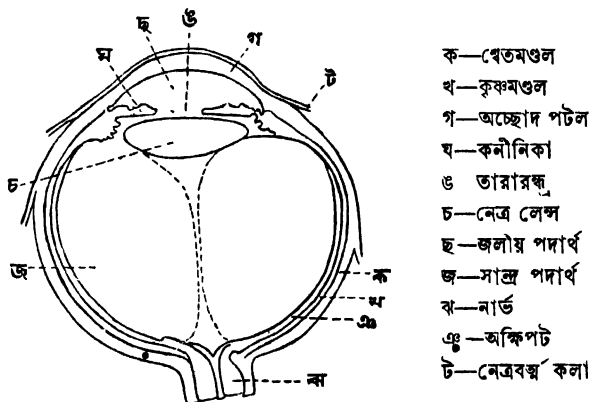
৪০নং চিত্র

আলোক রশ্মি আসিয়া আমাদিগের অচ্ছোদ পটলের উপর পতিত হয়। পরে উহা যথাক্রমে পূর্বোক্ত জলীয় পদার্থ, লেন্স ও সান্দ্র পদার্থ ভেদ করিয়া অক্ষিপটে পতিত হয়। অক্ষিপট হইতে উক্ত বস্তুর প্রতিচ্ছবির সংজ্ঞা পূর্বোক্ত নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলে আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই।

আমরা যখন নিকটস্থ কোন বস্তু দেখিবার চেষ্টা করি, তখন তারারন্ধ্র ক্ষুদ্রতর হয় ও পূর্বোক্ত পেশির সংকোচন দ্বারা লেন্স স্থূলতর হয়। ফলত কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে লেন্স ও কনীনিকা এরূপভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, যে উক্ত দ্রব্যের প্রতিচ্ছবি ঠিক অক্ষিপটে নিপতিত হইয়া থাকে। অতি দূরস্থিত কোন বস্তু দেখিবার সময় কনীনিকা ও লেন্সের পেশি বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়।

কর্ণ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের নাম কর্ণ। কর্ণকে সাধারণত তিন অংশে ভাগ করা হয়। (১) বাহির হইতে কর্ণের ভিতরে যতদূর দেখা যায়
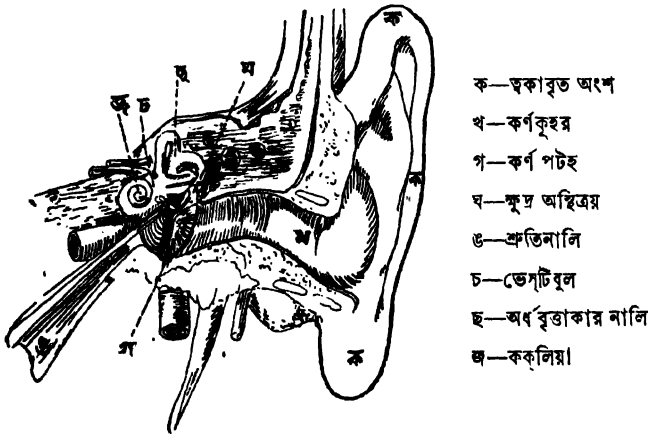
৪১নং চিত্র

তাহার নাম **বহিঃকর্ণ** (External Ear)। কর্ণের ত্বকাবৃত অংশ, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ বহিঃকর্ণের অংশ। (২) কর্ণ পটহের পশ্চাতের অংশের নাম **মধ্যকর্ণ** (Middle Ear)। আমরা কর্ণের এই অংশ বাহির হইতে দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে তিনখানি অতি

ক্ষুদ্র অস্থি (Hammer, Anvil ও Stirrup Bones) এরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে যে কর্ণ পটহে কোন শব্দ প্রতিঘাত হইলে উক্ত শব্দতরঙ্গ এই সকল অস্থি পরম্পরায় অন্তঃকর্ণে সঞ্চালিত হয়। মধ্যকর্ণ ও মুখগহ্বরকে সংযুক্ত করিয়া **শ্রুতিনালি** (Eustachian Tube) নামক একটি নল আছে। ইহা দ্বারা মুখগহ্বরের তথা বহির্বায়ুর সহিত সংযুক্ত থাকে বলিয়া, মধ্যকর্ণের বায়ুর চাপ সর্বদা বহির্বায়ুর চাপের সহিত সমান থাকে। (৩) মধ্যকর্ণের পরবর্তী অংশের নাম **অন্তঃকর্ণ** (Internal Ear)। কর্ণের এই অংশও আমরা বাহির হইতে দেখিতে পাই না। ইহার তিনটি অংশ আছে, (ক) Vestibule, (খ) তিনটি Semi-circular Canals ও (গ) Cochlea। ককলিয়া দেখিতে শামুকের খোলার ন্যায় পাকান, ইহার মধ্যেই শব্দগ্রহণী যন্ত্রাবলী সন্নিবিষ্ট থাকে। এই সকল শব্দগ্রহণী যন্ত্র হইতে একটি নার্ভ বহির্গত হইয়া কর্ণকে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করে।

শব্দ, তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। শব্দের তরঙ্গাবলী কর্ণকুহরের মধ্য দিয়া কর্ণপটহে আঘাত করে। উক্ত আঘাত মধ্যকর্ণস্থ অস্থি পরম্পরায় অন্তঃকর্ণে উপস্থিত হইয়া তথাকার ককলিয়ায় অবস্থিত শব্দগ্রহণী যন্ত্রাবলী কম্পিত করে। এই কম্পনের অনুভূতি উক্ত নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি।

নাসিকা। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহার অভ্যন্তর ভাগ শ্লেষ্ম ঝিল্লি (Mucous Membrane) দ্বারা আবৃত। এই ঝিল্লির উপরের অংশে একটি নার্ভের বহু শাখা প্রশাখা সন্নিবিষ্ট থাকে। নাসিকার অভ্যন্তর, পূর্বোক্ত ঝিল্লি নিঃসৃত রস দ্বারা সতত সিক্ত থাকে।

গন্ধযুক্ত কোন পদার্থের ক্ষুদ্র কণিকা, নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে উহা সিক্ত ঝিল্লিতে সংলগ্ন হয়, এবং উহার গন্ধের অনুভূতি পূর্বোক্ত

নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে আমরা সেই পদার্থের আঘ্রাণ পাইয়া থাকি।

স্বাদ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের নাম যথাক্রমে, **জিহ্বা** ও **ত্বক**। ইহাদিগের বিষয় পরে বলা হইবে।

রেচন তন্ত্র (Excretory System)

উদরের মধ্যে পৃষ্ঠবংশের দুই পার্শ্বে প্রায় চারি ইঞ্চি লম্বা সীম-বীজের আকারের দুইটি যন্ত্র আছে, তাহাদিগের নাম **বৃক্ক** (Kidnies)। ইহারা আমাদিগের রক্তের ছাঁকনির কার্য করে, এই স্থানে দেহের অতিরিক্ত জলভাগ এবং তাহার সহিত নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। আমরা যে জল পান করি, তাহা শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন এবং অভ্যন্তর ধৌত করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যে অংশ শরীরের অভ্যন্তর ধৌত করে, উহা দেহের নানাপ্রকার দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বৃক্ক দ্বারা প্রস্রাবে পরিণত হয়। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে এক একটি নল (Ureter), তলপেটে অবস্থিত **বস্তি** (Bladder) নামক থলির মধ্যে প্রস্রাব বহন করে। বস্তি প্রস্রাবে পূর্ণ হইলে সংকুচিত হয় এবং আমরা প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকি। বৃক্কের ন্যায় ত্বকও দেহের বহু আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দেয়।

ত্বক (Skin)

আমাদিগের দেহের বহির্ভাগ প্রায় সর্বত্র ত্বক দ্বারা আবৃত। আতসী কাচের (Magnifying Lens) সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ছিদ্রের নাম **লোমকূপ**

(Hair Follicles)। করতল, পদতল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত ত্বকে প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কেশ দেখা যায়।

ত্বক প্রধানত দুইটি স্তবকে গঠিত (১) বাহিরের স্তবকের নাম **বহিস্ত্বক** (Epidermis), এবং (২) ভিতরের স্তবকের নাম **অন্তস্ত্বক** (Dermis)। শরীরের অধিকাংশ স্থানে ত্বকের মধ্যে পেশিতন্তু থাকে বলিয়া সেই সকল স্থানের ত্বক সংকুচিত হইতে পারে।

ত্বকের কার্য। (১) বহিস্ত্বক পাৎলা হইলেও উহা কাইটিন নামক কঠিন পদার্থে নির্মিত, সেইজন্য ইহা শরীরকে শীতাতপ, কীট-পতঙ্গাদির দংশন প্রভৃতি নানা প্রকার বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে। (২) অন্তস্ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **স্বেদগ্রন্থি** (Sweat Glands) অবস্থিত থাকায় রক্তের অতিরিক্ত জলীয় ভাগ এবং নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ ঘর্মরূপে বাহির হইয়া যায়। (৩) ত্বক হইতে অতিরিক্ত দৈহিক তাপ বিকীর্ণ হয়, অধিকন্তু ঘর্ম বাষ্পীভূত (Evaporated) হইয়া দৈহিক তাপহ্রাসের সহায়তা করে। (ক) ত্বক সংকুচিত হইলে, (খ) উহাতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত না হইলে, এবং (গ) ঘর্ম না হইলে দৈহিক তাপহ্রাস অল্প হয়, অন্যথা তাপহ্রাস অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং ত্বকের অন্যতম কার্য দৈহিক তাপ নিয়মিত করা। (৪) ফুস্‌ফুসের ন্যায় ত্বকও বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ, এবং দেহস্থ কার্বণডাইঅক্সাইড্ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে ফুস্‌ফুসের তুলনায় ত্বকের শ্বসনকার্য অতি অল্প (প্রায় $\frac{1}{২৫০}$ ভাগ)। (৫) ত্বক তৈলাদি নানাবিধ দ্রব্য বিশোষণ করিতে পারে। ত্বকে তৈল মর্দন করিলে উহা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যের কার্য করিয়া থাকে। এই প্রকারে মর্দনাদি দ্বারা ত্বকের সাহায্যে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। (৬) স্বেদগ্রন্থি ব্যতীত অন্তস্ত্বকে আর এক প্রকার গ্রন্থি আছে তাহাদের

নাম **স্নেহগ্রন্থি** (Sebaceous Glands) এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার স্নেহপদার্থ নিঃসৃত হইয়া দেহকে বিশেষত চুলকে তৈলাক্ত রাখে। লোমকূপ দ্বারা ত্বকের শ্বসনকার্য, ঘর্ম ও স্নেহ নিঃসরণ কার্য, এবং বিশোষণ কার্য সম্পন্ন হয়। (৭) ত্বকে সংজ্ঞানার্ভের প্রান্ত সমূহ অবস্থিত থাকায় বস্তুর অস্তিত্ব, উষ্মা, আকার প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুভূতি মস্তিষ্কে গমন করে, এবং আমরা ঐ সকল বিষয় অনুভব করিয়া থাকি, এইজন্য ত্বককে স্পর্শেন্দ্রিয় বলা হয়।

পাচন তন্ত্র (Digestive System)

আমরা মুখ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করি। সেই খাদ্য পৌষ্টিকনালির (Alimentary Canal) মধ্য দিয়া গমন করে। গমন করিবার সময় উহা পাচিত হয় এবং যথাক্রমে **পাকমণ্ডে** (Chyme) ও **খাদ্যরসে** (Chyle) পরিণত ও পৌষ্টিকনালি হইতে বিশোষিত হইয়া শোণিককর্তৃক দেহের সর্বাংশে নীত হয় এবং শরীরের পুষ্টি সাধনাদি কার্য সম্পন্ন করে। খাদ্যের অসারাংশ মলরূপে বাহির হইয়া যায়। মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত সমগ্র পৌষ্টিকনালির ভিতর দিক শ্লেষ্মঝিল্লি (Mucous Membrane) দ্বারা আবৃত। পৌষ্টিকনালির অধিকাংশ উদর মধ্যে অবস্থিত। বক্ষের ন্যায় উদরের সম্মুখে কোন অস্থি নাই; তিন জোড়া বিস্তৃত পেশি উদর গহ্বরকে সম্মুখ দিক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদিগকে **উদরচ্ছদা** বলে। সম্মুখ হইতে উদরচ্ছদা তিনটির নাম যথাক্রমে **উত্তমা** (External Oblique), **মধ্যমা** (Internal Oblique) এবং **চরমা** (Transverse) উদরচ্ছদা। বক্ষ ও উদর, মধ্যচ্ছদা নামক পেশি দ্বারা পৃথক আছে। উদরের মধ্যে খাদ্য গমনের জন্য একটি পথ আছে, তাহার নাম '**পৌষ্টিকনালি**।

পৌষ্টিকনালির সমুদয় অংশ অল্পাধিক ভাবে **অন্ত্রধরাকলা** (Peritoneum) নামক পর্দা দ্বারা আবৃত, এবং সমগ্র পৌষ্টিক-নালিটি অনৈচ্ছিকপেশি দ্বারা গঠিত। উদর মধ্যে পৌষ্টিকনালির **ক্রমসংকোচ** (Peristalsis) বশত খাদ্য নিম্নাভিমুখে গমন করে এবং আংশিক ভাবে পিষ্ট হইয়া পাচকরসের সহিত মিশ্রিত হয়।

যে সকল যন্ত্র দ্বারা পাচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এক্ষণে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

মুখ গহ্বরে পেশি নির্মিত একটি যন্ত্র আছে, তাহার নাম **জিহ্বা** (Tongue)। ইহার সাহায্যে আমরা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করি, এবং ইহাদ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া লালা-মিশ্রিত ও গলাধঃকৃত হয়। জিহ্বার উপর ছোট ছোট দানার ন্যায় কতকগুলি পদার্থ আছে, তাহাদিগের নাম **জিহ্বাগুটি** (Papillæ)। জিহ্বাগুটিতে স্বাদযন্ত্র (Taste Buds) অবস্থিত থাকে, ইহাদিগের দ্বারা আমরা খাদ্যের কটু, তিক্ত ইত্যাদি স্বাদ বুঝিতে পারি।

কর্ণের সম্মুখভাগে দুই পার্শ্বে দুইটি বড় **লালাগ্রন্থি** (Salivary Glands) আছে, তাহাদিগের নাম **প্যারটিড** (Parotid) গ্রন্থি; এতদ্ব্যতীত নীচের চোয়ালের নিম্নে দুইপার্শ্বে দুইটি ও জিহ্বার নিম্নে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি লালাগ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি হইতে লালার সহিত এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হইয়া কার্বো-হাইড্রেট, জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে। ১৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

আমাদিগের মুখগহ্বরে দুই পংক্তি দন্ত আছে। মনুষ্যজীবনে দুইবার দন্তোদ্গম হয়। শৈশবে যে সব দন্ত উঠে, তাহাদিগের নাম "**দুধে দাঁত**" (Temporary Teeth)। ইহারা সংখ্যায় সর্বসমেত কুড়িটি। সাধারণত শিশুর ছয় মাস হইতে দুই বৎসর বয়ঃক্রমের

মধ্যে সমস্ত "দুধে দাঁত" উঠিয়া থাকে। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ঐ সকল দন্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, এবং তাহাদিগের স্থলে **স্থায়ীদন্ত** (Permanent Teeth) উঠে। বার বৎসর বয়সের মধ্যে আটাশটি স্থায়ীদন্ত উঠে, এবং অবশিষ্ট চারিটি, সাধারণত সতের হইতে আটাশ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া থাকে।

প্রত্যেক দন্তকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দন্তের যে অংশ মাঢ়ীর মধ্যে থাকে, তাহাকে **শিকড়** (Root), এবং মাঢ়ীর উপরের অংশকে **মুকুট** (Crown) কহে; মুকুট ও শিকড়ের সংযোগ-স্থলের নাম **গ্রীবা** (Neck)। দন্তের মুকুটগুলি এনামেল (Enamel) নামক একপ্রকার উজ্জ্বল ও অত্যন্ত কঠিন পদার্থ দ্বারা আবৃত। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দন্ত সংখ্যা প্রত্যেক পংক্তিতে ষোলটি করিয়া বত্রিশটি, তন্মধ্যে সম্মুখের চারিটি করিয়া আটটির নাম **কৃন্তক দন্ত** (Incisor Teeth); কৃন্তকদন্তের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি সূক্ষ্মাগ্র দন্তের নাম **ছেদক দন্ত** (Canine Teeth); প্রত্যেক পংক্তিতে ছেদক দন্তের দুই পার্শ্বে ৫টি করিয়া ১০ স্থূলাকার দন্ত আছে, তন্মধ্যে ছেদক দন্তের পার্শ্বের দুইটি করিয়া দন্তের নাম **চর্বক** (Bicuspid) **দন্ত** এবং তৎপার্শ্বের তিনটি করিয়া দন্তের নাম **পেষক-দন্ত** (Molar Teeth)। চর্বক দন্তের দুইটি এবং পেষক দন্তের তিনটি করিয়া শিকড় থাকে, অবশিষ্ট দন্তগুলির শিকড় মাত্র একটি করিয়া।

পে পে পে | চ চ | ছে | কৃ কৃ কৃ কৃ | ছে | চ চ | পে পে পে

পে পে পে | চ চ | ছে | কৃ কৃ কৃ কৃ | ছে | চ চ | পে পে পে

সম্মুখের দন্ত দ্বারা আমরা খাদ্যদ্রব্য কর্তন ও ছেদন করিয়া জিহ্বার সাহায্যে তাহাদিগকে চর্বক ও পেষকদন্তশ্রেণিদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করি; তথায় খাদ্য দ্রব্য চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া লালার সহিত মিশ্রিত হয়।

মুখের এই লালা খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের বিশেষ সহায়তা করে। উত্তমরূপে লালা মিশ্রিত করিতে হইলে, খাদ্য দ্রব্য বহুক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা উচিত। ছেদকদন্ত দ্বারা মাংসাদি বিদ্ধ করা হয়।

মুখগহ্বরের পশ্চাদংশের নাম **গলবিল** (Pharynx)। গলবিল হইতে উদর পর্য্যন্ত খাদ্য গমনের জন্য একটি নল আছে, ইহার নাম **অন্ননালী** (Œsophagus)। চর্বিত খাদ্য মুখ হইতে অন্ননালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যদি খাদ্যদ্রব্যের কোন অংশ অন্ননালীর পরিবর্তে শ্লোমনলিকার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আমরা কাসিয়া উহা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করি, ইহাকে "বিষম লাগা" কহে। মধ্যচ্ছদার উপর আর কোন পরিপাক যন্ত্র নাই, অবশিষ্ট পরিপাক যন্ত্রগুলি মধ্যচ্ছদার নিম্নে অর্থাৎ উদরের মধ্যে অবস্থিত।

অন্ননালীর পরের অংশের নাম **পাকস্থলী** (Stomach)। ইহা দেখিতে একটি রবারেরর থলির ন্যায়। পূর্ণাবস্থায় ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় একফুট্ এবং প্রস্থে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। চর্বিত খাদ্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলে, তাহা পাকস্থলী নিঃসৃত পাচকরসের সহিত মিশ্রিত হয়। পাকস্থলীর তিনটি অংশ আছে; উহার উর্ধ্বাংশের নাম পাকস্থলী **স্কন্ধ** (Funds), মধ্যাংশের নাম পাকস্থলী **মধ্য** (Body) এবং নিম্নাংশের নাম পাকস্থলী **প্রণালিকা** (Pylorus)। প্রণালিকার সহিত ক্ষুদ্রান্ত্র সংযুক্ত আছে।

পাকস্থলীপ্রণালিকা হইতে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বাহির হইয়া **ক্ষুদ্রান্ত্রে** (Small Intestine) উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় উনিশ, কুড়ি ফিট লম্বা একটি নল। ইহার প্রথম অংশের নাম **ডুওডিনাম** (Duodenum), এবং তাহার পরের অংশদ্বয়ের নাম যথাক্রমে **জেজুনাম** (Jejunum) ও **ইলিয়াম** (Ileum) ডুওডিনামে খাদ্যদ্রব্য, পিত্ত (Bile) প্রভৃতি

পাচকরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যের সারাংশ শোষিত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া দেহের
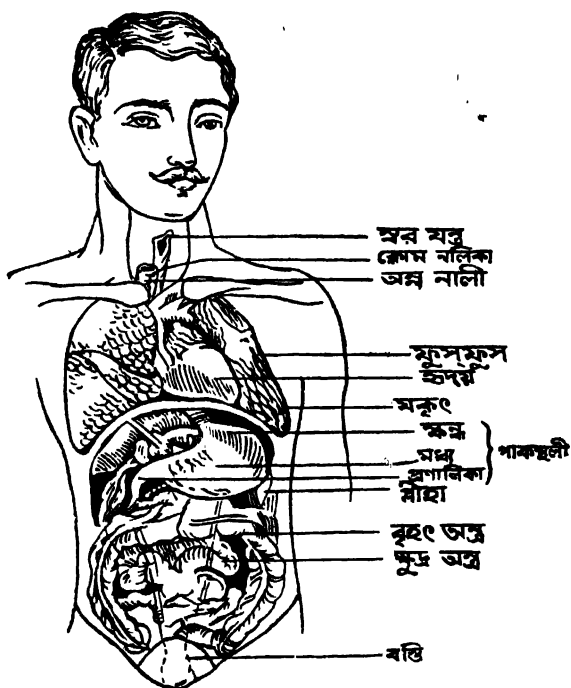
৪২নং চিত্র

ভিন্ন ভিন্ন অংশে গমন করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ, শক্তিসঞ্চার প্রভৃতি কর্তব্য সাধন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেও এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরের অংশের নাম **বৃহদন্ত্র** (Large Intestine) খাদ্যের সারাংশ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইবার পর যে অসার

অংশ পড়িয়া থাকে, তাহাই এই বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থলে সঞ্চিত খাদ্যের জলীয়ভাগ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট অংশ মলে পরিণত হইয়া উহার ক্রমসংকোচ (Peristalsis) বশত নির্গত হইয়া যায়। বৃহদন্ত্র প্রায় পাঁচফিট লম্বা। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা অনেক মোটা, সেইজন্য ইহাকে **স্থূলান্ত্রও** বলা হয়।

পৌষ্টিক নালির ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগ স্থল এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, ভুক্তদ্রব্য কেবল উপরের অংশ হইতে নিম্নের অংশে গমন করিতে পারে, দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা বিপরীত দিকে যাইতে পারে না। কখন কখন পাকস্থলী হইতে পাচকরস বা ভুক্তপদার্থ বিপরীতগামী হইয়া মুখমধ্যে উঠিয়া আইসে, ইহাকে বমন করা কহে।

পরিপাক ক্রিয়ার জন্য **যকৃৎ** (Liver) ও **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) নামক দুইটি গ্রন্থি হইতে যথাক্রমে **পিত্ত** ও **অগ্ন্যাশয়িক** নামক পাচক রস নিঃসৃত হইয়া ডুওডিনামে পতিত হয়, এবং তথায় খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। যকৃত মধ্যচ্ছদার নিম্নে অবস্থিত, এবং পঞ্জর দ্বারা আবৃত। অগ্ন্যাশয় পাকস্থলীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

যকৃতের কার্য। (১) ইহা পিত্ত নামক পাচক রস নিঃসরণ করে। (২) খাদ্যস্থ শ্বেতসার, শর্করা ও প্রোটীন যকৃতে **গ্লাইকোজেন** (Glycogen) নামক পদার্থে পরিণত হয় এবং তথাকার সেল সমূহ দ্বারা উহা আমাদিগের দৈহিক শর্করা ও স্নেহ দ্রব্যে পরিণত হইয়া (৩) যকৃত স্নেহাদি সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যকে শরীরের উপযোগী করিয়া গঠন করে। (৪) এই স্থানে দৈহিক স্নেহদ্রব্য যেমন গঠিত হয় সেইরূপ ভগ্ন হইবার উপযুক্ত অবস্থাতেও পরিণত হয়।

তোমরা পরে দেখিবে যে স্নেহাদি ভগ্ন না হইলে দৈহিক তাপ, কর্মশক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না।

অগ্ন্যাশয়ের কার্য। (১) অগ্ন্যাশয়িক নামক পাচক রস নিঃসরণ। (২) অগ্ন্যাশয় হইতে **ইনসুলিন** (Insulin) নামক একপ্রকার অন্তঃরস (Internal Secretion) রক্তে মিশ্রিত হইয়া অতিরিক্ত দৈহিক শর্করার উৎপত্তি নিবারণ করে; ইহার অভাব ঘটিলে লোকের মধুমেহ (Diabetes) ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

পাচন। তোমরা দেখিয়াছ যে লালাগ্রন্থি, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত কতকগুলি রসের সাহায্যে খাদ্যের পাচন সম্পন্ন হয়। ইহাদিগের নাম **পাচকরস** (Digestive Juices)। (১) **লালা**তে (Saliva), **টাএলিন** (Ptyalin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে; উহা খাদ্যস্থ **শ্বেতসার**কে (Starch) শর্করায় পরিণত করে; শ্বেতসার শর্করায় পরিণত না হইলে আমাদিগের শরীরগ্রাহ্য হয় না। (২) পাকস্থলী হইতে **লবণাম্ল** (Hydrochloric Acid), **পেপসিন** (Pepsin), **রেনিন** (Rennin) এবং **লিপেস্‌** (Lipase) নামক তিন প্রকার পাচক রস নির্গত হয়, উহাদিগের সাহায্যে প্রোটীনাদি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য আংশিক ভাবে পাচিত হইয়া **পেপটোন** (Peptone) প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হয়। (৩) আংশিক ভাবে পাচিত প্রোটীন্‌, স্নেহদ্রব্য ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, অগ্ন্যাশয়িক রসস্থিত **ট্রিপসিন** (Trypsin), **অ্যামিলপ্‌সিন** (Amylopsin) ও **লিপেস্‌** নামক (Lipase) কিণ্বসত্ব দ্বারা পূর্ণরূপে পাচিত হয়। (৪) পিত্ত, অগ্ন্যাশয়িক রসের কার্যের, বিশেষত স্নেহদ্রব্য পাচনের সহায়তা করে। খাদ্য আলোচনা কালে আমরা শ্বেতসার, প্রোটীন্‌ স্নেহদ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য বর্ণনা করিব।

খাদ্য (Food)

এঞ্জিনে যেমন জল ও কয়লা না দিলে উহা অচল হইয়া থাকে, সেইরূপ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে সমস্ত যন্ত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও আমাদিগের শরীর অচল হইয়া যায়। বিনা খাদ্যে আমরা কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তাহার কারণ এই যে, আমাদের পূর্বগৃহীত খাদ্যের কিয়দংশ দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং এই সময়ে উক্ত সঞ্চিত অংশ দ্বারা জীবনধারণ হয়।

খাদ্যের উপাদান। আমরা যাহা খাই তাহাই খাদ্য, একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যাহা খাইলে আমাদিগের শরীরের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন, তাপোৎপাদন, শক্তিসঞ্চার অথবা ব্যাধি-প্রতিরোধ হয়, তাহাই কেবল খাদ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পুষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন। খাদ্যের উপাদান (Proximate Principles) ছয় প্রকার।

প্রথম, **প্রোটীন** (Protein)। মৎস্য, মাংস. ডিম্ব, ছানা ও দাইলে খাদ্যের এই উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রোটীন প্রধানত আমাদিগের (১) শরীরের পেশি প্রভৃতি কলা গঠন করে, (২) দেহের বৃদ্ধি, (৩) ক্ষয়পূরণ ও (৪) পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে, এবং কখন কখন (৫) দৈহিক শক্তি সঞ্চার এবং (৬) তাপোৎপাদনও করিয়া থাকে। (৭) খাদ্যের এই উপাদান হইতে শরীরের পাচকরস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত শরীরের বৃদ্ধির সময়। জীবনের এই অবস্থায় প্রোটীন-প্রধান খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণত খাদ্যে প্রোটীনের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য, মাংস বা ছানা প্রভৃতি দুর্মূল্য বলিয়া সাধারণ লোকে উপযুক্ত

পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে পারে না, সেইজন্য উপযুক্ত প্রোটীন পাইবার জন্য আমাদিগকে দাইলের শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রোটীন ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যোপাদানে নাইট্রোজেন থাকে না।

দ্বিতীয়, **কার্বোহাইড্রেট্** (Carbohydrate)। চাউল, ময়দা, আলু, আঙ্গুর, বেদানা, চিনি প্রভৃতি খাদ্যে এই উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

তৃতীয়, **স্নেহদ্রব্য** (Fat)। মাখন, তৈল, ঘৃত, চর্বি প্রভৃতি খাদ্য এই জাতীয়। কার্বোহাইড্রেট্ ও স্নেহদ্রব্য হইতে শরীরের (১) তাপোৎপাদন ও (২) শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে, (৩) ইহা পেশি প্রভৃতি দৈহিক প্রোটীনের ক্ষয় নিবারণ করে। শরীরের যতটুকু প্রোটীন ও কার্বো-হাইড্রেটের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত আহার করিলে উহারা স্নেহ-দ্রব্যে পরিণত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্নেহদ্রব্য আহার করিলে উহা (৪) শারীরিক স্নেহরূপে দেহে সঞ্চিত থাকে এবং ভবিষ্যতে উপবাস প্রভৃতির সময় আহার্যের অভাব পূর্ণ করে। (৫) লেসিথিন (Lecithin) প্রভৃতি শরীরের কতকগুলি উপাদান স্নেহদ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়। শ্রমশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে কার্বোহাইড্রেট্ ও স্নেহ-প্রধান খাদ্য,অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

চতুর্থ, **লবণ** (Salt)। সৈন্ধব, কর্কচ প্রভৃতি অজৈব (Inorganic) লবণ, এবং দুগ্ধ, ডিম্ব, এবং নানাপ্রকার শাকসব্জি হইতে প্রাপ্ত জৈব লবণ খাদ্যের অপরিহার্য উপাদান। (১) রক্তের তারল্য রক্ষা করে বলিয়া, লবণ দেহে রক্ত সংবহনের সুবিধা করিয়া থাকে। (২) ইহা পাচকরস, শোণিত প্রভৃতির প্রধান উপাদান। (৩) শাকসব্জির লৌহ ঘটিত জৈব লবণ হইতে রক্তের হিমোগ্লোবিন্ নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। (৪) দুগ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়ম্ (Calcium) ও ফস্‌ফরাস্

(Phosphorus) ঘটিত লবণ পাওয়া যায়, ঐ সকল লবণ হইতে দেহের অস্থি গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চম, **ভাইটামিন** (Vitamin)। প্রধানত ছয় শ্রেণির ভাইটামিন আছে ; আমাদিগের শরীররক্ষার্থ ইহারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভাইটামিনহীন খাদ্য যতই পুষ্টিকর হউক না কেন, উহা দ্বারা আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব। (১) A শ্রেণির ভাইটামিনের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি সুচারুরূপে হইতে পারে না। দুগ্ধ ও তৈলাক্ত পদার্থে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। (২) চাউলের বাহিরের পাৎলা খোলায় B শ্রেণির ভাইটামিন অধিক বিদ্যমান থাকে, যাহারা ছাঁটা চাউল ব্যবহার করে, তাহারা ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রায়ই বেরিবেরি (Beri-beri) নামক রোগে আক্রান্ত হয়। (৩) টাট্‌কা ফলে ও শাকসব্জিতে C শ্রেণির ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ইহার অভাবে স্কার্ভি (Scurvy) নামক এক প্রকার রোগ জন্মে। অধিক দিন জাহাজে থাকিলে টাট্‌কা ফলের অভাব হয়, এবং যাত্রিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ করা হইলে, ফল বা শাকসব্জিস্থ C ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। (৪) D শ্রেণির ভাইটামিন A শ্রেণিরই এক অংশ। ত্বকের উপর যে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে আর্গোস্টেরল (Ergosterol) নামক এক প্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকে। দুগ্ধ, চর্বি প্রভৃতিতেও ইহা পাওয়া যায়। আর্গোস্টেরলের উপর সূর্যরশ্মি পড়িলে D শ্রেণির ভাইটামিন প্রস্তুত হয়। ইহার অভাবে বালক বালিকাগণের রিকেট (Ricket) নামক রোগ অনিবার্য। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে D শ্রেণির ভাইটামিন থাকে। প্রাণিগণের রৌদ্র সেবনের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের দুগ্ধে এই শ্রেণির ভাইটামিন বর্ধিত করা যায়। (৫) E শ্রেণির ভাই-

টামিন সন্তান প্রজননের সহায়তা করে। (৬) G বা B_2 শ্রেণির ভাইটামিন পেলেগ্রা (Pellagra) নামক ব্যাধি নিবারণ করে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, D শ্রেণির ভাইটামিন অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যহানি এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

ষষ্ঠ, **জল** (Water)। (১) রক্ত ও শরীরজাত নানাপ্রকার রস প্রভৃতি দেহের সমুদয় তরল পদার্থ আমাদের খাদ্যস্থ জল হইতে প্রস্তুত হয়, অধিকন্তু জল আমাদের (২) শরীরের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়।

কয়েকটি সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উক্ত ছয় প্রকার খাদ্যোপাদান শতকরা কত পরিমাণ বিদ্যমান আছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	প্রোটীন	কার্বো হাইড্রেট্	স্নেহদ্রব্য	লবণ	জল	ভাইটামিনের শ্রেণি-
	২.৯৭	৫.৮৭	২.৯০	০.১৬	৮৮.১০	A,B,C,D,E,G
গাভীদুগ্ধ	৪.০০	৪.৮০	৩.৭০	০.৭০	৮৬.৮০	A,B,C,D,E,G
ছাগীদুগ্ধ	৩.৬২	৪.০০	৪.২০	০.৫৬	৮৭.৬২	A,B,C
গর্দভীদুগ্ধ	১.৭৯	৫.৫০	১.০২	০.৪২	৯১.২৭	A,B,C,D,E,G
মহিষীদুগ্ধ	৪.৪০	৪.৮০	৯.০০	০.৮০	৮১.০০	A,B,C
ছাগ মাংস	২১.০০	০.৩০	২.৫০	১.২০	৭৫.০০	A,B,D,E,G
মুরগী মাংস	১৯.৭২	০.৬০	১.৪২	১.৩৭	৭৭.৮৯	A,B,D,E,G
হংসী ডিম্ব	১২.৫২	০.৩০	১৩.৭০	১.৬৫	৭১.৮৩	A,B,D,G
মুরগী ডিম্ব	১২.৫৫	০.৫৩	১২.১১	১.১২	৭৩.৬৯	A,B,D,G
ডিম্বের শ্বেতাংশ	১২.৬০	০.৭৫	০.২৫	০.৫৯	৮৫.৮৬	G
ডিম্বের পীতাংশ	১৬.২০	০.০১	৩১.৭৫	১.০৯	৫০.৯৫	A,B,D,E,G

		কার্বো				ভাইটা
	প্রোটীন্	হাইড্রেট্	স্নেহদ্রব্য	লবণ	জল	মিনের শ্রেণি
রোহিত মৎস্য	১৬.০০	০.৫০	৫.০০	১.১০	৭৭.৪০	A,B,D
মদ্গুর মৎস্য	১৭.০০	০.৩০	০.৫০	১.৩০	৮০.৯০	A,B
চাউল	৭.৭০	৭৬.০০	০.৪০	০.৫০	১৫.৫০	A,B,G
গম	১২.০০	৬৭.৫০	১.৭০	১.২০	১৭.৬০	B,G
ভুট্টা	৮.৪০	৭২.০০	৪.৭০	১.৩০	১৩.৬০	B,G
মুগ দাইল	২৩.৬২	৫৩.৪৫	২.৬৯	৩.৫৭	১৬.৬৭	A,B
মসুর দাইল	২৫.৪৭	৫৫.০৩	৩.০০	৩.৩৩	১৩.১৭	A,B,C
অড়হর দাইল	২১.৬৭	৫৪.২৭	৩.৩৩	৫.৫০	১৫.২৩	A,B
ছোলা দাইল	২১.০০	৬১.৪০	১.৮০	২.৬০	১৩.২০	A,B
আলু	১.২০	১৯.৭০	০.১০	০.৯০	৭৮.১০	A,B,C,G
মুলা	১.৪০	৪.৬০	০.১০	০.৭০	৯৩.২০	A,B,C
ফুলকপি	২.২০	৫.৯০	০.৪০	০.৮০	৯০.৭০	A,B,C
বাঁধাকপি	১.৮০	৬.৯০	০.৪০	১.৩০	৮৯.৬৯	A,B,C
কলা	০.৮০	১৪.২০	০.৪২	৯.৭০	৮৩.৮৮	A,B,C,G
মাখন	২.০০	—	৮৫.০০	১.০০	১২.০০	A,D,E
চিনি	—	৯৭.০০	—	০.১০	২.৯০	—

খাদ্য প্রধানত দুই প্রকার, **প্রাণিজ** ও **উদ্ভিজ্জ**। নিম্নে আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রয়োজনীয় খাদ্যের বিষয় আলোচনা করিব।

প্রাণিজ খাদ্য সাধারণত প্রোটীনপ্রধান; দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, ডিম্ব প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্য।

১। **দুগ্ধ**। আমরা জন্মগ্রহণের পর হইতে দুগ্ধপানে অভ্যস্ত। উপরের তালিকায় দুগ্ধের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা

হইতে দেখা যায় যে দুগ্ধে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্যোপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। শিশুগণের পরিপাক-শক্তি কেবল দুগ্ধ পরিপাকেরই সম্পূর্ণ উপযোগী। দন্তোদ্গমের পূর্বে শিশুগণ কোন কঠিন দ্রব্য আহার করিতে পারে না। প্রোটীন প্রভৃতি সর্ব-উপাদান-সমন্বিত, সহজপাচ্য তরল আহার্যের মধ্যে দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই সকল কারণবশত দুগ্ধকে শিশুদিগের আদর্শ খাদ্য বলা হয়। দুগ্ধে যে প্রোটীন আছে, তাহার নাম ছানা। দুগ্ধস্থ কার্বোহাইড্রেটের নাম দুগ্ধশর্করা, এবং দুগ্ধস্থ স্নেহদ্রব্যের নাম মাখন। ক্যালসিয়ম্ ফস্‌ফেট্, সোডিয়ম্ ও পটাসিয়মের ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম ও লৌহঘটিত লবণ দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উহাতে অগণিত তৈলবিন্দু দেখা যায়, ইহাই দুগ্ধের শুভ্রতার কারণ। দুগ্ধে অম্ল ও ক্ষার উভয়বিধ লবণ থাকে। দুগ্ধ হইতে দধি, ঘোল, ছানা, মাখন, ঘৃত, ক্ষীর, রাবড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত হয়।

২০। **মাংস ও মৎস্য**। মাংসের প্রধান উপাদান প্রোটীন। ইহার অন্তর্গত চর্বি, স্নেহজাতীয় খাদ্য। মাংসে ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি ধাতুঘটিত লবণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

বঙ্গদেশে আমিষ খাদ্যের মধ্যে মৎস্যই সর্বপ্রধান। মৎস্যেও মাংসের ন্যায় কার্বোহাইড্রেট ব্যতীত সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে। মাংস অপেক্ষা মৎস্য শীঘ্র পরিপাক করা যায়, বিশেষত কই, মাগুর প্রভৃতি যে সকল মৎস্যের তৈলাংশ অল্প তাহারা অত্যন্ত লঘুপাক, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্যে তৈলাংশ অধিক থাকায় তাহারা সুস্বাদু হইলেও দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। মাছ ভাজিয়া না খাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে শীঘ্র হজম হয়।

৩। **ডিম্ব**। ডিম্বও প্রোটীনপ্রধান খাদ্য, ইহাতে সমস্ত রকমের উপাদান বিদ্যমান আছে, কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের অংশ অত্যন্ত অল্প। লবণের মধ্যে ডিম্বে ক্যালসিয়ম ও লৌহের ফস্‌ফরাসঘটিত লবণ প্রধান।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **চাউল জাতীয়** খাদ্য। চাউল, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এই শ্রেণির খাদ্য, এই সকল খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট অত্যন্ত অধিক থাকে। চাউলের বাহির অংশে ফস্‌ফেট্ জাতীয় এক প্রকার লবণ ও B শ্রেণির ভাইটামিন বিদ্যমান থাকে বলিয়া সেই অংশ আমাদিগের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউল সুপাচ্য। চাউল হইতে মুড়ি, খৈ, চিঁড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গম হইতে সুজি, আটা, ময়দা; সুজি হইতে রুটি, হালুয়া প্রভৃতি এবং ময়দা হইতে চাপাটি, পাঁউরুটি, বিস্কুট, লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম দেশীয় লোকদিগের ভুট্টা প্রধান খাদ্য। ইহাতে স্নেহ জাতীয় উপাদান থাকায় প্রাণিদিগকে পুষ্ট করিবার জন্য খাওয়ান হইয়া থাকে। যব হইতে বার্লি প্রস্তুত হয়, ইহা পুষ্টিকর ও লঘুপাক খাদ্য বলিয়া রোগিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। **দাইল জাতীয়** খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্যে প্রোটীনের ভাগ অধিক থাকে বলিয়া ইহা নিরামিষাশিগণের মাংসের অভাব পূরণ করে। মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, মটর, খেঁসারি প্রভৃতি নানা প্রকারের দাইল আছে। নিরামিষাশিগণের পক্ষে দাইল অপরিহার্য। দাইল হইতে বড়ি, পাঁপর, বোঁদে, জিলাপী, কচুরি, দালপুরি, খিচুড়ি প্রভৃতি বহু প্রকার প্রোটীনপ্রধান সুখাদ্য প্রস্তুত হয়।

৩। **মূল ও কন্দ জাতীয়** খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্যে কার্বোহাই-

ড্রেটের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। গোলআলু, লালআলু, শাখআলু, মূলা, গাজর, বিট, মানকচু প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে গোলআলুই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়।

৪। **শাকসব্জি জাতীয়** খাদ্য। নটে, পালং, হিংচা, লাউশাক, কুমড়াশাক, পল্‌তা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, ঢেঁড়স, পটল প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প থাকিলেও C শ্রেণির ভাইটামিন অধিক পরিমাণে থাকায়, এই জাতীয় খাদ্য অপরিহার্য। শাকসব্জি হইতে আমরা অধিক পরিমাণে লবণ জাতীয় খাদ্যোপাদান প্রাপ্ত হই। ইহা আমাদিগের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৫। **ফল ও বাদাম জাতীয়** খাদ্য। আম, জাম, পেঁপে, কলা, লেবু, আঙ্গুর, আখরোট, বাদাম প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য। লবণ ও অম্ল-রসাত্মক পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় ইহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলে C শ্রেণির ভাইটামিন থাকে বলিয়া ইহা স্কার্ভি নামক রোগ নিবারণ করিয়া থাকে। আখরোট, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতিতে প্রোটীন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকায় তাহারা অতীব পুষ্টিকর।

মসল্লা। ব্যঞ্জনাদি রুচিকর করিয়া রন্ধন করিতে হইলে আমরা লঙ্কা, হলুদ, মরিচ, তেজপাতা, সরিষা, ধনে, জিরে, এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা, হিং প্রভৃতি নানাপ্রকার মসল্লা ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিও ইহাদের মধ্যে কোনরূপ পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না, তথাপি ইহারা ব্যঞ্জনাদিকে সুদৃশ্য, সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত করে বলিয়া নানা প্রকার পাচকরস নিঃসরণের সহায়তা করে, এবং খাদ্যাদি সহজে পরিপাক হয়। মসল্লার আর একটি গুণ এই যে ইহা পাকস্থলীর ও অন্ত্রের ক্রমসংকোচ বৃদ্ধি করে, সেইজন্য ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পাচকরসের

সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, অধিক মসল্লা খাইলে পাকস্থলীর উত্তেজনা হয় এবং লবণাম্ল নামক পাচকরস অত্যধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া অম্ল রোগের সৃষ্টি করে। সেইজন্য ব্যঞ্জনাদিতে অধিক মসল্লা সংযোগ করা নিষিদ্ধ।

মসল্লারূপে না হইলেও সরিষা আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। সরিষার তৈল সাধারণ বাঙ্গালীখাদ্যের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। বস্তুত ইহাই অনেক সময় খাদ্যের স্নেহদ্রব্য নামক উপাদানের অভাব পূর্ণ করে।

পানীয়। পানীয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ জলই সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রীষ্মের প্রাধান্য হেতু আমাদের দেশে নানা প্রকার পানীয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত পানীয়ের উপাদানই জল। ডাবের জল, নানাবিধ ফলের রস, সরবৎ, সোডা, লিমনেড, চা, কফি, কোকো প্রভৃতিও পানীয়রূপ ব্যবহৃত হয়।

শরীরের বৃদ্ধি, গঠন ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত প্রধানত প্রোটীন্ জাতীয়, শক্তিবর্ধন ও তাপোৎপাদনের নিমিত্ত কার্বোহাইড্রেট্ ও স্নেহ জাতীয়, এবং দেহের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য লবণ জাতীয় খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র এক জাতীয় উপাদান দ্বারা খাদ্যের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা সাধিত হইতে পারে না। দুগ্ধ হইতে আমরা খাদ্যের সর্বপ্রকার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি বটে, কিন্তু উহাতে জলের ভাগ এত অধিক যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যের অভাব একমাত্র দুগ্ধ দ্বারা পূরণ করিতে হইলে, পাকস্থলীর পরিমাণের অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিতে হয়। প্রোটীন্ প্রভৃতি ছয় প্রকার উপাদান-মিশ্রিত খাদ্য আমাদিগের জীবনধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই-জন্যই আমরা নানা জাতীয় খাদ্য মিশ্রিত করিয়া আহার করিয়া থাকি।

খিচুড়িতে চাউল (কার্বোহাইড্রেট্), দাইল (প্রোটীন্), ঘৃত (স্নেহ-দ্রব্য), লবণ ও জল থাকে। মাংসে কার্বোহাইড্রেট্ যৎসামান্য থাকে, সেইজন্য আলু দ্বারা উহার অভাব দূর করা হয় ; দাইল সংযোগে ভাতের প্রোটীনের অভাব দূর করা হইয়া থাকে। মিশ্র খাদ্যের আর একটি উপকারিতা এই যে ইহা রুচিকর হয়। খাদ্য রুচিকর না হইলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, কারণ রুচিকর খাদ্য গ্রহণের ফলেই উপযুক্ত পরিমাণে পাচকরস নিঃসৃত হয়।

খাদ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাদানের কেবল পরিমাণ দেখিলে চলিবে না ; প্রত্যেক উপাদান কি পরিমাণে আমাদিগের শরীরের গ্রাহ্য তাহাও দেখিতে হইবে। মাংসে এবং দাইলে প্রায় সমান পরিমাণে প্রোটীন্ জাতীয় উপাদান বর্তমান আছে। কিন্তু দাইল-স্থিত প্রোটীন্ শতকরা মাত্র ৮৩ ভাগ আমাদের শরীরের উপকারার্থে ব্যবহৃত হয় এবং মাংসান্তর্গত প্রোটীন্ শতকরা ৯৭ ভাগ আমাদিগের শরীরের কার্যে লাগে।

আমাদিগের দেহে প্রতিনিয়ত তাপোৎপাদন ও পেশিসঞ্চালন হইতেছে। বিশ্রামের সময়ও হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রাবলীর পেশি সমূহ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই তাপোৎপাদন ও পেশিসঞ্চালনের নিমিত্ত আমাদিগের দৈহিক শক্তির (Energy) প্রয়োজন। এই শক্তি কোথা হইতে আইসে ? ইঞ্জিনের কয়লা দগ্ধ হইয়া যেমন অগ্নি বা উত্তাপ উৎপন্ন করে, দেহের কতকগুলি উপাদান সেই প্রকার প্রশ্বাস গৃহীত অক্সিজেনদ্বারা দগ্ধ হইয়া দৈহিক উত্তাপ এবং কর্মশক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইঞ্জিন হইতে কয়লার দগ্ধাবশেষ (ছাই) যেমন বাহির করিয়া দেওয়া হয়, সেই প্রকার উক্ত দেহাংশের দগ্ধাবশেষ নিশ্বাসের সহিত কার্বণডাইঅক্সাইড্ রূপে এবং ঘর্ম ও মূত্রস্থ দূষিত পদার্থরূপে

বাহির হইয়া যায়। এই কারণে আমাদিগের শরীর প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। খাদ্যদ্বারা এই ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে। একদিকে যেমন ক্ষয় বা ব্যয় হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ খাদ্য হইতে উহার পূরণ বা আয় হইতেছে। যে প্রণালীতে দেহের উক্ত ক্ষয় হইয়া থাকে তাহার নাম **অবচিতি** (Catabolism), এবং যে প্রণালীতে ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে তাহার নাম **উপচিতি** (Anabolism)। অবচিতি ও উপচিতির সমষ্টিকে **সমুচ্চিতি** (Metabolism) কহে। বাল্যকালে উক্ত ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয়, সেইজন্য এই সময় শরীরের বৃদ্ধি হয়, পূর্ণবয়স্কদিগের আয় ও ব্যয় সমান থাকে। অসুস্থ অবস্থায়, বার্ধক্যে এবং উপবাসকালে আয় ও ব্যয় অধিক হয় বলিয়া শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

দৈহিক শক্তি ও তাপোৎপাদনের অনুপাতে আহারের খাদ্যমূল্য (Food Value) নির্ধারিত হয়। এক ঘনসেণ্টিমিটার (1 c. c.) জলের এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্মা বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক **ক্যালোরি** (Calorie) কহে। আমাদিগের দৈহিকশক্তি ও তাপোৎপাদন এবং ক্ষয় পূরণের জন্য প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হয়। কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে প্রায় দুই হাজার, এবং অধিক পরিশ্রম করিলে অন্তত সাড়ে তিন হাজার ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই উত্তাপের সমস্তই আমরা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সেইজন্য কোন খাদ্যের খাদ্যমূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে, উহা কত ক্যালারি তাপ উৎপন্ন করিতে পারে তাহা স্থির করিতে হয়। সাধারণত প্রতি আউন্স প্রোটীন্ বা কার্বোহাইড্রেট্ হইতে ১১৬ ক্যালোরি এবং প্রতি আউন্স স্নেহদ্রব্য হইতে ২৬৪ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং

আড়াই হাজার ক্যালোরি তাপের জন্য অর্ধপোয়া প্রোটীন্, অর্ধপোয়া স্নেহদ্রব্য এবং একপোয়া কার্বোহাইড্রেট্ মিশ্রিত খাদ্য প্রয়োজন। লোকের বয়স, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, দৈহিক গঠন, পরিশ্রম ও দেশের জলবায়ু অনুসারে উক্ত পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। উপরে যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্ণবয়স্ক সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে প্রযুজ্য।

Questions:—(1) What is the mechanism of circulation of blood in the human body ? (2) Name the organs of respiration and briefly describe the method of oxigination of blood in the system. (3) Trace the path of food in our body and mention the various processes of digestion on its way. (4) Classify nerves according to their functions. (5) Enumerate the functions of the skin. (6) Name the proximate principles of food with their respective functions. (7) Discuss the value of meat and rice as food.

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থবিদ্যা (Physics)

Syllabus: The three states of matter. Physical properties of air and water. Buoyancy and Archemedes' principle. Pressure of atmosphere. Effect of heat on air. Ventilation. Effect of heat on solid bodies. Pendulum clock and Thermometer. Trasference of heat. Simple ideas regarding energy and its transformation with examples. Rectilineal propagation of light. Phenomena of reflection and refraction of light, colour and rainbow. Lodestone, magnetisation, terrestrial magnetism and compass. Simple electric cell. Conductors and insulators. Effects of current: (a) heating and lighting (b) chemical (c) magnetic. Electromagnet and Electric Bell. Telegrphy.

যে সকল বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, তাহা-

দিগের নাম পদার্থ বা ভূত।) যে শাস্ত্রে পদার্থ সমূহের গুণাবলী আলোচিত হয়, তাহার নাম **পদার্থবিদ্যা**। (যে সকল পদার্থ অল্প-বিস্তর স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাদিগের নাম **জড়** (Matter),) এবং (যে সকল পদার্থ অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোন স্থান অধিকার করে না, তাহাদিগের নাম **শক্তি** (Energy)।) জড় সমূহকে আমরা দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু শক্তিকে সাধারণত একটিমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। কখন কখন এক বিশেষপ্রকার জড়ের অস্তিত্ব লওয়া হয়। ইহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না, এই প্রকার জড়ের নাম **ইথার** (Ether)। ইষ্টক, কাষ্ঠ, জল, বায়ু প্রভৃতি পদার্থ কিছু না কিছু স্থান অধিকার করে, অধিকন্তু ইহাদিগকে চক্ষু ও ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায়; এই সকল পদার্থ জড়। তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন স্থান অধিকার করে না এবং উহাদিগকে একাধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, সুতরাং এই সকল পদার্থকে শক্তি বলা হয়।

জড় বস্তুগুলি ইষ্টক, কাষ্ঠের ন্যায় **কঠিন** (Solid), জলের ন্যায় **তরল** (Liquid) এবং বায়ুর ন্যায় **গ্যাসীয়** (Gaseous), এই তিন প্রকার **অবস্থায়** (State) বিদ্যমান থাকিতে পারে। জড়ের যে সকল গুণ উক্ত তিন প্রকার অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাই কেবল পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত, যে সকল গুণ জড়ের উপাদানের উপর নির্ভর করে, তাহা রসায়ন (Chemistry) নামক পৃথক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তু, শক্তি এবং ইথারকে অস্মদ্দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ ও ব্যোম আখ্যা দিয়াছিলেন, এই পাঁচটির নাম পঞ্চভূত, সেইজন্য পদার্থ বিদ্যার আর একটি নাম **ভূতবিদ্যা**।

জড় (Matter)

প্রত্যেক জড়বস্তুর আকার (Shape), ভর (Mass) এবং আয়তন (Volume) আছে। আকার ও আয়তন শব্দের অর্থ তোমরা সহজেই বুঝিতে পার, এক্ষণে ভর কাহাকে বলে তাহা দেখ। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড় থাকে তাহাকে উক্ত বস্তুর ভর বলা হয়। কোন বস্তুর ওজন তাহার অন্তর্গত জড়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা একত্রিত হইয়া জড়ের সৃষ্টি হয়, এই সকল ক্ষুদ্র কণার নাম **অণু** (Molecules)। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অণুগুলি একটি বল প্রভাবে পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া থাকে, এই বলের নাম **সংসক্তি** (Cohesion)। ইষ্টক, কাষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল বস্তুর মধ্যে এই বল অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহাদিগের আকার ও আয়তন সহজে পরিবর্তিত হইতে পারে না, এই সকল বস্তুকে **কঠিন** বলা হয় ; জল, তৈল প্রভৃতির মধ্যে এই বল অনেক অল্প, সেইজন্য তাহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার থাকিতে পারে না, এই সকল বস্তুকে **তরল** বলা হয় ; বায়ুর মধ্যে অণুগুলির উক্ত বল নাই বলিলেই হয়, সেইজন্য ইহাদের নির্দিষ্ট আকার ত নাই-ই, অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর বহুদূরে অবস্থিত থাকিতে পারে বলিয়া, ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আয়তনও নাই। এই সকল বস্তুকে **গ্যাস** (Gas) কহে। কঠিন অবস্থায় জড়ের আকার পার্শ্বীয় অবলম্বন ব্যতীতও রক্ষিত হয়, অর্থাৎ উহাদিগকে যে পাত্রে রাখা যাউক, উহাদের নিজস্ব আকার পরিবর্তিত হয় না। তরল অবস্থায় জড়ের নিজস্ব কোন আকার থাকে না, তরল বস্তুকে যে পাত্রে রাখা হয়, উহা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, কিন্তু উহাদিগের আয়তন সর্বদা সমান থাকে ; গ্যাসীয় অবস্থায় জড়ের নিজস্ব কোন

আকার বা আয়তন থাকে না। উক্ত তিন অবস্থায় জড়ের ভর কিন্তু সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে। কঠিন ও তরল অবস্থার মধ্যবর্তী এক প্রকার অবস্থা আছে তাহার নাম **সান্দ্র** (Viscous) অবস্থা ; ঘৃত, মাখন প্রভৃতি সান্দ্র অবস্থার বস্তু।

জড়ের সাধারণ ধর্ম

জড়মাত্রের কতকগুলি ধর্ম আছে, উহারা সেই সকল ধর্মের অধীনে থাকিতে বাধ্য হয়। ব্যাপ্তি, অভেদ্যতা, জাড্য, মহাকর্ষ, বিভাজ্যত্ব, ছিদ্রত্ব, সংনামিতা এবং স্থিতিস্থাপকতা জড়ের সাধারণ ধর্ম। উক্ত ধর্মগুলি কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় যে কোন অবস্থার বস্তুতে অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক জড় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া থাকে, এই ধর্মের নাম **ব্যাপ্তি** (Extension) ; এই ধর্মের জন্য দুইটি বস্তু এক সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না, ইহার নাম **অভেদ্যতা** (Impenetrability)। বাহির হইতে প্রযুক্ত কোন বল ব্যতীত জড়বস্তুসমূহ স্থানচ্যুত হয় না, এবং কোন জড়বস্তু উক্তরূপে স্থানচ্যুত হইলে, যতক্ষণ না বাহির হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ চলিতে থাকে, জড়ের এই ধর্মের নাম **জাড্য** (Inertia)। দুইটি জড়বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহার নাম **মহাকর্ষ** (Gravitation)। পৃথিবীর মহাকর্ষকে **অভিকর্ষ** (Gravity) আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক জড়বস্তুকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা সম্ভব, জড়ের এই ধর্মের নাম **বিভাজ্যত্ব** (Divisibility)। প্রত্যেক জড়বস্তুর মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কতকগুলি বস্তুর ছিদ্র নগ্নচক্ষে বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় এবং কোন কোন জড়বস্তুর ছিদ্রগুলি দেখা যায় না, জড়ের এইধর্মের নাম **ছিদ্রত্ব** (Porosity)। কোন জড়বস্তুর উপর চাপ পড়িলে

উহার আয়তন অল্প-বিস্তর কমিয়া যায়, ইহার নাম **সংনামিতা** (Compressibility)। এই অবস্থায় উহারা বাহিরের চাপের প্রভাব মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, এবং চাপের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে পূর্বের আকার এবং আয়তন পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই ধর্মের নাম **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity)

জল ও বায়ুর ধর্ম

ব্যাপ্তি প্রভৃতি জড়ের যে সকল সাধারণ ধর্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটি জলে এবং বায়ুতেও বিদ্যমান আছে। তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ যে জল ও বায়ুর কোন নিজস্ব আকার নাই, উহারা যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে; কিন্তু যে কোন পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের আয়তন সমান থাকে। বায়ুর আয়তন আধারের আয়তন অনুসারে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ আধার যদি বড় হয় তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর আয়তন অধিক হইবে এবং আধার ক্ষুদ্র হইলে সেই পরিমাণ বায়ুর আয়তন অল্প হইবে; বায়ু সকল সময় আধারকে পূর্ণ করিয়া রাখে। জল ও বায়ুর অণুগুলি পরস্পর দৃঢ় সংবদ্ধ নহে বলিয়া উহারা পার্শ্বীয় অবলম্বন ব্যতীত নিজেদের আকার রক্ষা করিতে পারে না। আধারের যে দিকে অবলম্বন না থাকে বায়ু সেই দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পার্শ্বীয় অবলম্বন-হীন কোন স্থানে জল ঢালিলে উহা কেবল নিম্নাভিমুখে গমন করে। জলের সংনামিতা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু বায়ুর সংনামিতা অত্যন্ত অধিক। জল ও বায়ুর আর একটি ধর্ম এই যে উহারা আধারের সর্বদিকে চাপ দিতে থাকে, এই চাপের কথা তোমাদিগকে পরে বলা হইবে।

একখণ্ড পাৎলা রবারকে চারিদিক্ হইতে টানিয়া ধরিলে উহার

পৃষ্ঠ যেমন টানে থাকে, জলের পৃষ্ঠ সর্বদা সেইরূপ টানের উপর থাকে, ইহাকে জলের **পৃষ্ঠটান** (Surface Tension) কহে, জলের এই ধর্ম আছে বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র লৌহ-সূচীকে ধীরে ধীরে জলের উপর ছাড়িয়া দিলে উহা ভাসিতে থাকে। প্রত্যেক জড়ের অণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জলের মধ্যভাগে যে সকল অণু আছে তাহারা সর্বদিক্ হইতে আকৃষ্ট হয়, কারণ তাহাদের সর্বদিকেই অপরাপর অণু বিদ্যমান, কিন্তু জলের পৃষ্ঠদেশে যে সকল অণু আছে তাহাদিগের উর্ধ্বে আর কোন অণু নাই বলিয়া উহারা কেবল পার্শ্বে এবং নিম্নদিকে আকৃষ্ট হয়, এই কারণে জলের পৃষ্ঠটান হইয়া থাকে।

এক পাত্র জলে একটি দুই মুখ খোলা সরু কাচের নল উর্ধ্বাধভাবে অধ নিমজ্জিত করিলে দেখিবে যে, পাত্রে ও নলের মধ্যে জলের উচ্চতা সমান নহে। পাত্রস্থ জলের পৃষ্ঠ অপেক্ষা নলের মধ্যে জল কিছু অধিক উচ্চে উঠিয়াছে, অধিকন্তু নলের মধ্যে জলপৃষ্ঠ সমতল না হইয়া অবতল (Concave) হইয়াছে। নলটি যত সরু হইবে, উহার ভিতর জলের উচ্চতাও তত অধিক হইবে। জলের এই ধর্মের নাম **কৈশিকত্ব** (Capillarity)।

জলের আর একটি ধর্ম এই যে উহার পৃষ্ঠদেশ সর্বদা **অনুভূমিক,** অর্থাৎ ক্ষিতিজের সহিত সমান্তরাল থাকে। একটি পাত্রে অথবা পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন পাত্রে জলের পৃষ্ঠ এক অনুভূমিকতলে বা লেভলে (Level) থাকে। বিভিন্ন পাত্রের তলদেশ পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে, উহাদিগের যে কোন একটিতে যদি জল ঢালা হয়, তাহা হইলে দেখিবে যে উহা সমস্ত পাত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং সমস্ত পাত্রস্থিত জলের পৃষ্ঠ এক অনুভূমিক তলে অবস্থিত হইয়াছে। কোন পাত্রে জল ও তৈল একত্রিত রাখিলে দেখিতে পাইবে যে উহাদের সংযোগস্থলও অনুভূমিক

সমতল। জলকে নড়াইলে উহার পৃষ্ঠদেশ সাময়িক অসমতল হয় বটে, কিন্তু পুনরায় উহা সমতল হইবার চেষ্টা করে। অল্প জলের পৃষ্ঠদেশ
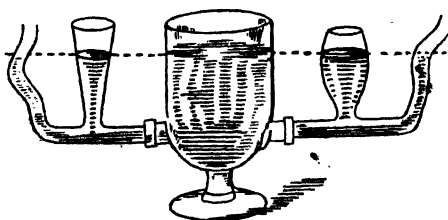
৪৩নং চিত্র

সমতল দেখাইলেও স্থিরসমুদ্রের পৃষ্ঠ ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় গোলাকার, এই গোলক বিরাট্ বলিয়া অল্প জলের পৃষ্ঠকে সমতল ধরা হয়।

তরল বস্তুর প্রেষ। পদার্থ বিদ্যার যে অংশে তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর চাপের বিষয় আলোচিত হয়, তাহার নাম **ঔদস্থিতি বিদ্যা** (Hydrostatics)।

কোন পাত্রে জল থাকিলে উহা পাত্রের যে সকল অংশ স্পর্শ করিয়া আছে, তদুপরি চাপ দিতে থাকে। এই চাপ পাত্রের গাত্রে সর্বত্র লম্বভাবে পড়ে। এক গ্লাস জলকে যদি আমরা মনে করি যে উহা জলের কতকগুলি উপর্যুপরিভাবে সাজান ফলকের সমষ্টি, তাহা হইলে জলের পৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাইব, সেই স্থানের উপর ফলকের সংখ্যা এবং তজ্জনিত চাপ তত অধিক হইবে, অর্থাৎ জলের মধ্যস্থিত যে কোন স্থানের উপর যে চাপ পড়ে তাহা সেই স্থানের উপর যতখানি জল আছে তাহার ওজনের সমান। জলের ওজন উহার আয়তনের উপর নির্ভর করে, এবং আয়তন = ক্ষেত্রফল × উচ্চতা। অতএব জলের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থানের উপর যে চাপ পড়ে তাহা সেই স্থানের ক্ষেত্রফল এবং

সেই স্থানের উপর জলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। তরল বস্তুর আর একটি গুণ এই যে উহাদের অভ্যন্তরস্থ যে কোন স্থানে কেবল যে নিম্নদিকে চাপ পড়ে তাহা নহে, উহা সর্বদিকে সম পরিমাণে পড়িয়া থাকে। এই চাপ পার্শ্বদিকে পড়িলে উহাকে **পার্শ্বীয় চাপ** (Lateral Pressure), এবং ঊর্ধ্ব দিকে পড়িলে **ঊর্ধ্ব চাপ** (Upward Pressure) বলা হয়।
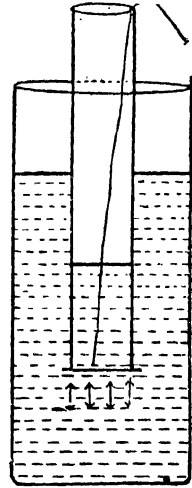
৪৪নং চিত্র

দুই প্রান্ত খোলা একটি মোটা নল ও একখানি চাকৃতি সংগ্রহ কর, চাকৃতিখানি এরূপ হইবে যেন নলের উপর চাপা দিলে কোন দিকে ফাঁক না থাকে। চাকৃতির উপর নলের এক প্রান্ত স্থাপন করিয়া একটি সুতার সাহায্যে চাকৃতিখানিকে নলের তলদেশ আটকাইয়া রাখ; সেই অবস্থায় উহাকে ঊর্ধ্বাধভাবে একপাত্র জলে অর্ধ-নিমজ্জিত করিলে দেখিবে যে, সুতাটি ছাড়িয়া দিলেও চাকৃতিখানি নলের প্রান্তে ঠিক লাগিয়া আছে, পড়িয়া যায় নাই; ইহার কারণ জল চাকৃতিখানিকে ঊর্ধ্ব দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। এইবার নলের খোলা প্রান্ত দিয়া উহার মধ্যে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে থাক। নলের অভ্যন্তরস্থ জলের পৃষ্ঠ যতক্ষণ পাত্রের জলপৃষ্ঠের নিম্নে থাকিবে, ততক্ষণ চাকৃতিখানি লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু উভয় পৃষ্ঠ এক সমতলস্থ হইলেই উহা পড়িয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জলের ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ উহার নিম্নচাপের পরিমাণের সমান।

প্লবতা। জলে নিমজ্জিত কোন বস্তু ঊর্ধ্ব দিকে যে ঠেলা প্রাপ্ত

হয়, তাহাকে প্লবতা (Buoyancy) কহে। জলের বাহিরে কোন বস্তু যত ভারি বোধ হয়, জলের ভিতরে তাহাকে তত ভারি বোধ হয় না। কোন ভারি বস্তুকে জলের মধ্যে উত্তোলন করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বলের প্রয়োজন হয়, কারণ জলের প্লবতা উক্ত উত্তোলনে সাহায্য করিয়া থাকে।

খৃঃ পূঃ ২৮৭ অব্দে ইটালীদেশে এক মনীষী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম আরকিমিডিস্। ইনি ছিলেন গ্রীসদেশের রাজার বন্ধু। রাজা একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার মুকুট বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত কি না। আরকিমিডিস চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি চৌবাচ্ছায় নামিয়া স্নান করিবার সময় দেখিলেন যে চৌবাচ্ছা হইতে কতক পরিমাণ জল বাহিরে পড়িয়া গেল, এবং তিনি নিজেকে লঘু অনুভব করিতেছেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সামান্য ব্যাপার হইতে কত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন! অর্ধস্নাত অবস্থায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'ইউরেকা' (Eureka) অর্থাৎ 'পাইয়াছি'। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কোন বস্তুকে জলে (কোন তরল বস্তুতে) নিমজ্জিত করিলে উক্ত বস্তুর ওজন প্লবতার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়, এবং সেই বস্তুর সমআয়তন জল (তরলবস্তু) স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। নিমজ্জিত বস্তুর যে পরিমাণ ওজন হ্রাস হইয়াছে, স্থানচ্যুত জলের (তরল বস্তুর) ওজন তাহার সমান, ইহার নাম **আরকিমিডিসের বিধি** (Archimedes' principle)। বস্তুর অভেদ্যতা ধর্মের জন্য জলে নিমজ্জিত হইলে উহা অবশ্যই সমআয়তন জল স্থানচ্যুত করিবে, এবং তরল বস্তুর প্লবতার জন্য নিমজ্জিত বস্তুর ওজন হ্রাস হইবে। এক ঘনফুট স্বর্ণ জলে নিমজ্জিত করিলে এক ঘন ফুট জল স্থানচ্যুত হইবে। এক ঘন ফুট জলের ওজন ৬২·৫ পাউণ্ড,

সুতরাং জলের বাহিরে এক ঘটফুট স্বর্ণের যত ওজন ছিল, জলে নিমজ্জিত অবস্থায় তদপেক্ষা ৬২.৫ পাউণ্ড কম হইবে।

(কোন বস্তুর ওজন উহার সমআয়তন জলের ওজনের যতগুণ অধিক, তাহাকে সেই বস্তুর **আপেক্ষিক গুরুত্ব** (Specific Gravity) বলা হয়।) বিভিন্ন বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন হইলেও নির্দিষ্ট বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দিষ্ট থাকে। আরকিমিডিসের বিধির সুযোগ লইয়া বস্তু সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। বায়ুতে কোন বস্তুর ওজন যত হইবে তাহাকে উক্ত বস্তুর জলে নিমজ্জিত অবস্থায় যত ওজন হ্রাস হয় তদ্দ্বারা ভাগ করিলে সেই বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা যায়, কারণ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় উহার ওজন যত হ্রাস হইবে আরকিমিডিসের বিধি অনুসারে তাহা সমআয়তন জলের সমান।

বায়ুমণ্ডলের প্রেষ। সমগ্র পৃথিবীটি বায়ুর সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ভূপৃষ্ঠকে সর্বদিকে বেষ্টন করিয়া যে বিশাল বায়ুর আবরণ আছে, তাহার নাম **বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere)। পৃথিবীতে জলের আয়তন স্থলের আয়তনের তিন গুণ, কিন্তু বায়ুর আয়তন যে কতগুণ তাহার স্থিরতা নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা প্রায় ৩৫ মাইল।

বায়ুমণ্ডলকেও জলের ন্যায় কতকগুলি কাল্পনিক ফলকে বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে ভাগ করিয়া লইতে পার। সমস্ত বস্তুর ন্যায় বায়ুরও ওজন আছে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠকে বায়ুমণ্ডলের ফলকগুলির ভার বহন করিতে হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ, উচ্চ পর্বতশিখরে উহার চাপ অপেক্ষা অধিক, কারণ পর্বতশিখরের উপর বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অল্প। জলের ন্যায় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে কোন স্থানে উহার চাপ ঊর্ধ্ব, অধ, পার্শ্ব, সর্বদিকে সমানভাবে পতিত হয়, এবং প্রত্যেক স্থানে বায়ুমণ্ডলের

ঊর্ধ্বচাপ ও পার্শ্বীয় চাপ উহার নিম্নচাপের সমান। সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর এই চাপের পরিমাণ প্রায় ১৫ পাউণ্ড। সাধারণ পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যশরীরের ক্ষেত্রফল প্রায় ২৩০০ বর্গ ইঞ্চি, সুতরাং কলিকাতার ন্যায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনতিউচ্চ স্থানে প্রত্যেক পূর্ণায়তন মনুষ্যদেহের উপর প্রায় ৪২০ মণ বায়ুমণ্ডলের চাপ পতিত হয়! শরীরের অভ্যন্তরে যে বায়ু আছে, তাহা বায়ুমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত থাকায় দেহের ভিতরে ও বাহিরের চাপ সমান থাকে, সেইজন্য আমরা বায়ুমণ্ডলের ভীষণ চাপ অনুভব করিতে পারি না, নতুবা প্রায় ৪০০ মণ চাপে আমাদের শরীর পিষিয়া যাইত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রুশিয়ার অন্তর্গত ম্যাগডেবার্গ সহরে গোয়েরিক সাহেব বায়ুমণ্ডলের চাপ যে কত অধিক তাহার দৃষ্টান্ত
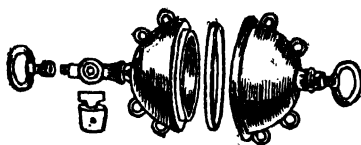
৪৫নং চিত্র

দেন। দুই ফিট ব্যাস বিশিষ্ট সম আয়তনের দুইটি তাম্র নির্মিত ফাঁপা অর্ধগোলক দ্বারা তিনি সাধারণকে ইহা দেখাইয়াছিলেন। একটি অর্ধগোলকের সহিত ষ্টপকক সমেত একটি নল লাগান ছিল। অর্ধ-গোলক দুইটির প্রান্তে একখানি চর্মবলয় ও চর্বি লাগাইয়া উহাদিগকে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর পাম্পের সাহায্যে নলের ভিতর দিয়া গোলকের মধ্য হইতে বায়ু টানিয়া বাহির করিয়া ষ্টপকক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অর্ধগোলক দুইটি এরূপভাবে নির্মিত যে উহাদের

মিলনস্থল বা অন্য কোন স্থান দিয়া গোলকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। গোলকের দুইদিকে কয়েকটি করিয়া বলয় লাগান ছিল। প্রত্যেক গোলকার্ধের সহিত ছয়টি করিয়া অশ্ব সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; বারটি অশ্ব একযোগে বিপরীত দিকে টানিয়া যুক্ত গোলকার্ধ-দ্বয়কে পৃথক করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। অতঃপর তিনি অশ্বগুলিকে খুলিয়া দিলেন, এবং ষ্টপকক ঘুরাইয়া গোলকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে দিলেন। এক্ষণে গোলকার্ধদ্বয়কে অল্প জোরে টানিয়া তিনি পৃথক করিয়া ফেলিলেন। গোলকের অভ্যন্তর যখন বায়ুপূর্ণ ছিল, তখন উহার ভিতরে ও বাহিরে বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান ছিল, সেই জন্য উহাদিগকে পৃথক করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু গোলকটি যখন বায়ুশূন্য, তখন কেবল গোলকের বাহিরে বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়িতেছে। এই চাপ এত অধিক যে তাহার নিকট বারটি অশ্বের সামর্থ্য বিফল। আর একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমরা বায়ুমণ্ডলের চাপ অনুভব করিতে পারিবে। একটি সাধারণ চাবির খোলা দিক্ মুখের মধ্যে রাখিয়া, উহার মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব বায়ু শোষণ করিয়া লও, এবং পুনরায় বায়ু প্রবেশের পূর্বে চাবির মুখে জিহ্বার অগ্রভাব লাগাইয়া দিলে দেখিবে যে চাবিটি জিহ্বার সহিত অতি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বারোমিটার (Barometer) নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। একটি তিন ফিট লম্বা, একমুখ বদ্ধ কাচের নল পারদে পূর্ণ করিয়া, উহার খোলা মুখ এমন ভাবে এক বাটি পারদের মধ্যে ডুবাইয়া দাও যেন নলের মধ্যে বিন্দুমাত্র বায়ু প্রবেশ না করে। নলটি ঠিক ঊর্ধ্বাধভাবে ধরিলে দেখিবে যে নলের অধিকাংশ পারদে পূর্ণ আছে এবং উপরের কিয়দংশ শূন্য। বাটির পারদ-পৃষ্ঠে প্রত্যেক সমবর্গপরিমাণ স্থানের উপর চাপ সমান। উহার

প্রত্যেক স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়িতেছে, কেবল যে অংশ নলে বেষ্টিত তাহার উপর নলমধ্যস্থ পারদের চাপ পড়িতেছে। সম বর্গপরিমাণ স্থানে বাটির পারদের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ নলমধ্যস্থিত পারদের চাপের সমান। বাটির পারদপৃষ্ঠ হইতে নলের পারদপৃষ্ঠের উচ্চতা অনুসারে বায়ু-মণ্ডলের চাপ জ্ঞাপন করা হয়, যেমন কলিকাতায় অমুক সময় বায়ুমণ্ডলের চাপ ৩০ ইঞ্চি, অর্থাৎ বারোমিটারে বাটির পারদপৃষ্ঠ হইতে নলের পারদপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। স্থূল হিসাবে প্রতি ৯০০ ফিট উচ্চে উঠিলে বারোমিটারে নলের পারদের উচ্চতা ১ ইঞ্চি করিয়া কম হয়; শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলের চাপ অল্প হইয়া থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ৫ মাইল, তথায় বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় ৮ ইঞ্চি মাত্র।

শক্তি

কোন বস্তুর কার্য করিবার সামর্থ্যকে তাহার শক্তি (Energy) বলা হয়। শক্তি দুই শ্রেণির হইতে পারে; গতিশীল অবস্থায় বস্তুগণের কার্য করিবার যে সামর্থ্য লাভ হয়, তাহার নাম **চলশক্তি** (Kinetic Energy), যথা—প্রবহমাণ অবস্থায় বায়ু নৌকা পরিচালিত করিতে পারে। একখানি পুস্তক উচ্চে তুলিয়া ধরিলে, উচ্চ স্থানে অবস্থিতি হেতু উহার পতিত হইবার সামর্থ্য লাভ হইয়াছে, অবস্থিতিহেতু বস্তুগণ এইরূপ যে কার্য করিবার ক্ষমতা লাভ করে, তাহার নাম **স্থৈতিক** (Potential) শক্তি। কোন বস্তুর মধ্যে এই দুই শ্রেণির শক্তি নিম্নলিখিত সাত প্রকার রূপে থাকিতে পারে। (১) **যান্ত্রিক** (Mechanical) শক্তি, (২) **তাপ** (Heat), (৩) **শব্দ** (Sound), (৪) **আলোক** (Light),

(৫) **তড়িৎ** (Electricity), (৬) **চুম্বকত্ব** (Magnetism), এবং (৭) **রাসায়নিক** (Chemical) শক্তি।)

সমগ্র বিশ্বে শক্তি নিয়ত একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, ইহার নাম শক্তির রূপান্তর (Transformation)। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনা শক্তির রূপান্তর হেতু ঘটিয়া থাকে; শক্তির রূপান্তর যে কত প্রকারে হয় তাহার স্থিরতা নাই। একখানি পুস্তক উত্তোলন করার সময় চলশক্তি স্থৈতিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এবং পতিত হইবার সময় উক্ত স্থৈতিকশক্তি পুনরায় চলশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির মূল সূর্য। তোমার ঘরে যে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে তাহারও মূল সূর্য। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের তাপ ও আলোকরূপা শক্তি উদ্‌ভিদ্‌গণ নিজদেহে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল উদ্‌ভিদ্‌ ভূগর্ভে চাপা পড়িয়া কয়লায় পরিণত হওয়ায় আলোক ও তাপ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে; কয়লা যখন দগ্ধ হয়, তখন উক্ত রাসায়নিকশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়; তাপ যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্র পরিচালিত করে; ইহার ফলে যান্ত্রিকশক্তি তড়িতে রূপান্তরিত হয়; তড়িৎ বাল্‌বের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম তারগুলি কর্তৃক উত্তপ্ত হয়, অর্থাৎ তড়িৎ তাপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে; সর্বশেষে এই তাপ আলোকে রূপান্তরিত হইয়া তোমাদিগের পুস্তক পাঠে সহায়তা করে। বৈদ্যুতিক যন্ত্র চলিবার সময় কিছু শক্তি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে, ডাইনামো চলিবার সময় বিদ্যুৎ, চৌম্বিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং শক্তির আরও যে কত রূপান্তর ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে, তাহা এই অল্পস্থানে বর্ণনা করা যায় না। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিলে শক্তি কত প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

শক্তি রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু বিশ্বে যে পরিমাণ শক্তি আছে তাহার কখন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। সূর্য হইতে তাপ ও আলোক পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় সূর্যের কিয়ৎ পরিমাণে শক্তি হ্রাস হইল বটে, কিন্তু সেই পরিমাণ শক্তি বিশ্বের অন্তর্গত পৃথিবীতে থাকিয়া গেল। দগ্ধ হইলে কয়লার রাসায়নিক শক্তি থাকে না বটে, কিন্তু তাহা তাপরূপে পৃথিবীতেই থাকিয়া যায়; অতএব দেখা যাইতেছে যে শক্তি কখনও নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র; ইহার নাম **শক্তির নিত্যতা** (Conservation)।

তাপ

তাপ একরূপ শক্তি। নানাপ্রকার শক্তি তাপে রূপান্তরিত হইতে পারে; দুইটি বস্তু ঘর্ষণ করিলে চলশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি শক্তিও যে তাপে রূপান্তরিত হইতে পারে তাহা তোমরা পূর্বেই দেখিয়াছ। তাপের অনুভূতির নাম উষ্ণতা, উষ্ণতার পরিমাপককে **উষ্মা** (Temperature) বলা হয়। থার্মমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর উষ্মা নির্ণয় করা যায়।

জলের উপর তাপের কার্য। তাপের প্রভাবে জলের নানা প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে। এক কটাহ জল উত্তপ্ত করিলে দেখিবে যে উহার উষ্মা ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে, এই বৃদ্ধির কিন্তু একটি সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে, যতই তাপ দিতে থাক, জলের উষ্মা আর বর্ধিত হইবে না, জল তখন ফুটিতে থাকিবে, এই সীমাকে জলের **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling Point) কহে। এক পাত্র জল বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে দেখিবে যে উহার উষ্মা ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। এই হ্রাসেরও একটি সীমা আছে, তাহার

নাম **হিমাঙ্ক** (Freezing Point)। স্ফুটনাঙ্কে উপস্থিত হইলে জল গ্যাসীয় অবস্থায় অর্থাৎ স্টীমে, এবং হিমাঙ্কে উপস্থিত হইলে কঠিন অবস্থায় অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক যথাক্রমে ১০০° ও ০° সেন্টিগ্রেড।* (সেন্টিগ্রেড কাহাকে বলে তাহা তোমরা থার্মমিটারের প্রসঙ্গে জানিতে পারিবে)। তাপের প্রভাবে জলের পৃষ্ঠদেশ সর্বদা বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে, ইহার নাম **বাষ্পীভবন** (Evaporation)। স্ফুটনাঙ্কে পৌছিলে জলের কেবল পৃষ্ঠদেশ নহে, উহার সর্বাঙ্গ বাষ্পে পরিণত হইতে আরম্ভ করে, ইহার নাম **স্ফুটন** (Ebullition)। বাষ্পীভবনের সময় জলের উষ্মা কমিয়া যায়, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে গৃহের দরজা জানালায় খস্‌খসের পর্দা ঝুলাইয়া তাহাতে জল দেওয়া হয়। পর্দার গাত্র হইতে জল যত বাষ্পীভূত হইতে থাকে, তত শীতল হইতে থাকে, এবং গৃহমধ্যস্থ বায়ু শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া শীতল হয়। সূর্যকিরণে সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল বাষ্পীভূত হইয়া মেঘ, শিশির, কুয়াসা প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

লম্বা সরু গলাবিশিষ্ট একটি কাচের পাত্রকে গলার অর্ধেক পর্যন্ত জলে পূর্ণ কর, পাত্রে কিছুক্ষণ তাপ সংযোগ করিবার পর দেখিবে যে তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের পৃষ্ঠ ক্রমশ উচ্চে উঠিতেছে, অর্থাৎ জলের আয়তন বর্ধিত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছ যে তাপের প্রভাবে জলের **প্রসারণ** (Expansion) হয়। জলের উষ্মা যত কমিতে থাকে উহা তত সংকুচিত হইতে থাকে, কিন্তু ৪° সেন্টি উষ্মার নিম্নে জল আর সংকুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং জল যখন বরফে পরিণত হয় তখন উহার আয়তন বর্ধিত হইয়া থাকে।

বায়ুর উপর তাপের কার্য।* অতিরিক্ত চাপের অধীনে

বায়ুকে শীতল করিয়া তরল অবস্থায় পরিণত করা যায়। তাপের প্রভাবে বায়ুর উষ্মা এবং আয়তন বর্ধিত হয়, কিন্তু জলের প্রসারণ অপেক্ষা বায়ুর প্রসারণ অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। প্রসারিত হইলে প্রত্যেক বস্তুর ঘনত্ব কমিয়া যায়, অর্থাৎ উহা লঘু হয়, সুতরাং উত্তপ্ত বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু।

বায়ুচলন (Ventilation)। আমাদিগের নিশ্বাসে গৃহের নিম্নদেশের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয় সুতরাং উহা গৃহের উপরদিকে গমন করে। গৃহের ঊর্ধ্বদিকে গবাক্ষ থাকিলে উষ্ণ বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং বাহিরের শীতলতর বিশুদ্ধ বায়ু নিম্নদেশের জানালাদি দিয়া প্রবেশ করে, ইহার নাম **বায়ুচলন**। সুতরাং বায়ুচলনের জন্য গৃহের ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাগে বায়ুর বহির্গমন ও প্রবেশের পথ থাকা আবশ্যক।

কঠিন বস্তুর উপর তাপের কার্য। তাপের প্রভাবে কঠিন বস্তুরও প্রথমে উষ্মা বর্ধিত হয়, পরে ক্রমশ উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং আয়তন প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে **দৈর্ঘ্যপ্রসারণ** (Linear Expansion), **পৃষ্ঠপ্রসারণ** (Superficial Expansion) এবং **ঘনপ্রসারণ** (Cubical Expansion)। সমান তাপে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন পরিমাণে প্রসারিত হয়। ১° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্মাধিক্যবশত কাচের দৈর্ঘ্যের ০'০০০০০৮৩ অংশ প্রসারিত হয়, কিন্তু পিত্তলের ০'০০০০০১৯ অংশ প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে উক্ত বস্তুগুলির **প্রসারণাঙ্ক** (Coefficient of Expansion) কহে। প্রসারণের পর আরও অধিক তাপ সংযোগ করিলে অধিকাংশ কঠিনবস্তু যথাক্রমে তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কর্পূর প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু তরল না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। তাপের প্রভাবে কঠিন বস্তুর তরল অবস্থা প্রাপ্তির নাম **গলন**

(Melting)। যে উষ্মায় কোন কঠিন বস্তু তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সেই বস্তুর **গলনাঙ্ক** (Melting Point) কহে। বিভিন্ন কঠিন বস্তুর গলনাঙ্ক বিভিন্ন। তাপ প্রভাবে কাষ্ঠ, শর্করা প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া থাকে, এবং কোন কোন কঠিন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্মের পরিবর্তন হইতে পারে, যেমন উত্তপ্ত কাচ শীতল কাচ অপেক্ষা দুর্বল হয়। বিভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করা হইলে উহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

তাপ প্রেরণ (Transference of Heat)। কোন বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশ, অথবা পরস্পর সংস্পৃষ্ট উষ্ণতর বস্তু হইতে শীতলতর বস্তুতে, উক্ত বস্তু বা বস্তুদ্বয়ের কণার সাহায্যে তাপ প্রেরিত হইতে পারে। জলের ন্যায় কোন কোন বস্তুতে তাপ প্রেরিত হইবার সময় উক্ত কণাগুলি স্থানচ্যুত হয়, এই উপায়ে তাপ প্রেরিত হওয়ার নাম তাপ**পরিচলন** (Convection); কিন্তু লৌহাদি কঠিনবস্তুতে উক্ত প্রকার তাপ বিস্তৃতির সময় কণাগুলি স্থানচ্যুত হয় না, এই উপায়ে তাপ বিস্তৃতির নাম তাপ**পরিবহন** (Conduction)। বিভিন্ন উষ্মার দুইটি বস্তু যখন পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকে না অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোন তৃতীয় বস্তু থাকে, তাহা হইলে উক্ত তৃতীয় বস্তুকে উত্তপ্ত না করিয়া উষ্ণ বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে তাপ প্রেরিত হইতে পারে, ইহার নাম তাপ**বিকিরণ** (Radiation)। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে ইথার ও বায়ু আছে, সূর্য হইতে পৃথিবীতে যখন তাপ প্রেরিত হয়, তখন ইথার বা বায়ু উত্তপ্ত হয় না, সুতরাং সূর্য হইতে পৃথিবীতে তাপ পরিচালিত বা পরিবাহিত না হইয়া বিকীর্ণ হয়। পূর্বোক্ত তৃতীয় বস্তুটির নাম **মাধ্যম** (Medium)। তাপ যত দ্রুত বিকীর্ণ হইতে পারে তত দ্রুত পরিচালিত বা পরিবাহিত হইতে পারে না।

এক হস্তে একটি কাচের এবং অপর হস্তে একটি লৌহের সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দণ্ডের এক প্রান্ত ধারণ করিয়া ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া ধর। যে হস্তে লৌহদণ্ড আছে সেই হস্তে যত শীঘ্র তাপ অনুভব করিবে, অপর হস্তে তত শীঘ্র অনুভব করিবে না। কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে উক্তরূপ পরীক্ষা করিলে কখনই তাপ অনুভব করিবে না। ইহার কারণ লৌহকণাগুলির তাপপরিবহন ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, কাচের কণার তাপপরিবহন ক্ষমতা অল্প এবং কাষ্ঠের কণাগুলির তাপপরিবহন করিবার ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। লৌহের ন্যায় বস্তুদিগকে তাপের **সুপরিবাহী** (Good Conductor), কাচের ন্যায় বস্তুদিগকে **কুপরিবাহী** (Bad Conductor) এবং কাষ্ঠের ন্যায় বস্তুদিগকে **অপরিবাহী** (Non Conductor) আখ্যা দেওয়া হয়।

ঘড়ির দোলক (Pendulum of clock)। বড় ঘড়িতে সাধারণত ধাতু নির্মিত দোলক থাকে। এই দোলকের দৈর্ঘ্য অধিক হইলে ঘড়ি মন্থরগতিতে, এবং অল্প হইলে দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে। উহার দৈর্ঘ্য গ্রীষ্মকালে তাপাধিক্য বশত প্রসারিত এবং শীতকালে শৈত্যহেতু সংকুচিত হইয়া থাকে; সুতরাং গ্রীষ্মকালে ঘড়ি মন্দগতি (Slow) ও শীতকালে দ্রুতগতি (Fast) হইয়া যায়, ইহার নিমিত্ত কোন কোন ঘড়িতে **প্রতি-বিহিত** (Compensated) **দোলক** ব্যবহৃত হয়। ৪৬নং চিত্রে দেখিতেছ যে প্রতিবিহিত দোলকে একাধিক ঊর্ধ্বাধ দণ্ড আছে, দণ্ডগুলি লৌহ ও পিত্তল নির্মিত এবং উহারা যথাক্রমে পরপর সাজান আছে।
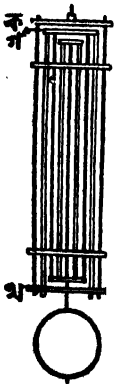
ক
গ
খ

৪৬নং চিত্র

দণ্ডগুলি উপরে এবং নিম্নে কিরূপে অনুভূমিক দণ্ডের সহিত যুক্ত আছে

দেখ। লৌহদণ্ডের ক বিন্দু এবং পিত্তল দণ্ডের খ বিন্দু অচল বলিয়া উহারা যথাক্রমে নিম্ন ও উর্ধ্ব দিকে প্রসারিত হয়। দণ্ড দুইটির দৈর্ঘ্য এরূপভাবে নিয়মিত আছে যে সমান উত্তাপে লৌহদণ্ডের এবং পিত্তল-দণ্ডের মোট দৈর্ঘ্য প্রসারণ সমান হয়, সুতরাং উত্তাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দণ্ডদ্বয়ের উর্ধ্ব বিন্দুদ্বয়ের ('ক' হইতে 'গ' এর) দূরত্ব কখন পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং সমগ্র দোলক-দণ্ডটির দৈর্ঘ্য সকল সময় সমান থাকে।

থার্মমিটার (Thermometer)। তাপের প্রভাবে তরল বস্তুর প্রসারণের সুযোগ লইয়া থার্মমিটার নামক উষ্মা মাপিবার যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এক প্রান্তে একটি বাল্‌ব্ এবং অপর প্রান্তে একটি ফনেল বিশিষ্ট একটি সূক্ষ্ম নালি বিশিষ্ট কাচের নল লইয়া ফনেলে পারদ ঢাল, বাল্‌ব্‌টিকে উত্তপ্ত করিয়া শীতল করিলে উহার মধ্যে পারদ প্রবেশ করিবে। এইরূপে বাল্‌ব্ এবং নলটি পারদে পূর্ণ হইলে, থার্মমিটার দ্বারা যে পরিমাণ গরিষ্ঠ উষ্মা মাপা হইবে বাল্‌ব্‌টি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উত্তপ্ত কর, এবং এই সময় ফনেলের নিম্নে অগ্নির সাহায্যে নলটিকে বন্ধ করিয়া দাও। শীতল হইবার পর বাল্‌ব্‌টিকে একটি স্টীমপূর্ণ জ্যাকেটে প্রবেশ করাইয়া দিলে, নলমধ্যে যতদূর পারদ উঠিয়াছে নলগাত্রে তথায় একটি দাগ দাও, এইটি হইবে মাপনীর সর্বোচ্চ রেখা। এইবার বাল্‌বটিকে বরফচূর্ণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, নলের মধ্যে যে পর্যন্ত পারদ নামিবে, নলের গাত্রে তথায় আর একটি দাগ দাও, এইটি হইবে মাপনীর সর্বনিম্নরেখা, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন রেখায় মধবর্তী স্থানকে কেহ

৪৭নং চিত্র

৮০ ভাগে, কেহ ১০০ ভাগে, কেহ বা ১৮০ ভাগে সমভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। এই প্রকার এক একটি ভাগকে যথাক্রমে এক এক ডিগ্রি রোমার (Reaumur), সেন্টিগ্রেড (Centigrade) এবং ফারেণহিট (Fahrenheit) বলা হয়। সর্বনিম্ন রেখাকে রোমার ও সেন্টিগ্রেড মাপনী অনুসারে ০° ধরা হয়। কিন্তু ফারেণহিট মাপনী অনুসারে উহাকে ৩২° ধরা হইয়া থাকে, সুতরাং সর্বোচ্চ রেখাটি রোমার, সেন্টিগ্রেড ও ফারেণহিট মাপনী অনুসারে যথাক্রমে ৮০, ১০০ ও ২১২ ডিগ্রী হইয়া
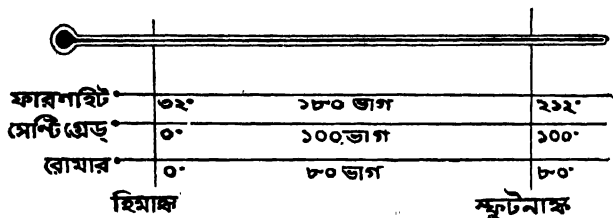
৪৮নং চিত্র

থাকে। এই প্রকার থার্মমিটার দ্বারা জলের স্ফুটনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক অপেক্ষা অধিক বা অল্প উষ্মা মাপা যায় না।

আমাদিগের জ্বরের সময় যে থার্মমিটার ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম **শারীর (Clinical) থার্মমিটার**। এই থার্মমিটারের বাল্‌বটি লম্বা এবং উহার ঠিক উপরে নলটিকে চাপিয়া নলের মধ্যস্থ নালিকে সূক্ষ্মতর করা হয়। এই থার্মমিটার ফারেণহিট মাপনী অনুসারে ৯৫° হইতে ১১০° পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে। থার্মমিটারের পারদ নলমধ্যে প্রসারিত হয়, কিন্তু দেহ হইতে বাহির করিয়া লইলে বাল্‌বের পারদ সংকুচিত হইলেও নলের মধ্য হইতে পারদ নামে না, কারণ বাল্‌বের ঠিক

উপরে নলের যে সূক্ষ্মতর অংশ থাকে বালবের ও নলের মধ্যস্থিত পারদের সংযোগ সেই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

আর একপ্রকার থার্মমিটার আছে, তাহার নাম **গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ** (Maximum and Minimum) **থার্মমিটার**। উহা দ্বারা সাধারণত অহোরাত্রের মধ্যে বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্মা নির্ণয় করা হয়। একটি কাষ্ঠফলকে দুইটি থার্মমিটার লাগান থাকে। একটির মধ্যে পারদের পরিবর্তে কোহল (Alcohol) দেওয়া হয়, এবং তন্মধ্যে কাচ নির্মিত
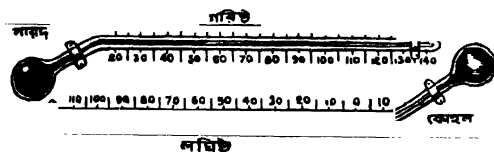
৪৯নং চিত্র

একটি অতি ক্ষুদ্র ডাম্বেল্ (Dumb-Bell) প্রবেশ করান থাকে। বালবের উষ্মা যত কমিতে থাকে কোহলের পৃষ্ঠ তত বালবের দিকে নামিয়া আইসে এবং কোহলের পৃষ্ঠটান বশত ডাম্বেলটিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আইসে, বালবের উষ্মা বর্ধিত হইলে কোহলের পৃষ্ঠ উচ্চ হইতে থাকিলেও ডাম্বেলটি আর উঠে না। সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপ কত অল্প হইয়াছিল, তাহা ডাম্বেলটির অবস্থান দেখিয়া বুঝা যায়। এইটি লঘিষ্ঠ থার্মমিটার। অপর থার্মমিটারটি পারদপূর্ণ এবং শারীর থার্মমিটারের ন্যায় বালবের উপর নলের ছিদ্রটিকে সূক্ষ্মতর করা থাকে। বায়ুর উষ্মা হ্রাস হইলে নলের ও বালবের মধ্যস্থ পারদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ উষ্মা ইহার সাহায্যে জানা যায়। ইহাকে গরিষ্ঠ থার্মমিটার কহে।

আলোক

আলোক শক্তি বিশেষ। কোন উজ্জ্বলতর বস্তু হইতে আলোক নির্গত হইয়া এক বা একাধিক স্বচ্ছ বা ঈষদচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়া অপর বস্তুর উপর পতিত হওয়ার নাম আলোকের **বিস্তৃতি** (Propagation)। কাচ প্রভৃতি যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে, তাহাদিগের নাম **স্বচ্ছ** (Transparent), তৈলাক্ত কাগজের ন্যায় যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক আংশিক ভাবে গমন করিতে পারে, তাহাদিগের নাম **ঈষদচ্ছ** (Translucent), এবং লৌহ, কাষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক গমন করিতে পারে না, তাহাদিগকে **অনচ্ছ** (Opaque), বস্তু কহে। আলোকের গমনপথের নাম **রশ্মি** (Ray) ; একাভিমুখী কতকগুলি রশ্মির সমষ্টির নাম **রশ্মিগুচ্ছ** (Beam)।

একটি লম্বা সরু রবারের নলের মধ্য দিয়া যদি কোন আলোকিত বস্তু দেখিতে চেষ্টাকর, তাহা হইলে দেখিবে যে নলটি যতক্ষণ না ঋজু করিবে ততক্ষণ উহা দেখিতে পাইবে না, কারণ আলোক সমসত্ব (Homogeneous) মাধ্যমের ভিতর দিয়া সর্বদা সরল রেখায় গমন করিয়া থাকে, ইহাকে আলোকের **ঋজুরেখ বিস্তৃতি** (Rectilineal Propagation) কহে। ঋজুরেখ বিস্তৃতির জন্য আলোক, অনচ্ছ বস্তু, এবং তাহার ছায়া সর্বদা এক সরল রেখায় থাকে। যদি একটি পয়সা বাতির সম্মুখে ধর, তাহা হইলে উহারা ছায়া দেওয়ালে পতিত হইবে। ৫০নং চিত্রে মনে কর গঘ একটি পয়সা এবং ঝঞ উহার ছায়া, এই ছায়ায় কেন্দ্রভাগ (ছজ) যত গভীর উহার বহির্ভাগ (ছঝ এবং জঞ) তত গভীর নহে, কারণ ছজ অংশে আলোক শিখার

কোন অংশ হইতে আলোক পতিত হয় না, কিন্তু ছঝ, জঞ অংশে সমগ্র শিখা হইতে পতিত না হইলেও যথাক্রমে ক ও খ অংশ হইতে আলোক পতিত হইয়া থাকে। ছায়ার গভীর অংশকে (ছজ) **প্রচ্ছায়া** (Umbra) এবং অর্ধালোকিত (ছঝ, জঞ) অংশকে **উপচ্ছায়া** (Penumbra) কহে।
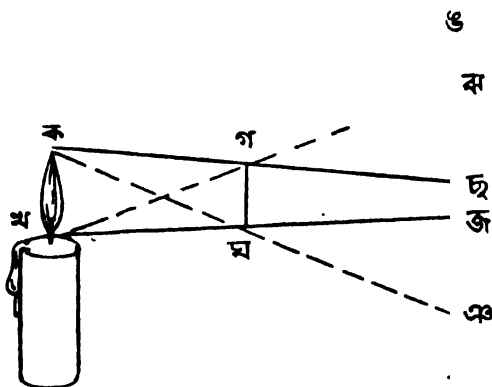
৫০ নং চিত্র

প্রতিফলন। আলোকরশ্মি কোন বস্তুতে পতিত হইবার পর আর অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, উহাকে প্রতিফলন (Reflection) বলা হয়। যে স্থানে পতিত হইয়া আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয় তাহাকে **প্রতিফলক তল** কহে। দর্পণের যে দিক্ কলাই করা থাকে তাহা উহার প্রতিফলক তল। আলোকের প্রতিফলন হইলে আমরা আলোকিত বস্তুর প্রতিবিম্ব (Image) দেখিতে পাই। প্রতিবিম্ব দুই প্রকার, যে সকল প্রতিবিম্বের প্রকৃত সত্তা আছে, অর্থাৎ যাহাদিগকে পর্দার উপর ফেলিতে পারা যায়, তাহাদিগের নাম **সদ্‌বিম্ব**

(Real Image), অন্যথায় প্রতিবিম্বগুলিকে **অসদ্‌বিম্ব** (Virtual Image) বলা হয়। সমতল দর্পণের পশ্চাতে সাধারণত বস্তুর যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তাহা অসদ্‌বিম্ব। দর্পণ দুই প্রকার, **সমতল দর্পণ** ও **গোল দর্পণ**। প্রতিফলক তল সমতল না হইয়া গোলকাংশ হইলে, দর্পণকে গোল (Spherical) বলা হয়। গোলকাংশের বাহির দিক্ প্রতিফলক তল হইলে, দর্পণকে **অবতল** (Concave) এবং ভিতর দিক্ প্রতিফলক তল হইলে, উহাকে **উত্তল** (Convex) আখ্যা দেওয়া হয়। গোল দর্পণ যে গোলকের অংশ, সেই গোলকের কেন্দ্রকে দর্পণেরও **কেন্দ্র** বলে। এবং প্রতিফলক তলের মধ্য বিন্দুকে দর্পণের **মেরু** (Pole) বলা হয়, মেরু ও কেন্দ্রকে যোগ করিয়া গোলকের যে ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় তাহার মধ্য বিন্দুকে
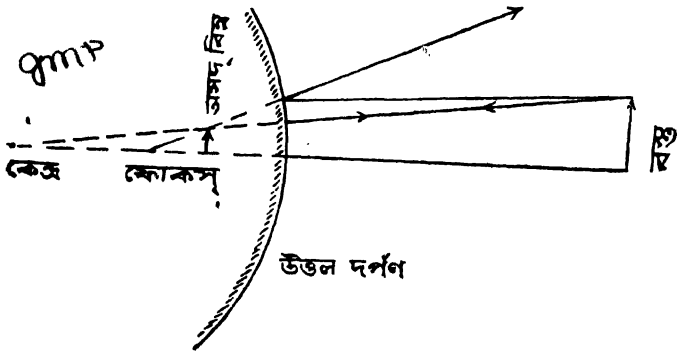
৫১নং চিত্র

দর্পণের **মূলফোকস্** (Principal Focus) এবং উক্ত ব্যাসার্ধকে দর্পণের **অক্ষ** (Axis) কহে। গোল দর্পণে অক্ষের সমান্তরাল কতকগুলি রশ্মি পতিত হইলে উহারা প্রতিফলিত হইয়া মূলফোকসে

মিলিত হয়, বা মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোকিত বস্তু হইতে যে রশ্মি প্রতিফলকতলে পতিত হয় (৫২নং চিত্রে গছ) তাহার নাম **আপতিত** (Incident) রশ্মি, এবং উহা যখন প্রতিফলকতল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে (ছচ) তখন তাহাকে **প্রতি-ফলিত** (Reflected) রশ্মি বলা হয়। প্রতিফলক তলের যে বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়, সেই বিন্দু হইতে উক্ত তলের উপর যে কাল্পনিক লম্ব পাত করা যায় (ছজ) তাহার নাম **অভিলম্ব** (Normal)। প্রত্যেক দর্পণে আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে (∠গছজ = ∠চছজ), এবং উক্ত রেখাত্রয় এক সমতলে অবস্থিত হয়। কোন দর্পণের প্রতিফলক তলের উপর আপতিত রশ্মি লম্বভাবে পতিত হইলে, প্রতিফলিত হইবার পর উহা সেই পথেই

৫২নং চিত্র
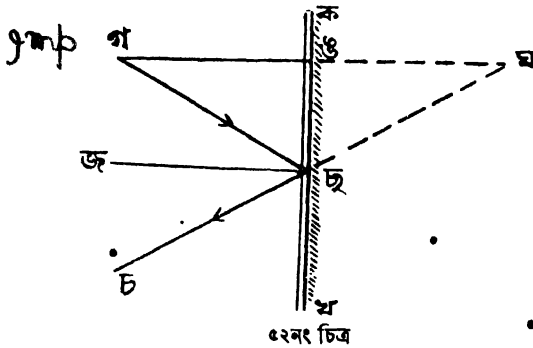
ফিরিয়া আইসে। গোল দর্পণে যে সকল রশ্মি কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অথবা কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে তাহারা উক্ত দর্পণের উপর লম্বভাবে পতিত হয়, সেইজন্য ঐ সকল আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করে। ৫১ ও ৫৩নং চিত্র দেখ। সমতল দর্পণে

বস্তুর প্রতিবিম্ব সোজা, অসৎ, বস্তুর সমান আকারের এবং প্রতিফলকতল হইতে সমদূরে অবস্থিত হয়। উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব সোজা, অসৎ, বস্তু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র আকারের এবং দর্প্পণের মেরু ও ফোকসের মধ্যে কোন স্থানে দেখা যায়। (অবতল দর্প্পণে বস্তু যদি কেন্দ্র অপেক্ষা দূরে থাকে তাহা হইলে উহার প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা, বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার) এবং দর্পণের কেন্দ্র ও ফোকসের মধ্যে কোন স্থানে পতিত হয়, কিন্তু উক্ত
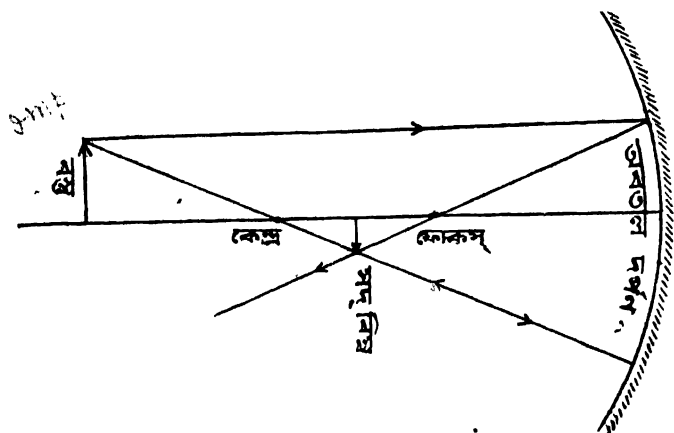
৫৩নং চিত্র

দর্পণে মেরু ও ফোকসের মধ্যে কোন বস্তু থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব অসৎ সোজা এবং বিবর্ধিত আকারের হইয়া থাকে।)

প্রতিসরণ। বিভিন্ন ঘনত্ব (Density) বিশিষ্ট মাধ্যমের ভিতর দিয়া গমনকালে মাধ্যমদ্বয়ের মিলনস্থল (প্রতিসারক তল) হইতে আলোকের গতি বিভিন্নমুখী হয়, ইহাকে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ (Refraction) কহে। প্রতিসারক তলের উপর লম্বভাবে পতিত হইলে,

রশ্মি প্রতিসৃত হয় না। ৫৪নং চিত্রে দেখ কখগঘ একখানি কাচের ঘনক (Cube)। উহার উপরে এবং নিম্নে বায়ু আছে। বায়ু ও কাচ বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট মাধ্যম বলিয়া আলোকরশ্মি (ঙচ) প্রতিসৃত হইয়াছে অর্থাৎ আপতিত রশ্মি (ঙচ) ও প্রতিসৃত রশ্মি (চছ) এক সরল রেখায় নাই। মাধ্যমদ্বয়ের ঘনত্ব নির্দিষ্ট থাকিলে প্রতিসরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। উক্ত চিত্রে মর্ম অভিলম্ব; ঙচ ও চছ হইতে চজ ও চঝ সমান অংশদ্বয় কাটিয়া

৫৪ নং চিত্র

লও, জ ও ঝ হইতে মর্মর উপর জট ও ঝঠ লম্ব পাত করিলে দেখিবে যে $\frac{জট}{ঝঠ}$ = ১·৫৯। ইহাকে কাচের প্রতিসরণাঙ্ক (Refractive Index) কহে। জলমধ্যে একটি দণ্ড বক্রভাবে অর্ধ-নিমজ্জিত করিলে দেখিবে যে, উহা যেন জলের পৃষ্ঠের নিকট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক বাটি জলের মধ্যে একটি পয়সা
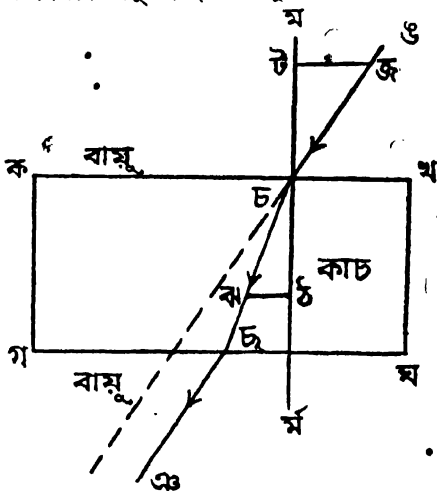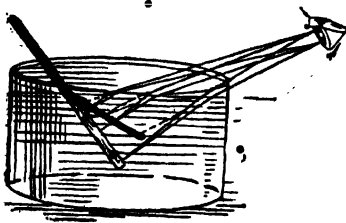
৫৫ নং চিত্র

ফেলিয়া দিয়া, একটু পার্শ্বদিক্ হইতে দেখিলে, পয়সাটিকে উহার

প্রকৃত অবস্থানের কিছু ঊর্ধ্বে দেখিতে পাইবে। এই সকলের কারণ আলোকরশ্মির প্রতিসরণ। ৫৫ ও ৫৬নং চিত্র দেখ।
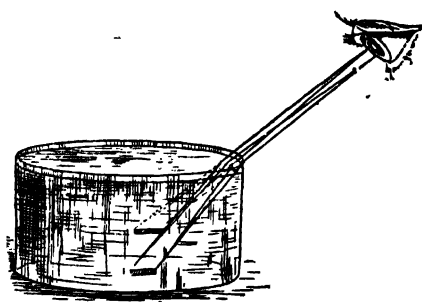
৫৬নং চিত্র

মাধ্যমের সম্মুখস্থ তলদ্বয় সমান্তরাল না হইয়া যদি পরস্পরের সহিত কোণ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে উহাকে প্রিজ্‌ম (Prism) বলা হয়। আলোকরশ্মি সাধারণত প্রিজ্‌মের ভূমি (Base) অভিমুখে প্রতিসৃত হইয়া থাকে। ৫৭নং চিত্র দেখ।

কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের এক বা উভয় প্রতিসারকতল গোলাকার হইলে, উহাকে লেন্স (Lens) বলা হয়। লেন্সের মধ্যস্থল স্থূল, এবং পরিধি সূক্ষ্ম হইলে, উহাকে উত্তল (Convex) লেন্স এবং পরিধি অপেক্ষা মধ্যস্থল সূক্ষ্ম হইলে লেন্সকে অবতল
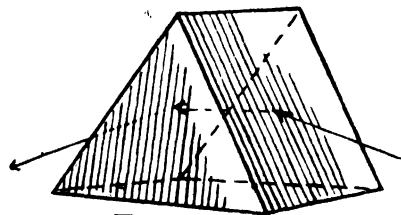
৫৭নং চিত্র

(Concave) বলা হয়। লেন্সের উভয় পৃষ্ঠ উত্তল হইলে উহাকে উভোত্তল (Bi-convex), এক পৃষ্ঠ সমতল হইলে উহাকে সমোত্তল (Plano-convex) এবং এক পৃষ্ঠ উত্তল ও এক পৃষ্ঠ অবতল হইয়াও যুগ্মভাবে উত্তল হইলে লেন্সকে উত্তলাবতল (Concavo-convex)

বলা হয়; সেইরূপ অবতল লেন্স উভাবতল (Bi concave), সমাবতল (Plano concave) ও অবতলোত্তল (Convexo-concave) হইতে পারে। প্রিজ়মের রশ্মি কি প্রণালীতে প্রতিসৃত হয়
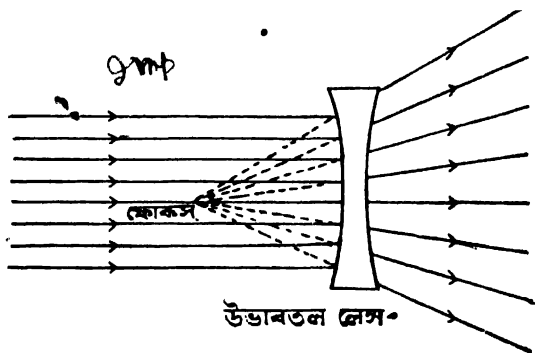
৫৮নং চিত্র

তাহা জানা থাকিলে লেন্সের মধ্যে রশ্মির প্রতিসরণ প্রণালী বুঝিতে কষ্ট হয় না, কারণ লেন্সকে দুইখানি সংযুক্ত প্রিজ়ম কল্পনা করিতে পার। উত্তল লেন্সে প্রিজ়মের ভূমিদ্বয় এবং অবতল লেন্সে উহার শীর্ষদ্বয় যেন কেন্দ্রে সংযুক্ত। গোল দর্পণের ন্যায় লেন্সেরও কেন্দ্র, অক্ষ, মেরু ও ফোকস্ থাকে। উত্তল লেন্সের উপর উহার অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে রশ্মিগুচ্ছ পতিত হইলে উহারা প্রতিসৃত
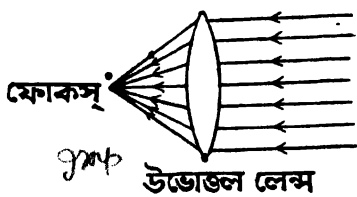
৫৯ নং চিত্র

হইয়া ফোকসে মিলিত হইবে। অবতল লেন্সের মধ্য দিয়া বহুদূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব উহার ফোকসে দেখা যায়। শেষোক্ত প্রকার লেন্সের মধ্য দিয়া যত নিকটস্থ বস্তু দেখিবে উহার প্রতিবিম্ব লেন্সের

দিকে তত সরিয়া আসিবে। অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব সর্বদা অসৎ, সোজা এবং বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া থাকে ; উত্তল লেন্সের বস্তুর প্রতিবিম্ব সাধারণত উল্টা হইয়া লেন্সের বিপরীত দিকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু ফোকস্ ও মেরুর মধ্যে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব অসৎ সোজা ও বিবর্ধিতরূপে বস্তু যেদিকে অবস্থিত সেই দিক হইতে দেখা যায়। আমাদের চক্ষুর মধ্যে যে নেত্র লেন্স আছে তাহা উভোত্তল। বহুদূরে অবস্থিত কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব উক্ত লেন্সের মধ্য দিয়া অক্ষিপটে (Retina) পতিত হয়। তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাচের লেন্সের (চশমা) সাহায্যে প্রতিবিধান করা হইয়া থাকে।

বর্ণ। আমরা যে সকল রঙ্গিন বস্তু দেখি, তাহাদের নিজস্ব কোন বর্ণ নাই, বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকার এক বা একাধিক বর্ণ বিশোষণ (Absorb) করিবার ক্ষমতা আছে। অবশিষ্ট যে বর্ণরশ্মিগুলি উক্ত বস্তু সমূহ হইতে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়, আমরা বস্তুগুলিকে সেই বর্ণবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি। যেমন, যে বস্তু হইতে কেবল লোহিত রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়, তাহাকে লোহিত বর্ণের বস্তু বলা হইয়া থাকে। যে সকল বস্তুর কোন বর্ণরশ্মি বিশোষণ ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে শুভ্র এবং যাহারা সমস্ত বর্ণ বিশোষণ করে তাহাদিগকে কৃষ্ণ বর্ণের বস্তু বলা হয়।

প্রিজমের মধ্য দিয়া শুভ্রালোকের রশ্মিগুচ্ছ যে কেবল প্রতিসৃত হয় তাহা নহে, উহা ভায়লেট্ (Violet), বেগুণে (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), পীত (Yellow), জরদ (Orange) এবং লোহিত (Red) এই সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া থাকে, ইহার নাম বর্ণালী (Spectrum)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শুভ্র আলোক অমিশ্র নহে, উহা সাতটি বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলি প্রিজ়মের মধ্য দিয়া বিভিন্ন পরিমাণে (ভায়লেট্ সর্বাপেক্ষা অধিক এবং লোহিত সর্বাপেক্ষা অল্প) প্রতিসৃত হয় বলিয়া শুভ্রালোক প্রিজ়মের ভূমির দিক হইতে যথাক্রমে ভায়লেটাদি সপ্তবর্ণে বিযুক্ত হইয়া বর্ণালী উৎপন্ন করে।

রামধনু। বৃষ্টির সময় বা তাহার অব্যবহিত পরে বায়ুতে যে সকল বৃষ্টির কণা থাকে, তাহার মধ্য দিয়া সূর্য-কিরণ প্রতিসৃত হইবার সময় উহা পূর্বোক্ত সপ্তবর্ণে বিভক্ত হইয়া খগোলের যে দিকে সূর্য অবস্থিত, তাহার বিপরীত দিকে ধনুর আকারে পতিত হয়, এই বর্ণালির নাম **রামধনু** (Rainbow)। ধনুর উর্ধ্ব বা উত্তল দিকে লোহিত, এবং নিম্ন বা অবতল দিকে ভায়লেট্ বর্ণ থাকে; কখন কখন ইহার বহির্দিকে আর একটি রামধনু দেখা যায়, এই দ্বিতীয় ধনুর উত্তল দিকে ভায়লেট এবং অবতল দিকে লোহিত বর্ণ দেখা যায়। প্রথমটির নাম **মুখ্য** (Primary), এবং দ্বিতীয়টির নাম **গৌণ** (Secondary) রামধনু। 2Nd T. F

চুম্বকত্ব

যে বস্তুর লৌহকে আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাকে **চুম্বক** (Magnet) কহে। চুম্বক দুই শ্রেণির হয়, (১) **স্বাভাবিক**, (২) **কৃত্রিম**। স্বাভাবিক চুম্বকের মধ্যে পৃথিবীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; ভূত্বকের মধ্যে **চুম্বক পাথর** (Lode stone) নামক একপ্রকার লৌহ-প্রধান শিলা পাওয়া যায়, উহার লৌহকে আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আছে। ইহাও স্বাভাবিক চুম্বক। সাধারণ লৌহ বা ইস্পাতকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রণালীর যে কোন উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হইলে, তাহাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক সাধারণত তিন প্রকার আকারের

হইয়া থাকে, (১) **দণ্ড চুম্বক** (Bar Magnet), (২) **ক্ষুর চুম্বক** (Horse shoe Magnet), এবং (৩) **সূচী চুম্বক** (Magnetic Needle)। দণ্ড বা সূচী চুম্বককে অনুভূমিকভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, উহা যদি কোন বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহার একপ্রান্ত উত্তরদিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইবে ; চুম্বকের এই প্রান্তদ্বয় নির্দিষ্ট, অর্থাৎ উহার যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে তাহা কখন উত্তর ভিন্ন অন্য কোন দিকে থাকিবে না। এই প্রান্তকে চুম্বকের **উত্তর মেরু** এবং যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে তাহাকে **দক্ষিণ মেরু** কহে। একটি সূচী চুম্বকের মধ্যভাগে সূতা বাঁধিয়া অনুভূমিক ভাবে ঝুলাইয়া রাখ। উহার যে প্রান্ত উত্তরদিকে অবস্থিত সেই প্রান্তের নিকট একটি দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু স্পর্শ করাইবার চেষ্টা করিলে, দেখিবে যে দণ্ড চুম্বকটিকে উহার যত নিকটে লইয়া যাইতেছ, উহা তত দূরে সরিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ বিকৃষ্ট হইতেছে। এইবার দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরু সূচী চুম্বকের উত্তর মেরুর নিকট লইয়া যাইলে দেখিবে যে উহা আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চুম্বক দুইটির সমমেরুদ্বয় পরস্পরকে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। একটি চুম্বকের মেরু স্থির থাকিলে অন্য একটি চুম্বকের কোন্‌টি কোন্ মেরু তাহা এই উপায়ে জানিতে পারা যায়।

চুম্বকন (Magnetisation)। কোন লৌহদণ্ড বা শলাকাকে (১) দণ্ড চুম্বকের সাহায্যে, (২) বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে অথবা (৩) ভূ-চুম্বকত্বের সাহায্যে চুম্বকিত করা যাইতে পারে।

(১) সাধারণ লৌহ বা ইস্পাত শলাকাকে দণ্ড চুম্বকের সাহায্যে তিন প্রকার বিভিন্ন উপায়ে চুম্বকিত করা যায়। (ক) একটি লৌহ বা ইস্পাত শলাকাকে শয়ানভাবে রাখিয়া দাও। উহার এক প্রান্তে

একটি দণ্ড চুম্বকের যে কোন প্রান্ত স্পর্শ করাইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানিয়া আন এবং দণ্ড চুম্বকটিকে উঠাইয়া লও। শলাকার যে প্রান্তে দণ্ড-চুম্বকের যে প্রান্ত স্পর্শ করাইয়াছিলে সেই প্রান্ত পুনরায় সেই স্থানে স্পর্শ করাও এবং পুনরায় টানিয়া আন। বার কয়েক এইরূপ করিলে উক্ত লৌহশলাকাটি চুম্বকিত হইবে। শলাকার যে প্রান্তে চুম্বকের যে প্রান্ত প্রথম স্পর্শ করাইতেছিলে, তাহা চুম্বকের সমমেরুত্ব প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তুমি যদি চুম্বকের উত্তরমেরু ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা হইলে
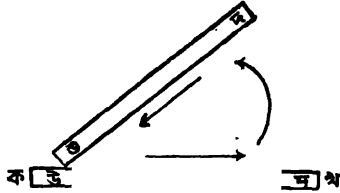
৬০ নং চিত্র

শলাকার যে প্রান্তে চুম্বক প্রথম স্পর্শ করাইতেছিলে তাহা উত্তর মেরু এবং যে প্রান্ত হইতে চুম্বক তুলিয়া লইতেছিলে সেই প্রান্ত দক্ষিণ মেরু হইবে। (খ) চারিখানি দণ্ডচুম্বকের সাহায্যে আর এক প্রকার উপায়ে লৌহকে চুম্বকিত করা যায়। প্রথমত দুইখানি চুম্বককে টেবিলের উপরে এরূপে শয়ানভাবে রাখ যেন উহাদের বিপরীত মেরুদ্বয় কিছুদূরে অবস্থিত হয় এবং পরস্পর সম্মুখীন থাকে। এই মেরুদ্বয়ের উপর একটি লৌহশলাকা এমন ভাবে স্থাপন কর, যেন উহার এক প্রান্ত একটি চুম্বকের উত্তর মেরুর উপর এবং অপর প্রান্ত অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর উপর অবস্থিত থাকে। ৬১নং চিত্রে মনে কর কখ একটি লৌহ শলাকা। উহার ক প্রান্ত নিম্নস্থিত একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর উপর এবং খ প্রান্ত অপর চুম্বকটির উত্তর মেরুর উপর অবস্থিত আছে।

অবশিষ্ট চুম্বক দুইখানির বিপরীত মেরুদ্বয় শলাকার মধ্যভাগে এরূপ ভাবে স্থাপিত কর যেন উহাদিগকে শলাকার উপর দিয়া যথাক্রমে ক ও খ প্রান্তদ্বয়ের দিকে টানিয়া আনিলে ক প্রান্তের উপর একখানি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ও খ প্রান্তের উপর অপর চুম্বকের উত্তর মেরু অবস্থিত
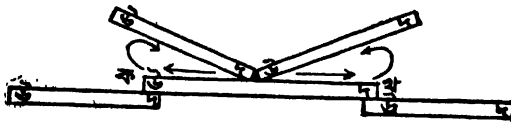
৬১ নং চিত্র

হয়। এইরূপে টানিবার পর চুম্বক দুইখানি ক ও খ প্রান্ত হইতে তুলিয়া লও এবং পুনরায় উহাদিগকে শলাকার মধ্যভাগে স্থাপিত কর, এবং পুনরায় প্রান্তদ্বয়ের দিকে টানিয়া প্রান্তদ্বয় হইতে তুলিয়া লও, বার কয়েক এইরূপ করিবার পর শলাকাটি চুম্বকিত হইবে। (গ) একটি শলাকাকে পূর্বোক্ত প্রকারে স্থাপন কর এবং উপরের চুম্বক দুইখানিকে প্রথমে শলাকার মধ্যে স্থাপিত না করিয়া প্রান্তদ্বয়ে স্থাপন কর। এস্থলেও
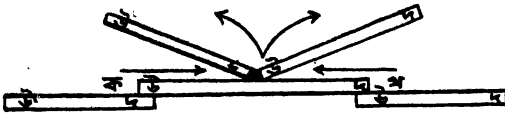
৬২ নং চিত্র

একখানি চুম্বকের উত্তর মেরু খ প্রান্তে এবং অপর চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ক প্রান্তে সংস্পৃষ্ট হইবে। এইবার উপরের চুম্বক দুইখানিকে শলাকার উপর দিয়া উহার মধ্যভাগে টানিয়া আন এবং তথা হইতে তুলিয়া লও। বারকয়েক এইরূপ করিলে শলাকাটি চুম্বকিত হইবে।

চুম্বকিত হইবার পর শলাকার ক প্রান্ত উত্তর মেরু এবং খ প্রান্ত দক্ষিণ মেরু হইবে। এই তিন প্রকার প্রণালীর যে কোন একটি দ্বারা দণ্ডচুম্বকের সাহায্যে সাধারণ লৌহশলাকাকে চুম্বকিত করা যায়।

(২) অন্তরিত বা অপরিবাহী-আবরণে আবৃত (Insulated) তারের কুণ্ডলীর (Coil) মধ্যে একটি নরম লৌহদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দাও। উক্ত কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হইলে লৌহদণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হইবে। কুণ্ডলীর মধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইলে লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রকার চুম্বকের নাম তাড়িৎ-চুম্বক (Electro-magnet)। সম্মুখ হইতে দেখিলে তাড়িৎপ্রবাহ যদি দক্ষিণাবর্তে (Clockwise) প্রবেশ করে, তাহা হইলে চুম্বকের সেই প্রান্ত দক্ষিণ মেরু এবং অন্য প্রান্তটি উত্তর মেরু হইবে। তাড়িৎপ্রবাহ যদি বামাবর্তে (Anticlockwise) প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই প্রান্তটি উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তটি দক্ষিণ মেরু হইবে।

(৩) অনুভূমিক তলে ঝুলাইয়া রাখিলে সূচী চুম্বকের মেরুদ্বয় যে রেখার উপর অবস্থিত থাকে একটি শলাকাকে সেই রেখার সমান্তরালে কিছুদিন রাখিয়া দিলে উহা চুম্বকিত হয়। ভূ-চুম্বক এই প্রকারে সাধারণ লৌহকে চুম্বকিত করিতে পারে, এইরূপে চুম্বকিত চুম্বকের সামর্থ্য অতি অল্প হয়। উক্ত বিভিন্ন প্রকারে যে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হয়, তাহার চুম্বকত্ব স্থায়ী বা অস্থায়ী হইতে পারে। ইস্পাতকে চুম্বকিত করিলে সাধারণত উহা স্থায়ী হয়, কিন্তু নরম লৌহের চুম্বকত্ব অধিক স্থায়ী হয় না, কিন্তু নরম লৌহকে যত শীঘ্র চুম্বকিত করা যায়, ইস্পাতকে তত শীঘ্র চুম্বকিত করা যায় না।

চুম্বকের মধ্যভাগে আকর্ষণ শক্তি থাকে না, কিন্তু একটি চুম্বকিত

লৌহশলাকাকে সমান দুই অংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখিবে যে উহার ভগ্ন প্রান্তদ্বয়ে আকর্ষণ শক্তি আছে। একটি চুম্বক ভাঙ্গিলে উহা দুইটি পূর্ণ চুম্বকে পরিণত হয়। পূর্বে চুম্বকের যেটি যে মেরু ছিল, ভগ্ন হইবার পরেও সেইটি সেই মেরু থাকে এবং প্রত্যেক ভাগের ভগ্ন প্রান্তটি তাহার বিপরীত মেরু হয়।

ভূ-চুম্বকত্ব। পূর্বে বলা হইয়াছে যে দুইটি চুম্বকের সমমেরুদ্বয়, পরস্পরকে বিকর্ষণ এবং বিষম মেরুদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং অনুভূকিমভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে চুম্বকের মেরুদ্বয় উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত হয় ; ইহা হইতে বুঝা যায় যে চুম্বকের মেরুদ্বয় যেদিকে অবস্থিত ভূ-চুম্বকের সেই দুইদিকে দুইটি মেরু আছে। এই মেরুদ্বয়ের নাম চুম্বকীয় মেরু। চুম্বকীয় মেরুদ্বয় ঠিক সুমেরু ও কুমেরুতে (ভৌগোলিক) অবস্থিত নহে। চুম্বকীয় উত্তর মেরু সুমেরুর যতদূরে, চুম্বকীয় দক্ষিণ মেরু কুমেরুর ঠিক ততদূরে বিপরীত দিকে অবস্থিত। সূচী চুম্বকের যে মেরু উত্তর দিকে থাকে তাহা উহার প্রকৃত দক্ষিণ মেরু, কারণ উক্ত মেরু ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। এই মেরুকে প্রকৃতপক্ষে **উত্তরদর্শী মেরু** বলাই সঙ্গত। সেইরূপ উহার যে মেরু দক্ষিণ দিকে থাকে তাহার প্রকৃত নাম **দক্ষিণদর্শী মেরু**। চুম্বকের সাহায্যে আমরা দিক্ নির্ণয় করিতে পারি বলিয়া উহাকে দিগদর্শীযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। **দিগদর্শীযন্ত্রে** (Compass) সূচী চুম্বকের নিম্নে বত্রিশটি দিক্ চিহ্নিত একটি গোল চাকৃতি বসান থাকে চাকৃতিখানির নাম দিগদর্শীচক্র। নাবিকগণ দিগদর্শীযন্ত্রের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিয়া থাকে। তাহাদের ব্যবহৃত দিগদর্শীযন্ত্রের নাম **নৌ-কম্পাস** (Marine Compass)। চুম্বকীয় মেরু ভৌগোলিক মেরু হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কোন স্থানে সূচীচুম্বক যখন বিনা বাধায় অনুভূমিকভাবে ঝুলান থাকে, তখন তাহার

মেরুদ্বয়ের ভিতর দিয়া যে উর্ধ্বাধ তল কল্পনা করা হয়, তাহাকে সেই স্থানের **চুম্বকীয় মধ্যরেখা** (Magnetic meridian) কহে। অনুভূমিকভাবে থাকিলে চুম্বকশলাকা সর্বদা এই রেখার সমান্তরাল থাকে। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক মধ্যরেখা চুম্বকীয় মধ্যরেখার সহিত বিভিন্ন কোণ উৎপন্ন করে, এই কোণের নাম **মেরুঅন্তর** (Declination)। কোন স্থানের মেরুঅন্তর জানা না থাকিলে দিগ্‌দর্শীযন্ত্রদ্বারা ভৌগোলিক দিক্ নির্ণয় করিতে পারা যায় না, সেইজন্য নৌ-কম্পাসের সহিত বিভিন্ন স্থানে মেরুঅন্তরের একটি তালিকা থাকে। চুম্বকিত করিবার পূর্বে সূচীকে যদি অনুভূমিক তলে রাখা যায়, চুম্বকিত হইবার পর উহার এক প্রান্ত নত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উহা ক্ষিতিজের সহিত কোণ উৎপন্ন করে, এই কোণের নাম **বিনতি** (Dip)। পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীকে প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া এমন একটি কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা যাইতে পারে, যাহার উপর সূচীচুম্বকের বিনতি থাকিবেনা। এই রেখাটির নাম **চুম্বকীয় বিষুবরেখা** (Magnetic Equator)। এই রেখার যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায় সূচীচুম্বকের যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু তত বিনত হয়। বিনত অবস্থায় সূচীচুম্বক ঠিক চুম্বকীয় মেরুর দিকে থাকে না। সেইজন্য নৌ-কম্পাসে সূচীচুম্বককে সর্বদা অনুভূমিকতলে রাখার ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যুৎ

বর্তমান কালে বৈদ্যুতিক শক্তি সভ্যজগতে সুপরিচিত। বাতি, পাখা, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতিরূপে উক্ত শক্তি নিত্য আমাদের সেবা করিতেছে। অবস্থাভেদে বিদ্যুৎকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যখন উহা কোনস্থানে সঞ্চিত থাকে মাত্র, অর্থাৎ একস্থান

হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় না, তখন বিদ্যুৎকে **স্থিতীয়** (Statical), এবং যখন উহা স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তখন উহাকে **চল** (Dynamical) **বিদ্যুৎ** বলা হয়। একটি কাচের দণ্ডকে সিল্কের রুমাল দ্বারা ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিলে দেখিবে যে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ ঘর্ষণদ্বারা কাচদণ্ডের মধ্যে স্থিতীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে। স্থিতীয় বিদ্যুৎ ঘর্ষণদ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম **ঘর্ষ** (Frictional) **বিদ্যুৎ**; এবং ভল্টা (Volta) আবিষ্কার করেন বলিয়া চল বিদ্যুৎতের অপর নাম **ভোল্টীর বিদ্যুৎ** (Voltaic Electricity)। আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতে দেখা যায় তাহা মেঘের ঘর্ষণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহা ঘর্ষ বিদ্যুৎ।

সেল (Cell)। একটি কাচের পাত্রে লঘু (Dilute) সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া তন্মধ্যে একখানি তাম্রের ও একখানি দস্তার ফলক উর্ধ্বাধ ভাবে নিমজ্জিত কর। উক্ত ফলক দুইখানির যে অংশ অ্যাসিডের উপরে আছে তাহাদিগকে একটি লৌহ বা তাম্রের তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিলে তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে। ইহাকে বৈদ্যুতিক **প্রবাহ** (Current) বলে। অ্যাসিড, তাম্র-ফলক ও দস্তা ফলক সমেত কাচপাত্রটিকে সরল বৈদ্যুতিক **সেল** (Cell) বলা হয়। অ্যাসিড ও ধাতুর সংযোগের ফলে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুতে বা বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তরিত হইয়া সেলের মধ্যে **তড়িচ্চালক বল** (Electromotive Force) উৎপন্ন করে।

এই বল সেলের বিভিন্ন ধাতুফলকে বিভিন্ন পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া [illegible] জলের ন্যায় বিদ্যুৎও সর্বদা সমলেভেলে থাকিবার চেষ্টা করে; [illegible]সংযুক্ত অবস্থায় সেলের যে স্থানে তড়িচ্চালক বল অপেক্ষাকৃত

অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, তথা হইতে যে স্থানে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প তদভিমুখে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

সেলের যে স্থান হইতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় (এস্থানে তাম্রফলকের উপরিভাগ) তাহাকে উহার পজিটিভ মেরু, এবং যেস্থানে উহা প্রবাহিত হয় (এস্থলে দস্তাফলকের উপরিভাগ) তাহাকে সেলের নেগেটিভ মেরু বলে। মেরুদ্বয় সংযুক্ত হইলে বিদ্যুৎ যে কেবল সংযোগকারী তারের মধ্যেই প্রবাহিত হয় তাহা নহে, উহা তার, ফলক ও অ্যাসিড সকলের মধ্যে প্রবাহিত হয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহ পজিটিভ মেরু হইতে তারের মধ্য দিয়া নেগেটিভ মেরুতে, তথা হইতে যথাক্রমে দস্তাফলকের এবং অ্যাসিডের ভিতর দিয়া তাম্রফলকে তথা পজিটিভ মেরুতে গমন করে। প্রবাহের এই চক্রাকার পথের নাম **বর্তনী** (Circuit)। অ্যাসিডের উপরস্থ বর্তনীর অংশকে বহির্বর্তনী এবং অ্যাসিডের মধ্যবর্তী অংশকে অন্তর্বর্তনী কহে। মেরুদ্বয় যখন তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে, তখন বর্তনীকে **সংহত** (Closed), এবং যখন উহারা বিযুক্ত থাকে তখন বর্তনীকে **খণ্ডিত** (Open) কহে। বর্তনী খণ্ডিত থাকিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, উহা কেবল সংহত বর্তনীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে।

উপরে যে সরল বৈদ্যুতিক সেল বর্ণনা করা হইয়াছে, কিছুক্ষণ ব্যবহৃত হইবার পর উহার সামর্থ্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়, কারণ দস্তা অ্যাসিডের সহিত সংযুক্ত হইয়া জিঙ্কসালফেট্ নামক লবণে পরিণত হয়, এই লবণ অ্যাসিডকে ক্রমশ প্রসমন (Nutralise) করিয়া থাকে। আর একটি কারণেও সেলের সামর্থ্য কমিয়া যায়। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবার সময় সেলের অভ্যন্তর লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে তাম্রফলক-গাত্রে

অসংখ্য হাইড্রোজেন গ্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ জমিতেছে। এই সকল বুদ্বুদ তাড়িৎপ্রবাহকে বিপরীতমুখে চালিত করিবার চেষ্টা করে। সেলের এই সকল দোষ সংশোধন করিয়া ড্যানিয়েল, লেক্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার উন্নত বৈদ্যুতিক সেল উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বৈদ্যুতিক সেলের মেরুদ্বয় ধাতুনির্মিত তার দ্বারা সংযুক্ত না করিয়া যদি সিল্কের সূতা দ্বারা সংযুক্ত কর তাহা হইলে দেখিবে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে না। সমস্ত বস্তুর তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তুর মধ্য দিয়া সুচারুরূপে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে পারে না। যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতে পারে, তাহাদিগের নাম **পরিবাহী** (Conductor) ; এবং যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইতে পারে না, তাহাদিগের নাম **অপরিবাহী** (Non conductor বা Insulator)। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে কোন বস্তুই অপরিবাহী নহে, প্রত্যেক বস্তুই অন্তত অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিবহন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে অপরিবাহী না বলিয়া **কুপরিবাহী** (Bad Conductor) বলাই সঙ্গত, এবং যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পারে তাহাদিগকে সুপরিবাহী (Good Conductor) বলা যায়। কাচ, ইবনাইট, গালা, শুষ্কবায়ু, গন্ধক, রেশম, রবার প্রভৃতি বস্তু কুপরিবাহী এবং সকল প্রকার ধাতু, জল, দ্রবীভূত লবণ, পৃথিবী প্রভৃতি সুপরিবাহী বস্তুর দৃষ্টান্তস্থল। বৈদ্যুতিক তার সাধারণত রবার ও রেশম দ্বারা আবৃত থাকে, এইরূপ অন্তরিত (Insulated) তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আবৃত তারের বহির্দেশ স্পর্শ করিলেও আমরা বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনুভব করিতে পারি না।

বর্তনী মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের ক্ষমতা যে কেবল পূর্বোক্ত তড়িচ্চালক

বলের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, উহা যোজক পরিবাহীর উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। মোটা নলের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত জল প্রবাহিত হইতে পারে, সরু নলের মধ্য দিয়া সেই সময়ের মধ্যে তত জল প্রবাহিত হইতে পারে না। সেইরূপ পরিবাহী তার যত মোটা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তত অধিক তড়িৎ তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, অর্থাৎ তাড়িৎপ্রবাহের ক্ষমতা তত অধিক হয়। পরিবাহী তার যত সূক্ষ্ম হয় উহার মধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ তত বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরিবাহীর তাড়িৎপ্রবাহকে বাধা দিবার ধর্মের নাম **প্রতিবন্ধ** (Resistance)। তড়িচ্চালক বল, প্রতিবন্ধ এবং তাড়িৎপ্রবাহ যথাক্রমে **ভোল্ট** (Volt), **ওহ্‌ম্** (Ohm) এবং **অ্যাম্‌পেয়ার** (Ampere) নামক একক (Unit) দ্বারা পরিমিত হয়। সেলের তড়িচ্চালক বল এক ভোল্ট হইলে এবং উহার যোজক পরিবাহীর প্রতিবন্ধ এক ওহ্‌ম্ হইলে তাড়িৎপ্রবাহের ক্ষমতা এক অ্যাম্‌পেয়ার হইবে।

তাপীয় কার্য। পরিবাহীর মধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ যে প্রতিবন্ধ অতিক্রমরূপ কার্য করে, তাহার ফলে পরিবাহক তারটি উত্তপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাড়িৎশক্তির কিয়দংশ তাপীয়শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সংহত বর্তনীর অন্তর্গত তারের কিয়দংশ যদি সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে দেখিবে যে উহা তাড়িৎপ্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত হইয়াছে। পরিবাহীর মধ্যে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা (১) তাড়িৎপ্রবাহের ক্ষমতা, (২) পরিবাহীর প্রতিবন্ধ এবং (৩) তড়িৎ প্রবাহিত হইবার সময়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ প্রবাহের ক্ষমতা যত অধিক হইবে, পরিবাহী যত সূক্ষ্ম হইবে এবং যত অধিকক্ষণ ধরিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইবে, পরিবাহী তত অধিক উত্তপ্ত হইবে। একটি ধাতু নির্মিত তারকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে দেখিবে যে উহা প্রথমে লাল,

এবং আরও অধিক উত্তপ্ত হইলে শুভ্র আলোক বিকিরণ করে। তাড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে উত্তপ্ত হইয়াও পরিবাহী উক্তরূপ আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। পরিবাহীর গলনাঙ্ক অল্প হইলে, আলোক বিকিরণের পূর্বেই কিন্তু উহা গলিয়া যায় এবং বর্তনী খণ্ডিত হয়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মহামতি এডিসন ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বিজলী বাতি আবিষ্কার করেন। তিনি প্লাটিনাম ধাতুর সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়া তাঁড়িৎ প্রবাহিত করিয়া উহা হইতে উত্তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হন। উহা দ্বারা কিন্তু বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই, সেইজন্য প্লাটিনামের পরিবর্তে কার্বণসূত্রকে তড়িতের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। পরিবাহীর এক অংশ কাটিয়া উহার দুই প্রান্ত এক টুকরা সূক্ষ্ম কার্বণ-সূত্রের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করা হইল। এই কার্বণসূত্রটি একটি ফাঁপা বায়ুশূন্য কাচের গোলকের মধ্যে থাকে, নতুবা বায়ুর সংস্পর্শে উহা দগ্ধ হইয়া যায়। তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্বণের প্রতিবন্ধ কমিয়া যায়, সুতরাং কার্বণের বাতিতে তড়িতের অপচয় হয়। বিজলী বাতিতে অধুনা যে সকল বাল্‌ব্ ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে কার্বণের পরিবর্তে সাধারণত টাংস্‌টেন নামক এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য ধাতুর সূত্র থাকে, এবং বাল্‌বগুলি বায়ুশূন্য না করিয়া নাইট্রোজেন নামক গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এই প্রকারে অল্প শক্তি হইতে দ্বিগুণ উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্যাস পূর্ণ বাল্‌ব্‌কে **হাফ ওয়াট্** (Half-Watt) বাল্‌ব্ বলা হয়।

রাসায়নিক কার্য। একটি কাচের বাটিতে কিছু জল লও, এবং জলে সামান্য পরিমাণে যে কোন অ্যাসিড মিশ্রিত কর। দুইটি পরীক্ষা-নল (Test tube) বাটির মধ্যে নিম্নমুখে ডুবাইয়া রাখ। এইবার একটি বৈদ্যুতিক সেলের দুই মেরুর সহিত দুইটি পরিবাহক তার সংযুক্ত

করিয়া তারের মুক্ত প্রান্তদ্বয় এমন ভাবে জলের মধ্যে ডুবাইয়া দাও, যেন তাহারা পরীক্ষানলদ্বয়ের ঠিক নিম্নে থাকে। বর্তনী সংহত হওয়ায় জলের মধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইবে, এবং বাটির জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে পৃথক ভাবে পরীক্ষা-নলদ্বয়ের মধ্যে জমিতে থাকিবে। এই প্রকার বিশ্লেষকে **তড়িদ্‌বিশ্লেষ** (Electrolysis) কহে। ইহা তাড়িৎপ্রবাহের রাসায়নিক কার্য। জলের ন্যায় নানাপ্রকার অ্যাসিডের এবং লবণদ্রবেরও তড়িদ্‌বিশ্লেষ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত মুক্ত তার-প্রান্ত দুইটির নাম **তড়িদ্‌দ্বার** (Electrode)। তড়িদ্‌দ্বার দুইটির মধ্যে, যদ্দ্বারা তাড়িৎপ্রবাহ সেল হইতে প্রবেশ করে, তাহার নাম **অ্যানোড্** (Anode) ; এবং যদ্দ্বারা উহা সেলাভিমুখে ফিরিয়া যায় তাহার নাম **ক্যাথোড্** (Kathode)। জলের তড়িদ্‌বিশ্লেষের সময় অক্সিজেন অ্যানোডাভিমুখে এবং হাইড্রোজেন ক্যাথোডাভিমুখে গমন করে।
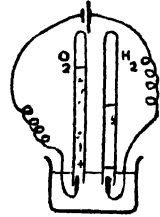
৬৩ নং চিত্র

তামার বা পিতলের পাত্রে এই উপায়ে রৌপ্যাদির কলাই করা হয়। যে পাত্রকে কলাই করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ক্যাথোডের সহিত সংযুক্ত করা হয়, এবং যে ধাতুর কলাই হইবে, অ্যানোডটি সেই ধাতু নির্মিত হয়। যে ধাতুর কলাই হইবে সেই ধাতুর কোন লবণ-দ্রবের মধ্যে উক্ত পাত্র ও অ্যানোড্‌কে পৃথকভাবে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উক্ত লবণ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তন্মধ্যস্থ ধাতু পাত্রের উপর (ক্যাথোডে) পরিন্যস্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পাত্রাদিতে রূপার বা নিকেলের **বৈদ্যুতিক কলাই** (Electro-plating) করা হইয়া থাকে।

চৌম্বিক কার্য। তাড়িৎপ্রবাহ নরম লৌহকে চুম্বকে পরিণত করিতে পারে, ইহা তোমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছ। অপর চুম্বক অপেক্ষা তাড়িৎচুম্বকের আকর্ষণ সামর্থ্য অধিক, এবং এই সামর্থ্য তাড়িৎ-প্রবাহের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তাড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া গেলে তাড়িৎচুম্বক একেবারে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্য প্রকারে চুম্বকিত হইলে চুম্বকত্ব অল্প-বিস্তর স্থায়ী হয়। তাড়িৎপ্রবাহের গতিমুখ পরিবর্তন করিয়া তাড়িৎচুম্বকের মেরু সহজে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু অপর চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করা সহজ নহে। চুম্বকের সহিত তাড়িৎ-প্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনুভূমিকভাবে অবস্থিত একটি সূচী-চুম্বকের উপরে উহার সহিত সমান্তরাল একটি ঋজু তারের ভিতর তাড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইলে দেখিবে যে চুম্বকটি আর উত্তর-দক্ষিণে নাই, উহা কতকটা পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত হইয়াছে। ভূ চুম্বকের প্রভাব না থাকিলে উহা ঠিক পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত হইত। তাড়িতপ্রবাহ সূচী চুম্বককে প্রবাহরেখার (তারের) উপর লম্বভাবে রাখিবার চেষ্টা করে, এবং পৃথিবী উহাকে উত্তর-দক্ষিণে রাখিবার চেষ্টা করে ; সুতরাং প্রবাহ রেখা উত্তর-দক্ষিণে থাকিলে সূচী কোণাকুণি ভাবে অবস্থিত হইবে। প্রবাহের ক্ষমতা যত অধিক হয়, সূচী তত অধিক পূর্ব-পশ্চিমে সরিয়া আইসে। তারের যে অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং সূচীচুম্বকের যে দিকে তারটি অবস্থিত তাহার উপর সূচীর মেরুদ্বয়ের অবস্থান নির্ভর করে। উক্ত বৈদ্যুতিক তারের সহিত
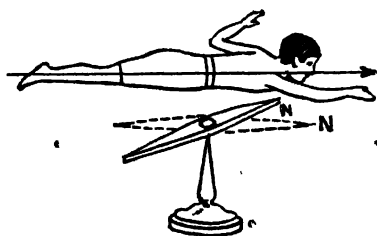
৬৪নং চিত্র

সমান্তরালভাবে শায়িত একটি মনুষ্য মূর্ত্তি কল্পনা কর। লোকটির মস্তক যদি প্রবাহের অভিমুখে থাকে এবং সূচীটি যদি তাহার সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে সূচীচুম্বকের উত্তর মেরু লোকটির বামদিকে থাকিবে। ৬৪নং চিত্র দেখ। তারটি সূচীচুম্বকের নিম্নে থাকিলে, এবং তারের মধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ উত্তরাভিমুখী হইলে সূচীর উত্তর মেরু পূর্বদিকে সরিয়া যাইবে। তোমরা তাড়িৎপ্রবাহের দ্বিবিধ চৌম্বিক কার্য দেখিতে পাইলে, প্রথম সাধারণ লৌহের চুম্বকন, এবং দ্বিতীয় চুম্বকের বিক্ষেপ (Deflection)।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। তোমরা বোধ হয় আহ্বানকারী বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Calling-bell) দেখিয়াছ। একটি বোতাম টিপিলেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং উহা ছাড়িয়া দিলে ঘণ্টাবাদ্য বন্ধ হইয়া যায়। বোতামটি আর কিছুই নহে, ঐ স্থানে বর্তনী খণ্ডিত থাকে। বোতাম টিপিয়া ধরিলে বর্তনী সংহত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় খণ্ডিত হইয়া যায়। তোমরা জান যে সংহত অবস্থায় বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এইবার আমরা ঘণ্টার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিব। ঘণ্টার চারিটি প্রধান অংশ আছে। (১) অশ্বক্ষুরের আকারের একটি তাড়িৎচুম্বক, (২) একটি ধাতু নির্মিত স্ক্রু, (৩) একটি ধাতু নির্মিত হাতুড়ি এবং (৪) একটি ধাতু নির্মিত বাটি। এই সমস্ত অংশ একখানি কাষ্ঠ-ফলকে সংলগ্ন থাকে। ৬৫নং চিত্রে দেখ, হাতুড়ির যে অংশ (কখ) চুম্বকের সম্মুখে আছে তাহা নরম লৌহ নির্মিত। উহার উপরের গ অংশ পাৎলা ইস্পাতে নির্মিত বলিয়া সমগ্র হাতুড়িটি সহজে দুলিতে পারে। স একটি বৈদ্যুতিক সেল, উহার এক মেরু হইতে একটি তার আসিয়া চুম্বকে জড়ান তারের এক প্রান্তে (ঘ) সংযুক্ত হইয়াছে, (এই তারটি চাবির (চ) মধ্যে খণ্ডিত)। অপর মেরু হইতে একটি তার

আসিয়া স্ক্রুর সহিত (ঙ) সংযুক্ত হইয়াছে। চুম্বকে জড়ান তারের এক প্রান্ত (ঘ) সেলের সহিত সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংযুক্ত (ছ)। হাতুড়িটি এমন স্থানে অবস্থিত যে যখন তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ থাকে না, তখন উহার কখ অংশ চুম্বক হইতে কিছু দূরে স্ক্রুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। (যদিও কুণ্ডলীবেষ্টিত অশ্বক্ষুরের আকারের নরম লৌহকে তাড়িৎচুম্বক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত না হইলে উহা চুম্বকে পরিণত হয় না)। চাবি টিপিয়া দিলেই বর্তনী সংহত হয় এবং কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া তন্মধ্যস্থ নরম লৌহকে চুম্বকে পরিণত করে, সুতরাং উহা হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ধাতু নির্মিত বাটীটি এমন স্থানে বসান আছে যে চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেই হাতুড়ি উহাকে আঘাত করিবে। এদিকে চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট
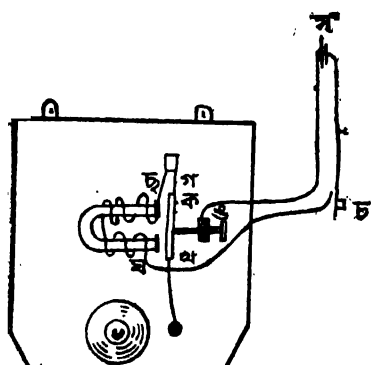
৬৫ নং চিত্র

হওয়ায় হাতুড়ি স্ক্রু হইতে দূরে চলিয়া গেল এবং বর্তনী এই স্থানে আপনা আপনি খণ্ডিত হইল, সুতরাং তাড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় তাড়িৎচুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া গেল। হাতুড়ির গ অংশের স্থিতিস্থাপকতার জন্য, হাতুড়ি পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিল অর্থাৎ পুনরায় স্ক্রুকে স্পর্শ করিল। এইরূপে যতক্ষণ চাবি টেপা থাকে ততক্ষণ হাতুড়ি একবার চুম্বককে ও একবার স্ক্রুকে স্পর্শ

করিতে থাকে, ফলে বাটিকে পুনঃপুন আঘাত করিয়া শব্দ উৎপন্ন করে।

বার্ত্তাবহন। দূরবর্ত্তীস্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের নাম টেলিগ্রাফি বা বার্ত্তাবহন। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বিভিন্ন বর্ণের পতাকা বা আলোক দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করা হইত। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন তিনি উক্ত প্রকার বার্ত্তাবহের সাহায্যে শত্রুপক্ষ সাবধান হইবার পূর্বে তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া জয়লাভ করিতে থাকেন। বেভেরিয়া ছিল অষ্ট্রিয়ার বন্ধু। এই দুই রাজ্য যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং দেখিল যে বার্ত্তাবহের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। বেভেরীয় সরকার মিউনিকের অধ্যাপক সেমারিংকে নেপোলিয়নের বার্ত্তাবহন প্রণালী অপেক্ষা উন্নত ধরণের এক প্রণালী উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেমারিংএর চার-দিনের চেষ্টার ফলে এক প্রকার বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ আবিষ্কৃত হইল। এই প্রণালীতে বার্ত্তা-গ্রাহকের নিকট এক পাত্র জল থাকিত এবং তন্মধ্যে পাঁচটি চিহ্নিত তড়িদ্-দ্বার নিমজ্জিত থাকিত। তড়িদ্-দ্বার পাঁচটি হইতে পাঁচটি তার সংবাদ-প্রেরকের নিকট থাকিত। প্রেরক ইহাদের দুইটি যখন বৈদ্যুতিক সেলের মেরুর সহিত সংযুক্ত করে গ্রাহক তখন দুইটি তড়িদ্-দ্বারে গ্যাসের বুদ্বুদ্ দেখিতে পায়। এই প্রকারে সেলের সহিত বিভিন্ন তার যোগ করিয়া সাংকেতিক সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল।

অধুনা এস্, এফ., বি, মোর্স্ কর্তৃক প্রচলিত উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরিত

হয়। এই প্রকার বার্ত্তাবহের প্রধানত চারিটি অংশ আছে। (১) দুইটি বিভিন্ন বার্ত্তাবহন কেন্দ্রকে সংযুক্ত করিয়া একগাছি পরিবাহী **তার**, এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া (২) **প্রেরণ যন্ত্র** (Transmitter), (৩) **গ্রহণ যন্ত্র** (Receiver) ও (৪) একটি করিয়া **বৈদ্যুতিক সেল** বা ব্যাটারী। সেলের নেগেটিভ মেরু পৃথিবীর সহিত, এবং পজিটিভ মেরু প্রেরণ-যন্ত্রের সহিত পরবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অধুনা যে প্রেরণযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম মোর্সের চাবি। ৬৬নং চিত্রে মোর্সের চাবি দেখান হইয়াছে। একটি অক্ষদণ্ডের (Axis) উপর স্থাপিত একটি পিতলের লিভার ; লিভারের এক প্রান্তে নিম্নদিকে একটি ধাতু নির্মিত স্ক্রু (ক), এবং অপর প্রান্তে একটি বোতাম (খ) আছে ; অক্ষদন্ডটি একখানি অপরিবাহী ফলকের উপর বসান থাকে। লিভারের যে দিকে স্ক্রু আছে সেই দিক্ একটি স্প্রিংএর সাহায্যে উক্ত ফলকের সহিত সংযুক্ত ; ফলকের দুই প্রান্তের উপরে দুইটি ধাতু নির্মিত বোতাম (গ ও ঘ)। এই হইল মোর্সের চাবি। এইবার উক্ত চিত্রে
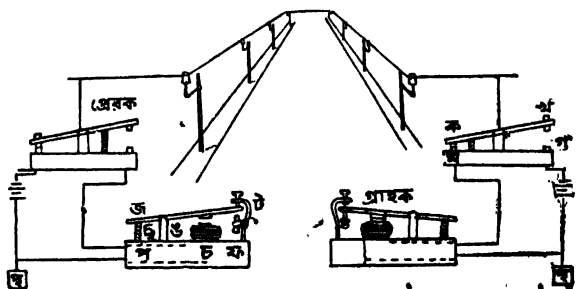
৬৬নং চিত্র

অধুনা ব্যবহৃত বার্তাগ্রহণ যন্ত্র বা মোর্সের অনুনাদকের (Sounder) অংশগুলি দেখ। চ—তাড়িৎ চুম্বক, পফ—অপরিবাহী ফলক, ঙ—

অক্ষদণ্ড, জট—নরম লৌহ নির্মিত লিভার, ছ—স্প্রিং, লিভারের ট প্রান্তের দিকে উপরে ও নিম্নে দুইটি স্ক্রু। চুম্বকের তারের এক প্রান্ত চাবির ঘ বোতামের সহিত, অপর প্রান্ত পৃথিবীর সহিত, এবং চাবির গ বোতাম সেলের পজিটিভ মেরুর সহিত পরিবাহক তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। বিভিন্ন বার্ত্তাবহন কেন্দ্রদ্বয় যে তার দ্বারা সংযুক্ত তাহার নাম **"লাইন"** (Line)। লাইনের প্রান্তদ্বয় উভয় কেন্দ্রের চাবির লিভারের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রেরণ ও গ্রহণ যন্ত্রের স্প্রিংদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থায় উহাদের লিভার দুইটিকে এরূপ ভাবে টানিয়া রাখে যে চাবির স্ক্রু (ক) ঘ বোতামকে এবং অনুনাদকের লিভার উপরের স্ক্রুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় দেখ লাইন তারে তাড়িৎপ্রবাহ নাই। যদি কোন কেন্দ্রে চাবির খ বোতাম টিপিয়া গ বোতামের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সেই কেন্দ্রে সেলের পজিটিভ মেরু হইতে তড়িৎ যথাক্রমে চাবির গ বোতাম, খ বোতাম ও লিভারের মধ্য দিয়া লাইন তারে প্রবাহিত হইবে। তথা হইতে প্রবাহ অপর কেন্দ্রে চাবির লিভার, ক স্ক্রু, ও ঘ বোতামের মধ্য দিয়া চুম্বকের তারে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইবে। তোমরা জান যে পৃথিবী বিদ্যুতের সুপরিবাহী, উভয় কেন্দ্রে সেলের নেগেটিভ মেরু পৃথিবীতে সংযুক্ত থাকায় বর্তনী নির্বিবাদে সংহত হইয়া গেল। অতএব প্রেরণ-কেন্দ্রের চাবি টিপিলে, গ্রহণ-কেন্দ্রের চুম্বক চুম্বকিত হইয়া লৌহ নির্মিত লিভারকে (জট) আকর্ষণ করে, ফলে উহা নিম্নস্থ স্ক্রুকে সশব্দে আঘাত করে। প্রেরণ-কেন্দ্রে চাবির খ বোতাম ছাড়িয়া দিলে বর্তনী খণ্ডিত হয় এবং গ্রহণ-কেন্দ্রে চএর চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যায়; তখন ছ স্প্রিংএর সাহায্যে লিভারের প্রান্ত সশব্দে উপরস্থ স্ক্রুকে আঘাত করে। প্রেরণ-কেন্দ্রে অল্পক্ষণ বা অধিকক্ষণ ধরিয়া চাবির খ বোতাম

টিপিয়া থাকিলে, গ্রহণ-কেন্দ্রে জট লিভার অল্পক্ষণ বা অধিকক্ষণ পরে উপরের স্ক্রুকে আঘাত করে, এইরূপে তথায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুইপ্রকার শব্দ উৎপন্ন করা যায়। এই দুই প্রকার শব্দ দ্বারা ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর জ্ঞাপন করা হয়। নিম্নে হ্রস্ব শব্দকে (◦) চিহ্ন দ্বারা এবং দীর্ঘ শব্দকে (—) চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।

a	◦—	n	—◦
b	—◦◦◦	o	— — —
c	—◦—◦	p	◦ — — ◦
d	— ◦ ◦	q	— — ◦ —
e	◦	r	◦—◦
f	◦ ◦ — ◦	s	◦ ◦ ◦
g	— — ◦	t	—
h	◦ ◦ ◦ ◦	u	◦ ◦ —
i	◦ ◦	v	◦ ◦ ◦—
j	◦ — — —	w	◦ — —
k	— ◦ —	x	— ◦ ◦ —
l	◦ — ◦ ◦	y	— ◦ — —
m	— —	z	— — ◦ ◦

◦◦◦ — ◦ — ◦ ◦◦◦◦ — — — — — — ◦ — ◦ ◦ শব্দ হইলে গ্রাহক বুঝিবে যে, প্রেরক "SCHOOL" কথাটি জানাইতেছে। মোর্স উক্ত সাংকেতিক বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন বলিয়া উহাকে মোর্সের সাংকেতিক বর্ণমালা (Code) বলা হয়। অধুনা গ্রহণযন্ত্রের লিভার কেবল শব্দ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা উক্ত বিন্দু ও রেখা কাগজে

লিখিয়া দেয়। এই প্রকারে শত শত মাইল দূরে মুহূর্ত মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে।

Questions :—(1) What is the scope of Physics ? (2) Enumerate the physical properties of liquids. (3) What is Archimedes' principle ? How does it help to find out the specific gravity of a solid ? (4) How can you prepare a simple barometer ? (5) What do you mean by tranformation of energy ? Explain with examples. (6) What are the means of transference of heat. (7) How the image of an object differ in a concave mirror with the difference of the object's distance from the mirror ? (8) What is spectrum ? How rainbow is formed ? (9) Describe any method by which you can magnetiso an iron rod. (10) Decribe a simple electrical cell. (11) What are the magnetic effects of electric current. (12) What is an electro-magnet ? Describe an Electric bell.

ষষ্ঠ অধ্যায়

রসায়ন (Chemistry)

Syllabus :—Separation of mixtures—solution, filtration, crystallisation, distillation, sublimation. Rusting of iron and burning of candle, magnesium and sulphur in a closed volume of air over water. Air, its composition. Properties of Oxygen, Nitrogen, carbon dioxide. Water, its composition. Properties of Hydrogen. Natural and ærated waters. Properties of hard and soft water. Characteristics of chemical compounds.

পূর্ব অধ্যায়ে তোমরা দেখিয়াছ যে, প্রত্যেক জড়, অণু নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। বিভিন্ন কারণে জড়ের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারে। পদার্থবিদ্যায় তোমরা জড়ের যে সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছ, তাহাতে উহার অণুগুলির কোন আভ্যন্তরিক

পরিবর্তন হয় নাই। লৌহকে চুম্বকিত করিলে, অথবা জলকে স্টীমে পরিণত করিলে, লৌহ বা জলের অণুগুলির ধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, জলের অণু ও স্টীমের অণুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু জলকে যখন তাড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক গ্যাসদ্বয়ে বিশ্লেষ করা হয়, (২১৫ পৃঃ দেখ) তখন অলের অণুর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়, কারণ হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের অণুর ধর্ম, জলের অণুর ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে প্রকার পরিবর্তনে জড়ের অণুগুলির ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে **ভৌত পরিবর্তন** (Physical Change) বলে, এবং যে প্রকার পরিবর্তনে জড়ের অণুগুলির ধর্মের পরিবর্তন হয়, তাহাকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** (Chemical Change) বলা হয়। যে শাস্ত্রে জড়ের এই প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন আলোচিত হয়, তাহার নাম **রসায়ন** (Chemistry)।

মিশ্র (Mixture)

কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে কোন অবস্থার দুই বা ততোধিক বিভিন্ন জড়বস্তু **যে কোন অনুপাতে** পরস্পর পাশাপাশি থাকিতে পারে। এরূপ অবস্থান কালে যদি উহাদের মধ্যে কোন **রাসায়নিক পরিবর্তন না হয়,** তাহা হইলে একত্রিত অবস্থায় উহাদিগকে **ভৌত মিশ্র** (Physical বা Mechanical Mixture) কহে। ভৌত মিশ্রের উপাদানগুলিকে অপেক্ষাকৃত **সহজে পৃথক করা যায়**। কতকগুলি পয়সা, কিছু কাঁকর, মৃত্তিকা, লৌহচূর্ণ, লবণ ও করাত গুঁড়া একত্রিত করিয়া একটি ভৌত মিশ্র পাইবে ; কারণ (১) উহাদিগকে যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত করিতে পার, (২) এই প্রকার মিশ্রণে কাঁকর, লবণ

প্রভৃতি মিশ্রিত বস্তুগুলির কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। (৩) উহাদিগকে পুনরায় পৃথক করা সহজ সাধ্য। পয়সাগুলি হাতে করিয়া বাছিয়া লও, এবং চালুনি বা কুলার সাহায্যে কাঁকরগুলি পৃথক কর। একটি চুম্বকের সাহায্যে লৌহচূর্ণগুলিকে আকর্ষণ করিয়া লও। অবশিষ্ট রহিল মৃত্তিকা, লবণ ও করাত গুঁড়া। ইহাদিগকে একপাত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, করাতগুঁড়াগুলি জল অপেক্ষা লঘুভার বলিয়া ভাসিয়া উঠিবে, এখন উহাদিগকে ছাঁকিয়া তুলিয়া লও। এইবার পাত্রে রহিল মৃত্তিকা, লবণ ও জল।

দুইটি পৃথক পাত্রে পরিষ্কার জল হইয়া একটিতে কিছু লবণ এবং অপরটিতে কিছু মৃত্তিকা মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে লবণ জলে গলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জল ও লবণ মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে বা সমসত্ব (Homogeneous) হইয়াছে। কোন বস্তুর জল বা অন্য তরল বস্তুর সহিত সমসত্ব হইয়া মিশ্রণের নাম **দ্রাবণ** (Solution), এবং সেই মিশ্রের নাম **দ্রব**। যে বস্তু তরল বস্তুতে দ্রব হইয়াছে তাহাকে **দ্রাব** (Solute), এবং যে তরল বস্তুতে উহা দ্রব হয় তাহাকে **দ্রাবক** (Solvent) কহে। এস্থলে লবণ দ্রাব এবং জল দ্রাবক। এইবার মৃত্তিকা মিশ্রিত জলপাত্রটিকে পরীক্ষা কর। মৃত্তিকা ও জল সমসত্ব মিশ্র হয় নাই, উহা ঘোলা হইয়া আছে, সুতরাং মৃত্তিকা জলে **দ্রাবণীয়** (Soluble) নহে। অধিকন্তু ইহা জল অপেক্ষা গুরুভার বস্তু, সুতরাং কিছুক্ষণ না নড়াইয়া পাত্রটিকে একস্থানে রাখিয়া দিলে দেখিবে যে মৃত্তিকা ক্রমশ পাত্রের নীচে জমিতেছে, এবং জল ক্রমশ পরিষ্কার হইতেছে।

রসশালার সরল প্রক্রিয়াবলী

যে পাত্রে লবণ, মৃত্তিকা ও জলের মিশ্র ছিল সেই পাত্রেও উক্ত প্রকারে লবণ জলে দ্রবীভূত হইবে, এবং মৃত্তিকা পৃথক হইয়া পাত্রের নিম্নে জমিয়া থাকিবে। এইবার ধীরে ধীরে উপরের তরল পদার্থটিকে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইয়া **অদ্রাবণীয়** (Insoluble) মৃত্তিকাকে পৃথক করিতে পার। এই প্রক্রিয়ার নাম **থিতান** (Decantation)। আর এক প্রক্রিয়ায় অদ্রাবণীয় বস্তুকে তরল বস্তু হইতে পৃথক করা যায়, তাহার নাম **গালন** (Filration)। বালি, কাঠ-কয়লা, মোটা কাপড় প্রভৃতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর উক্ত মিশ্র ঢালিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল চলিয়া যাইবে, কিন্তু মৃত্তিকা যাইতে না পারিয়া উহাদের উপরে পড়িয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়াকে গালন কহে। রসশালায় (Chemical Laboratory) বালি, কাপড় প্রভৃতির পরিবর্তে এই উদ্দেশ্যে গালনকাগজ (Filter-paper) ব্যবহৃত হয়। একটি ফনেলের ভিতর একখানি গালন কাগজ প্রসারিত করিয়া তদুপরি এমন ভাবে উক্ত মিশ্রটি ঢাল, যেন উহা ফনেল ও কাগজের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ না করে। ৬৭নং চিত্র দেখ। ফনেলের নিম্নে একটি বীকার (Beaker) বসাইয়া দাও। বীকারের মধ্যে লবণ মিশ্রিত জল ধীরে ধীরে পড়িতে
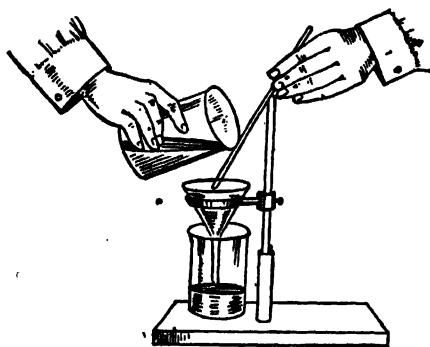
৬৭নং চিত্র

থাকিবে এবং গালনকাগজের উপরে মৃত্তিকা জমিয়া থাকিবে। বীকারে যে পরিষ্কার তরল পদার্থ পতিত হইল তাহাকে **স্যন্দ্যা** (Filtrate) কহে। গালন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকাকে পৃথক করিবার পর স্যন্দ্যাতে রহিল লবণ ও জল। এইবার উক্ত স্যন্দ্যাকে একখানি অনতিগভীর থালায় ঢালিয়া দাও ; খোলা অবস্থায় রাখিয়া দিলে জল ক্রমশ বাষ্প হইয়া যাইবে (Evaporate)। কিছু দিন পরে লক্ষ্য করিলে পাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **কেলাস** (Crystal) জমিতেছে দেখিতে পাইবে। এই সকল কেলাস নির্দিষ্ট আয়তন প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ বড় হইতে থাকিবে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম **কেলাসন** (Crystallisation)। দোবরা চিনি, মিছরি, লবণ, তুঁতে, ফটকিরি, হীরকাদি প্রস্তর প্রভৃতি যে সকল সমসত্ব কঠিন বস্তুর নির্দিষ্ট ও সুসম (Regular) জ্যামিতীয় আকার থাকে তাহাদিগকে স্ফটিক বা কেলাস কহে। ১৬নং চিত্র দেখ।

কতকগুলি বস্তু জলীয় দ্রব হইতে কেলাসে পরিণত হইবার সময় জলের কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কেলাসের মধ্যস্থিত এই প্রকার জলকে **কেলাসনোদক** (Water of Crystallisation) বলে। খাদ্যলবণ (Common Salt) প্রভৃতি কতকগুলি কেলাসে কেলাসনোদক নাই। এইবার কতকগুলি কেলাস লইয়া পরীক্ষা কর, খাদ্য লবণের কেলাসগুলি ঘনকের (Cube) আকার, ফট্‌কিরির কেলাস অষ্টতল (Octahedral)। এইরূপ বিভিন্ন কেলাসের বিভিন্ন আকার আছে।

একটি বীকারে কিছু জল লও এবং উহাতে চিনি ঢালিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে একটি কাচদণ্ডের সাহায্যে চিনি ও জল আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিতে থাক। কিছুক্ষণ চিনি ঢালার পর দেখিবে যে আর চিনি

দ্রাবণীয় হইতেছে না, উহা পাত্রে জমিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নির্দিষ্ট আয়তন দ্রাবকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রাবণীয় বস্তু দ্রব হইতে পারে না। কোন দ্রাবকে যখন যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণ দ্রাব মিশ্রিত থাকে তখন দ্রবকে **সংপৃক্ত** (Saturated) বলা হয়। সংপৃক্ত শর্করাদ্রবে আরও শর্করা মিশ্রিত করা হইলে উহা পাত্রে জমিতে থাকিবে, এই সময় উক্ত পাত্রে তাপ দিয়া দ্রবের উষ্মা বর্ধিত করিলে দেখিবে যে অদ্রাবণীয় শর্করা পুনরায় ক্রমশ দ্রব হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দ্রাবকের উষ্মা বর্ধিত হইলে বস্তুর **দ্রাব্যতা** (Solubility) বর্ধিত হয়। তাপে সমস্ত চিনি দ্রব হইবার পর উহাকে শীতল কর। দ্রবের উষ্মা যত কম হইতে থাকিবে তত চিনি পাত্রে জমিতে থাকিবে।

লবণ ও জলের মিশ্র হইতে কেলাসন প্রক্রিয়ায় লবণ পৃথক করা যায় বটে, কিন্তু জল বাষ্প হইয়া চলিয়া যাইবে। কোন দ্রবের দ্রাব ও দ্রাবক উভয় বস্তু পৃথক ভাবে পাইতে হইলে **পাতন** (Distillation) নামক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়। একটি পাত্রে যখন জল গরম হইতে থাকে, তখন উহা হইতে প্রচুর বাষ্প উত্থিত হইতে দেখা যায়। বাষ্পের উপর একখানি শীতল থালা ধরিলে, উহা পুনরায় জলকণারূপে থালার গাত্রে জমিয়া থাকে। কোন তরলবস্তুকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সেই বাষ্পকে পুনরায় তরলবস্তুতে পরিণত করার নাম পাতন। অতএব দেখিতে পাইতেছ যে পাতন প্রকৃতপক্ষে দুইটি প্রক্রিয়ার সমষ্টি, প্রথম প্রক্রিয়ার নাম **বাষ্পীভবন** (Evaporation) এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম **ঘনীভবন** (Condensation)। রসশালায় পাতনের জন্য সাধারণত দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, (১) বকযন্ত্র (Retort), (২) লেবিগের কনডেনসার (Leibig's Condenser)। বকযন্ত্রের সাহায্যে

কিরূপে পাতন হয়, ৬৮নং চিত্রে দেখ। বকযন্ত্রের মধ্যে একটি দ্রব আছে তাপসংযোগে উহাকে বাষ্পে পরিণত করা হইতেছে, বাষ্প বকযন্ত্রের নলের মধ্য দিয়া ফ্লাস্কের মধ্যে যাইতেছে। ফ্লাস্কের বহির্ভাগ জল ঢালিয়া শীতল রাখা হইতেছে, তাহাতে ফ্লাস্কের অভ্যন্তরস্থ বাষ্পও শীতল হইয়া পুনরায় তরল হইতেছে। বকযন্ত্রের মধ্যে যদি লবণ ও জলের দ্রব দিয়া থাক, তাহা হইলে সমস্ত জল বাষ্পে পরিণত হইয়া শীতল ফ্লাস্কের মধ্যে পুনরায় জলে পরিণত হইবে, কিন্তু লবণ বকযন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে লবণ ও জল সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে পাইবে।
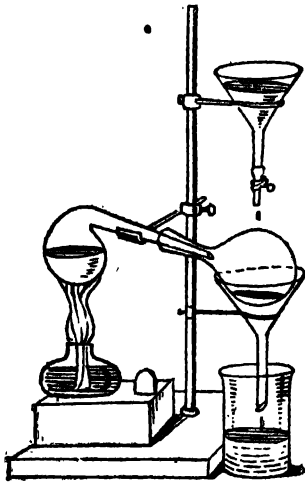
৬৮নং চিত্র

লেবিগের কনডেনসারের সাহায্যেও একই প্রক্রিয়ায় লবণ ও জল পৃথক ভাবে পাইতে পার। ইহাতে তরল মিশ্রকে বকযন্ত্রের পরিবর্তে গাত্রনল বিশিষ্ট একটি ফ্লাস্কে (Flask) উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রকার ফ্লাস্কের নাম পাতন (Distilling) ফ্লাস্ক। ৬৯নং চিত্র দেখ। ফ্লাস্কের নল লেবিগের কনডেনসার নামক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। কনডেনসারের দুইটি অংশ, একটি ভিতরের নল এবং একটি বাহিরের আবরণ বা জ্যাকেট্। ভিতরের নলের এক প্রান্ত পাতন ফ্লাস্কের নলের সহিত সংযুক্ত। জ্যাকেটের দুইদিকে দুইটি শাখী নল আছে। নীচের শাখানল জলের কলের সহিত

সংযুক্ত করা হয়, কলের জল ক্রমশ উপরে উঠিয়া উপরের শাখানল দিয়া বাহির হইয়া যায়। যতক্ষণ না প্রক্রিয়া শেষ হয় ততক্ষণ জল অবিরত কল হইতে জ্যাকেটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং উপরের নল দিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে ভিতরের নলকে
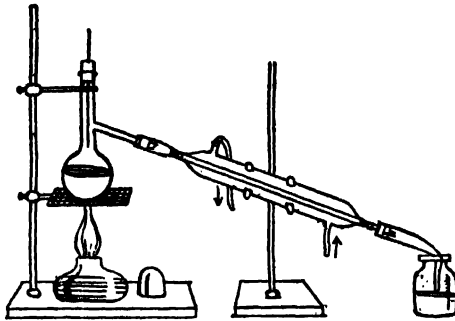
৬৯নং চিত্র

সর্বদা শীতল রাখা হয়। পাতন ফ্লাস্ক হইতে বাষ্প ভিতরের শীতল নল দিয়া গমন করিবার সময় জলে পরিণত হইয়া উহার অপর প্রান্ত দিয়া পড়িতে থাকে। সেই সময় উহা একটি আধারে সঞ্চয় করা হয়। বকযন্ত্রে ও কনডেনসারে একই প্রণালীতে পাতন সম্পন্ন হয়, প্রভেদের মধ্যে বকযন্ত্রে বাষ্পকে আধারের মধ্যে এবং কনডেনসারে নলের মধ্যে শীতল করিয়া ঘনীভূত করা হইয়া থাকে।

(তোমরা জান যে উত্তপ্ত হইলে কঠিনবস্তু প্রথমে তরল অবস্থায় এবং আরও অধিক তাপে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু কর্পূর প্রভৃতি এমন কতকগুলি কঠিন বস্তু আছে, যাহারা তাপ সংযোগে তরল অবস্থায় পরিণত না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল বস্তুকে **উদ্বায়ী** (Volatile) কঠিনবস্তু কহে। পাতনের সাহায্যে

যে কোন মিশ্র হইতে জলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা যায় বটে, কিন্তু উদ্বায়ী বস্তু মিশ্রিত থাকিলে উহাকে পৃথক করা যায় না, কারণ জল বাষ্পীভূত হইবার পূর্বেই উদ্বায়ী বস্তু বাষ্প হইয়া আধারে বা কনডেনসারের নলে চলিয়া যায়, এবং পাতিত জল পুনরায় তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। **উধ্বর্পাতন** (Sublimation) নামক প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদ্বায়ী কঠিন বস্তুকে পৃথক করা হয়। একটি পাত্রে কর্পূর ও সুরকি মিশ্রিত কর, মিশ্রের বর্ণ লাল হইবে। এক্ষণে কর্পূর ও সুরকিকে যদি পৃথক করিতে চাও, তাহা হইলে মিশ্রকে একটি খর্পরের (Basin) মধ্যে রাখিয়া আর একখানি খর্পর এমনভাবে চাপা দাও যেন উভয় খর্পরের সংযোগ স্থলে ফাঁক না থাকে। উপরের খর্পরখানির বহির্দিকে শোষককাগজ বা গামছা চাপা দাও। ৭০নং চিত্র দেখ। প্রথম খর্পরখানিকে চাপা সমেত উত্তপ্ত তারজালীর (Wire Gauze) উপর বসাইয়া দিয়া শোষক কাগজ বা গামছার উপর ধীরে ধীরে জল ঢালিতে থাক।

৭০নং চিত্র

কিছুক্ষণ এইরূপ করিবার পর উপরের খর্পরখানি তুলিয়া লইলে দেখিবে যে, নিম্নের খর্পরে কেবল সুরকি পড়িয়া আছে এবং উপরের খর্পরের ভিতরদিকে, অর্থাৎ অবতল পৃষ্ঠে তুষারশুভ্র কর্পূরের সূক্ষ্ম কেলাস সমূহ জমিয়া আছে। পাতনের ন্যায় উধ্বর্পাতনও বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যে প্রক্রিয়ায় কোন উদ্বায়ী কঠিন বস্তুকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ও পরে ঘনীভূত

করিয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত করা হয় তাহার নাম **ঊর্ধ্বপাতন।**

লৌহের মরিচা

পুরাতন লৌহে জং বা মরিচা ধরে তাহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ কিছুদিন আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে লৌহ এক প্রকার ভঙ্গুর লোহিতাভ পিঙ্গল বর্ণের বস্তুতে পরিণত হয়, উহার নাম **মরিচা** (Rust)। অধিক মরিচা ধরা লৌহের মরিচাগুলি ঝরিয়া পড়িলে লৌহের সেই অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়, সুতরাং লৌহই যে মরিচায় পরিণত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বড় বড় মরিচাগুলি দেখিতে লৌহের আঁশের ন্যায়। কতকগুলি মরিচার আঁশ সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, উহাদিগকে লৌহের ন্যায় পিটিয়া পাত বা টানিয়া তার করা যায় না, উহারা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং লৌহের ন্যায় চুম্বক কর্তৃক পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং মরিচায় পরিণত হইবার পর লৌহের বিশেষ ধর্মগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়। এক্ষণে লৌহ কিরূপে মরিচায় পরিবর্তিত হইল তাহা দেখা যাউক। তিনটি পরীক্ষা নল (Test Tube) লও। প্রথমটিতে কিছু জল লইয়া ফুটাও। (ফুটাইলে জলের মধ্যস্থ দ্রবীভূত বায়ু বাহির হইয়া যায়)। জলের মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল নূতন লৌহপেরেক নিক্ষেপ কর এবং পুনরায় একটু ফুটাও। অতঃপর জলের মধ্যে একটু গলিত মোম ঢালিয়া দাও। এক্ষণে মোমের নিম্নে জল ও পেরেক রহিল, কিন্তু একটুও বায়ু নাই; মোমে ঢাকা থাকিলে পরেও উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় নলের মধ্যে একটু জল ও কতকগুলি উজ্জ্বল পেরেক রাখ। এই নলটিতে জল,

পেরেক ও বায়ু রহিল। তৃতীয় নলটিকে বেশ করিয়া শুষ্ক কারয়া লও, তন্মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল পেরেক রাখিয়া নলটিকে শোষকাধারের (Desiccator) মধ্যে রাখিয়া দাও। শোষকাধারের মধ্যে বায়ু সর্বদা শুষ্ক থাকে। এই নলটিতে শুষ্ক বায়ু ও পেরেক ভিন্ন আর কিছুই নাই এবং পরেও উহা শুষ্ক থাকিবে। কিছু দিন এই ভাবে রাখিবার পর তিনটি নলের মধ্যস্থ পেরেকগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে প্রথম ও তৃতীয় নলের পেরেকগুলিতে মরিচা ধরে নাই, কেবল দ্বিতীয় নলের পেরেকগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লৌহকে মরিচায় পরিবর্তিত করিবার জন্য জল ও বায়ু উভয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। এস্থানে জল ও বায়ু কেবল দর্শকের ন্যায় উপস্থিত থাকে না, উহারা লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া মরিচা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ মরিচার মধ্যে যে কেবল লৌহ আছে তাহা নহে, উহাতে লৌহ, বায়ুর অক্সিজেন এবং জল যুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। বালি, চিনি, লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যখন ভৌত মিশ্র (Mechanical Mixture) প্রস্তুত করিয়াছিলে, তখন উহাদের নিজস্ব ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় নাই; এক্ষেত্রে কিন্তু লৌহ, জল ও অক্সিজেনের ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহার নাম **রাসায়নিক পরিবর্তন**। এই রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে নূতন ধর্মের নূতন বস্তু (মরিচা) উৎপন্ন হইয়াছে। দুই বা ততোধিক বস্তু একত্রিত হইলে যদি তাহাদের ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া নূতন ধর্ম বিশিষ্ট নূতন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই প্রকার একত্রিত হওয়াকে **রাসায়নিক সংযোগ** (Chemical Combination) বলে।

দহন (Combustion)

একটি অর্ধজলপূর্ণ দ্রোণী বা নিউম্যাটিক ট্রাফে (Pneumatic Trough) একখানি পুরু কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া দাও এবং উহার উপর একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখ। বাতিটি যত জ্বলিবে উহার আকার তত হ্রাস হইবে। এইবার একটি বড় বেলজার (Bell Jar) উল্টাইয়া এমনভাবে ট্রাফের ভিতর রাখ যেন উহা কাঠ সমেত বাতিকে ঢাকা দেয়। বাতির আলোক ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া, দুই এক মিনিটের মধ্যে বাতিটি নির্বাপিত হইবে। এক্ষণে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে বেলজারের গাত্রের অভ্যন্তর ঘোলা দেখাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বেলজারটি শীতল হইলে দেখিবে যে উহার মধ্যে কিছু জল উঠিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে বেলজার চাপা দেওয়াতে বাতিটি নির্বাপিত হইল কেন? এবং দুই এক মিনিট পরে নির্বাপিত হইল কেন? বাতির দহনের জন্য এমন একটি বস্তুর প্রয়োজন, যাহা বায়ুতে আছে। সেইজন্য চাপা দিবার পূর্বে বাতিটি বেশ জ্বলিতেছিল; সেই বস্তুটি বেলজারের মধ্যস্থ বায়ুতেও অল্প পরিমাণে ছিল, সেইজন্য বাতিটি ২।১ মিনিট জ্বলিয়াছিল, এবং পরে উহার অভাব হওয়াতে বাতিটি নির্বাপিত হইল। সেই বস্তুটি অক্সিজেন নামক গ্যাস। দুই এক মিনিট পরে উহা ফুরাইয়া গেল কেন? বাতির দগ্ধ হওয়ার অর্থ, অক্সিজেনের সহিত বাতির কার্বণের রাসানিক সংযোগ, এবং তাহার ফলে তাপ ও আলোক উৎপাদন। বাতির কার্বণ বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বণডাইঅক্সাইড নামক একটি নূতন ধর্মের নূতন গ্যাসীয় বস্তু উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন গ্যাসের কতকাংশ জলে দ্রব হওয়ায় জারের মধ্যে জল উঠিয়া সেই অংশ পূর্ণ করিয়াছে। জারের ভিতর দিক্ প্রথমে যে

ঘোলা দেখায়, তাহার কারণ বায়ুর জলীয় বাষ্প জলকণারূপে বেল-জারের ভিতরের শীতল গাত্রে জমিয়া থাকে।

এইবার একটি চীনামাটির মুচিতে (Crucible) কতকগুলি ম্যাগনেসিয়ম তারের টুক্‌রা লও। (বাঁজীর দোকানে যে "বিজলী তার" পাওয়া যায় তাহা ম্যাগনেসিয়মের তার)। মুচিটিকে একটি ট্রাফের জলে ভাসাইয়া দাও এবং তারগুলিকে জ্বালাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বেলজার চাপা দাও। ম্যাগনেসিয়ম অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া বায়ুতে দগ্ধ হয়। চাপা দিলে দেখিবে যে বেলজারটি শুভ্র ধূমে পূর্ণ হইয়া অনচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শীতল হইলে দেখিবে যে এবারেও বেলজারের মধ্যে জল উঠিয়াছে। দগ্ধকালে ম্যাগনেসিয়ম বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়, এই সূক্ষ্ম চূর্ণগুলিকে শুভ্র ধূমরূপে দেখিয়াছিলে। উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়মের ভস্ম (Calx) কঠিন বস্তু, এবং উহা অতি অল্প স্থান অধিকার করে, সেইজন্য বেলজারের মধ্যে কিছু স্থান শূন্য হইয়াছে, এবং ট্রাফের জল বেলজারের মধ্যে উঠিয়া সেইস্থান পূর্ণ করিয়াছে।
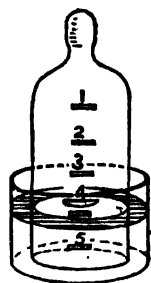
৭১ নং চিত্র

দহন (Combustion) বলিতে যদিও সাধারণত অক্সিজেনের সহিত কোন বস্তু যুক্ত হইয়া তাপ ও আলোক উৎপন্ন করা বুঝায়, কিন্তু অক্সিজেন ব্যতীতও দহন (তাপ ও আলোক উৎপাদনকারী রাসায়নিক সংযোগ) হইতে পারে। দগ্ধ হইবার সময় ম্যাগনেসিয়ম বায়ুর কেবল অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া ক্ষান্ত হয় না, উহা অধিক উত্তাপে নাইট্রোজেন ও কার্বণডাইঅক্সাইডের সহিতও যুক্ত

হইয়া থাকে। সাধারণত দহনের সময় দাহ্য বস্তু অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়, কিন্তু ম্যাগনেসিয়মে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম, সুতরাং যে কোন রাসায়নিক সংযোগের ফলে যদি তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই উক্ত সংযোগকে **দহন** (Combustion) বলা হয়।

কোন বস্তুর সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগের নাম **জারণ** (Oxidation)। মরিচায় লৌহের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়াছে ; বাতি, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতির বায়ুতে দহন কালেও কার্বণ, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি বস্তুর সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিকে লৌহের, কার্বণের ও ম্যাগনেসিয়মের জারণ বলিতে পার। সমস্ত জারণের সময় যে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় তাহা নহে ; মরিচা উৎপন্ন হইবার সময়, অর্থাৎ লৌহের জারণের সময় আলোক উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং উহাকে দহন বলিতে পার না।

এইবার একটি চীনামাটির মুচিতে কিছু গন্ধক (Sulphur) জ্বালাইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে জলের উপর বেলজার ঢাকা দাও। ট্রাফের জল-পৃষ্ঠের উপর জারের যে অংশ আছে, তাহাকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখ। গন্ধক কিছুক্ষণ ক্ষীণ নীল আলোক বিকিরণ করিয়া নির্বাপিত হইবে। জারটি শীতল হইলে দেখিবে যে ট্রাফের জল জারের মধ্যে উঠিয়া উহার পাঁচভাগের একভাগ পূর্ণ করিয়াছে। গন্ধক দগ্ধ হইলে, অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইলে সালফার-ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাস জলে সম্পূর্ণ দ্রাবণীয়। জারের মধ্যে বায়ুতে যে ঘনায়তন পরিমাণ অক্সিজেন ছিল, তাহা গন্ধকের সহিত যুক্ত হইয়া জলে দ্রব হওয়ায় জারের সেই পরিমাণ স্থান শূন্য হইয়াছে, এবং শূন্যস্থান জলে পূর্ণ হইয়াছে অতএব শূন্যস্থানের ঘন

পরিমাণ জারের বায়ুর ঘন পরিমাণের পাঁচভাগের একভাগ ; সুতরাং আয়তনানুসারে বায়ুতে পাঁচভাগের একভাগ অক্সিজেন থাকে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাভয়সিঁয়ে (Lavoisier) দেখান যে, কোন বস্তু জারিত হইলে তাহার ওজন বর্ধিত হয়, এবং এই ওজনবৃদ্ধির পরিমাণ সংযুক্ত অক্সিজেনের ওজনের সমান। দহনকালে যতটুকু গন্ধক ও অক্সিজেনের সংযোগ হইয়াছে তাহাদের ওজনের সমষ্টি, উৎপন্ন সালফার-ডাইঅক্সাইডের ওজনের সমান। এই প্রকারে তিনি প্রমাণ করেন যে দহনকালে যদিও আমরা গন্ধক, বাতি, অক্সিজেন প্রভৃতি বস্তুর পরিমাণ হ্রাস হইতে দেখি, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহাদের বিন্দুমাত্র লুপ্ত বা নষ্ট হয় না, সংযুক্ত অবস্থায় উহারা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ জড়সমূহ **অনশ্বর** (Indestructible)। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ায় জড়ের অনশ্বরত্ব প্রমাণ করা যায়।

রাসায়নিক সংযোগ

জড় বস্তুগুলিকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। লৌহ, গন্ধক, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি বস্তুগুলিকে যতই ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর না কেন, উহাদিগের ভিতর হইতে বিভিন্ন ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট অন্য কোন বস্তু প্রাপ্ত হইবে না। লৌহ বা অক্সিজেনের ক্ষুদ্রতম অংশেও লৌহ বা অক্সিজেনের সমস্ত ধর্ম থাকিবে। এই প্রকার যে সকল বস্তুকে বিশ্লেষ করিয়া দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাদিগকে **মৌলিক বস্তু** (Elements) কহে। মরিচাকে বিশ্লেষ করিয়া কিন্তু লৌহ, অক্সিজেন ও জল নামক তিনটি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বস্তু প্রাপ্ত হইবে ; জলকে বিশ্লেষ করিয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুইটি ধর্মবিশিষ্ট বস্তু

পাইবে। একটি বীকারে কিছু তুঁতে (Copper Sulphate) জলে দ্রব কর এবং উক্ত দ্রবে একখানি লৌহ ছুরিকার উজ্জ্বল ফলা নিমজ্জিত করিয়া রাখ। পরদিন দেখিবে যে ছুরির গাত্রে লোহিত বর্ণের তাম্রকণা পরিন্যস্ত হইয়াছে। তুঁতে বিশ্লিষ্ট হইয়া তাম্র-উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তুঁতে ও তাম্রের ধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মরিচা, জল, তুঁতে, কার্বণডাইঅক্সাইড, ম্যাগ্নেসিয়মভস্ম প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বস্তুতে বিশ্লেষ করা যায় তাহাদিগের নাম **যৌগিক বস্তু** (Compounds)। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৯০টি মৌলিক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিবার বা লিখিবার জন্য প্রত্যেক মৌলিক বস্তুর এক একটি **চিহ্ন** (Symbol) দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে চিহ্ন সমেত কতকগুলিমাত্র মৌলিক বস্তুর নাম দেওয়া হইল।

মৌলিক বস্তু	চিহ্ন	মৌলিক বস্তু	চিহ্ন
অক্সিজেন (Oxygen)	O.	পারদ (Mercury)	Hg.
নাইট্রোজেন (Nitrogen)	N.	লৌহ (Iron)	Fe.
হাইড্রোজেন (Hydrogen)	H.	তাম্র (Copper)	Cu.
ক্লোরিণ (Chlorine)	Cl.	দস্তা (Zinc)	Zn.
কার্বণ (Carbon)	C.	ম্যাংগেনিস্ (Manganese)	Mn.
গন্ধক (Sulphur)	S.	ম্যাগ্নেসিয়ম্ (Magnesium)	Mg.
ফস্ফরাস্ (Phosphorus)	P.	ক্যাল্সিয়ম্ (Calcium)	Ca.
স্বর্ণ (Gold)	Au.	সোডিয়ম্ (Sodium)	Na.
রৌপ্য (Silver)	Ag,	পটাসিয়ম্ (Potassium)	K.

৯০টি মৌলিক বস্তু হইতে অসংখ্য প্রকার যৌগিক বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্দিকে আমরা যে সকল জড় দেখিতে পাই,তাহাদের অধিকাংশই যৌগিক। কোন জড়বস্তুকে বিভক্ত করিতে করিতে কতকগুলি ক্ষুদ্রতম

অংশ পাওয়া যায়, এই সকল অংশ মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে, এবং উহাদিগের মধ্যে সেই জড়ের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। কোন মৌলিক বা যৌগিক বস্তুর যে সকল ক্ষুদ্রতম সমধর্মাবলম্বী অংশ মুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহাদিগকে সেই বস্তুর **অণু** (Molecule) কহে।

ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও অণুগুলি অবিভাজ্য নহে, তাহারা পরমাণু নামক অধিকতর ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে; পরমাণুগণ কিন্তু মুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। পরমাণুগুলি অবিভাজ্য, ইহাদিগকে আর বিভক্ত করা যায় না। (সম্প্রতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, পরমাণুগুলিও অবিভাজ্য নহে, প্রত্যেক পরমাণু কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনে গঠিত, উপস্থিত আমরা কিন্তু পরমাণুগণকে অবিভাজ্য বলিয়াই ধরিয়া লইব)। মৌলিক বস্তুগণের যে সকল অবিভাজ্য, চরম ক্ষুদ্রাংশ, পৃথকভাবে বা অযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে না, তাহাদিগকে **পরমাণু** (Atoms) বলা হয়। সকল বস্তুর অণুতে সম সংখ্যক পরমাণু থাকে না। লৌহের প্রত্যেক অণুতে একটি করিয়া লৌহের পরমাণু থাকে, অক্সিজেনের একটি অণুতে দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু আছে, জলের প্রত্যেক অণুতে দুইটি হাইড্রোজেনের ও একটি অক্সিজেনের, সর্বসমেত তিনটি পরমাণু বিদ্যমান। কোন্ বস্তুর অণুতে কোন্ মৌলিক বস্তুর কতগুলি পরমাণু যুক্ত আছে তাহা মৌলিক উপাদানের চিহ্নগুলির সাহায্যে দেখান যাইতে পারে, ইহাকে **আণবিক সূত্র** (Molecular Formula) বলে। অক্সিজেনের আণবিক সূত্র O_2, অর্থাৎ একটি অক্সিজেনের অণুতে উহার দুইটি পরমাণু আছে। লৌহের আণবিক সূত্র $= Fe$, জল $= H_2O$ লৌহের মরিচা $= 2Fe_2O_3, 3H_2O$ ইত্যাদি।

হাইড্রোজেনের পরমাণু সর্বাপেক্ষা লঘু, সেইজন্য সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন, হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের তুলনায় ধরা হয়। হাইড্রোজেনের **পারমাণবিক ওজন** (Atomic Weight) ১ ধরা হইলে, কার্বণ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও লৌহের পারমাণবিক ওজন যথাক্রমে ১২, ১৪, ১৬ এবং ৫৫। কোন বস্তুর আণবিক সূত্র ও উপাদানগুলির পারমাণবিক ওজন জানা থাকিলে বস্তুর **আণবিক ওজন** (Molecular Weight) জানা যায়। জলের আণবিক সূত্র H_2O; হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন ১, সুতরাং H_2 = ২, O = ১৬, ∴ H_2O = ২ + ১৬ = ১৮; অর্থাৎ জলের আণবিক ওজন ১৮।

যে প্রক্রিয়ার কোন বস্তুর সংযুতির (Composition) পরিবর্তন ঘটে, তাহার নাম **রাসায়নিক ক্রিয়া** (Chemical Action), অর্থাৎ দুই বা ততোধিক জড়ের অণু একত্রিত হইলে যে প্রক্রিয়ায় উহাদের অন্তর্গত পরমাণুগণের অবস্থানের পরিবর্তন হয়, তাহাকে রাসায়নিকক্রিয়া কহে। রাসায়নিকক্রিয়া নানাভাবে হইতে পারে। বাতির দহন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া, ইহাতে অক্সিজেন কার্বণের সহিত যুক্ত হয়। জলের বিশ্লেষণও একটি রাসায়নিক ক্রিয়া, ইহাতে জল হইতে অক্সিজেন বিযুক্ত হয়। মর্মর প্রস্তর ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত হইলে উভয় বস্তুর বিশ্লেষ ও সংযোগের ফলে তিনটি বস্তু উৎপন্ন হয়। সংযোগ বা বিশ্লেষ কিছু না হইয়াও রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরমাণুগুলি ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত হইয়া অণুকে নূতন ধর্ম প্রদান করিতে পারে। অতএব দেখিতে পাইলে যে সংযোগ, বিশ্লেষ প্রভৃতি সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তন, বস্তুগুলির পরস্পরের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে সংঘটিত হয়।

অণুগুলির সূত্রের সাহায্যে, যে সাংকেতিক প্রণালীতে রাসায়নিক

ক্রিয়া জ্ঞাপন করা হয়, তাহার নাম **রাসায়নিক সমীরণ** (Chemical Equation)। S (গন্ধকের অণু) $+O_2$ (অক্সিজেনের অণু) $=SO_2$ (সালফার ডাইঅক্সাইডের অণু)। $2H_2O=2H_2+O_2$; অর্থাৎ দুইটি জলের অণু বিশ্লিষ্ট হইয়া দুইটি হাইড্রোজেনের এবং একটি অক্সিজেনের অণু উৎপন্ন হয়।

এই স্থানে আমরা রসায়নের দুইটি মূল ভিত্তির বিষয় উল্লেখ করিব। এই দুই প্রধান ভিত্তির উপর প্রায় সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের একটির নাম আভোগাড্রোর অনুমান (Avogadro's Hypothesis), এবং অপরটির নাম ড্যাল্টনের পারমাণবিক বাদ (Dalton's Atomic Theory)। আভোগাড্রো অনুমান করেন যে, সম উষ্মা ও চাপের অধীনে সমস্ত গ্যাসীয় বস্তুতে সম সংখ্যক অণু বিদ্যমান থাকে। সম উষ্মা ও চাপের অধীনে থাকিলে এক ঘন ইঞ্চি অক্সিজেনে উহার যতগুলি অণু থাকে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনে, কার্বণ ডাইঅক্সাইডে, বা জলীয়বাষ্পেও উক্ত বস্তুসমূহের ঠিক ততগুলি করিয়া অণু থাকে।

দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে হিন্দুঋষিগণ পরমাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে জন ড্যাল্‌টন তাঁহার "A New System Of Chemical Philosophy" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখান যে, (১) প্রত্যেক মৌলিক বস্তু প্রচুর সংখ্যক পরমাণু নামক অবিভাজ্য অংশে গঠিত। (২) কোন মৌলিক বস্তুর অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণুর ওজনাদি-ধর্ম সমান, (৩) কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক বস্তুর অন্তর্গত পরমাণু-দিগের ধর্ম বিভিন্ন। (৪) মৌলিক বস্তুগণের এক বা একাধিক পূর্ণ সংখ্যক পরমাণু যুক্ত হইয়া রাসায়নিক সংযোগ হয়। তিনি আরও দেখান যে (৫) মৌলিক বস্তুগণ সুনির্দিষ্ট ওজনানুপাতে সংযুক্ত হয়,

এবং (৬) এই অনুপাত, সংযুক্ত পরমাণুদিগের ওজনের অনুপাতের সমান। উদাহরণ স্বরূপ (১) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, যথাক্রমে অনেকগুলি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুতে গঠিত, (২) হাইড্রোজেনের প্রত্যেক পরমাণুর ওজনও অন্যান্য ধর্ম সমান, কিন্তু (৩) হাইড্রোজেন পরমাণুর ও অক্সিজেন পরমাণুর ওজনাদি ধর্ম বিভিন্ন। (অক্সিজেন পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ১৬ গুণ)। (৪) দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু সংযুক্ত হইয়া একটি জলের অণু হয়। পরমাণুগণ ভগ্ন সংখ্যায় যুক্ত হয় না। (৫) ওজনানুসারে ৮ ভাগ অক্সিজেন ও ১ ভাগ হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া ৯ ভাগ জল উৎপন্ন হয়, এই নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হয় না। (৬) দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজনের অনুপাতও ১ : ৮।

দুই বা ততোধিক মৌলিক বস্তুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, কতকগুলি বিভিন্ন বস্তু একত্রিত হইলে যদি উহাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক সংযোগ না হয়, তাহা হইলে একত্রিত বস্তুগণকে ভৌত মিশ্র বলে। এক্ষণে আমরা রাসায়নিক সংযোগের বিশেষত্ব কি, অর্থাৎ ভৌত মিশ্র ও যৌগিক বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কি তাহা দেখিব। **প্রথমত,** আমরা দেখিয়াছি যে ভৌত মিশ্রের উপাদানগুলির ধর্ম, মিশ্রণের ফলে পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু যৌগিক বস্তুর উপাদানগুলির ধর্ম সংযোগের ফলে পরিবর্তিত হয়। **দ্বিতীয়ত,** আমরা আরও দেখিয়াছি যে ভৌত মিশ্রের উপাদান-গুলিকে মিশ্র হইতে সহজে পৃথক করা যায়, কিন্তু যৌগিক বস্তুর উপাদানগুলিকে অত সহজে পৃথক করা যায় না। **তৃতীয়ত,** আমরা যে কোন অনুপাতে উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করিতে পারি, অর্থাৎ

যত ইচ্ছা বালির সহিত যত ইচ্ছা চিনি মিশ্রিত করিয়া মিশ্র প্রস্তুত করিতে পারি বা ভৌত মিশ্রে উপাদানগুলি যে কোন অনুপাতে (ওজনানুসারে) যুক্ত হয়। **চতুর্থত,** ভৌত মিশ্র প্রস্তুত কালে কোন তাপীয় (Thermal) পরিবর্তন হয় না, কিন্তু যৌগিক বস্তুর উপাদান-গুলির সংযোগকালে অল্পবিস্তর তাপীয় পরিবর্তন হইয়া থাকে। তাপীয় পরিবর্তন অল্প হইলে সাধারণত আমরা অনুভব করিতে পারি না। সেইজন্য মরিচা উৎপাদনের সময় আমরা উহা লক্ষ্য করি না, কিন্তু দহনের সময় উহা বেশ অনুভব করিতে পারি। এক পাত্র জলে একটু পাথুরে চূণ ফেলিলে দেখিবে যে উহা ফুটিতে থাকে, সেই সময় পাত্রটিকে স্পর্শ করিলে বুঝিতে পারিবে যে উহা বেশ উত্তপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহারা **সংযুক্ত হইতেছে, মিশ্রিত হইতেছে না।** রাসায়নিক সংযোগের সময় তাপ যে কেবল **উৎপন্ন** হয় তাহা নহে, উহা **বিশোষিতও** (Absorbed) হইতে পারে। এইস্থানে একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে কেবল সংযোগের সময় নহে, যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় তাপ, আলোক অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোন না কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে।

বায়ু

আমরা যে বায়ুসমুদ্রে বাস করি তাহার প্রধান উপাদান **অক্সিজেন** ও **নাইট্রোজেন**। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে **কার্বণ ডাইঅক্সাইড, আর্গন** (Argon), **ক্রিপ্‌টন্** (Krypton), **জেনন্** (Xenon), **হিলিয়ম্** (Helium) **নিয়ন্** (Neon) প্রভৃতি গ্যাস সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ যে বায়ুতে অল্পাধিক পরিমাণে **জলীয়বাষ্পও** থাকে। এই সকল গ্যাসীয় বস্তু ব্যতীত বায়ুতে, বিশেষত

কারখানাবহুল ও জনবহুল স্থানের বায়ুতে **ধুলি, জীবাণু** প্রভৃতি নানাপ্রকার সূক্ষ্ম কঠিন বস্তু আবর্জনারূপে ভাসমান থাকে।

আয়তানুসারে পাঁচ ভাগ বায়ুতে মোটামুটি চারি ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন থাকে। উপরে বায়ুর যে সকল উপাদানের নাম করা হইল, তন্মধ্যে জলীয় বাষ্প ও কঠিন বস্তুর পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই, উহাদের পরিমাণ, স্থান এবং কালভেদে অল্প বা অধিক হয়। ইহাদিগকে বাদ দিলে অর্থাৎ আবর্জনাহীন শুষ্ক বায়ুতে অন্য উপাদানগুলি আয়তানুসারে কিরূপ অনুপাত থাকে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

অক্সিজেন	...	২০.৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	...	৭৮.৫৬ "
কার্বণ ডাইঅক্সাইড	...	০.০৪ "
অন্য গ্যাস	...	০.৮০ "
		১০০.০০ "

তোমরা জান যে যৌগিক বস্তুর উপাদানগুলির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না, উহারা নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়; অতএব বায়ুকে যৌগিক বস্তু বলা যায় না, উহা মিশ্র বস্তু; অধিকন্তু একটি পাত্রে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত করিলে উহা সর্বাংশে বায়ুর কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ উহা বায়ুতে পরিণত হইবে, কিন্তু এরূপ মিশ্রণের সময় কোন তাপীয় বা আয়তনের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু তোমরা জান যে গ্যাসীয় বস্তুগণের রাসায়নিক সংযোগের সময় কোন প্রকার তাপীয়, এবং কখন কখন উহাদের আয়তনের পরিবর্তন হয়; সুতরাং বায়ু যৌগিক বস্তু হইতে পারে না। আরও দেখ বায়ুর উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়; অক্সিজেন অপেক্ষা লঘু বলিয়া, সছিদ্র (Porous) নলের মধ্য দিয়া

নাইট্রোজেন অক্সিজেনের পূর্বে বাহির হইয়া যায়। তরল বায়ু যখন বাষ্পীভূত হয় তখন অধিকতর উদ্বায়ী নাইট্রোজেন প্রথমে বাষ্পীভূত হইয়া থাকে ; বায়ু যৌগিক হইলে উহারা এত সহজে পৃথক হইত না। কার্বণের দহন বা জীবের শ্বসন ক্রিয়ার ফলে বায়ুর অক্সিজেন কমিয়া যায় এবং কার্বণডাইঅক্সাইড বর্ধিত হয়। উদ্ভিদের কার্বণ স্বাঙ্গীকরণের ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ বর্ধিত ও কার্বণডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস হয়। বায়ুর আর্দ্রতা সকল স্থানে ও সকল সময় সমান থাকে না। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বায়ু একটি ভৌতমিশ্র, রাসায়নিক যৌগিক বস্তু নহে।
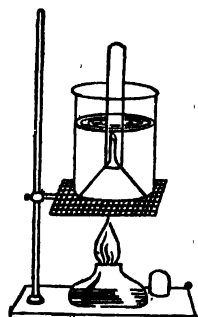
৭২নং চিত্র

৭২নং চিত্রের ন্যায় একটি বীকারের মধ্যে একটি ফনেল উল্টা করিয়া রাখ। ফনেলের নলের উপর পর্যন্ত বীকারকে জলপূর্ণ কর। একটি পরীক্ষা নল জলপূর্ণ করিয়া ফনেলের উপর উল্টা করিয়া রাখিয়া দাও। এইবার বীকারের জল ফুটাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে, পরীক্ষানলের উপরে গ্যাস জমিয়াছে, এই গ্যাস বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে সাধারণ বায়ুতে যে অনুপাতে অক্সিজেন থাকে, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে উক্ত গ্যাস বিদ্যমান আছে। বায়ু জলে দ্রব ছিল এবং নাইট্রোজেন অপেক্ষা অক্সিজেন জলে অধিকতর দ্রাবণীয় বলিয়া পরীক্ষানলের বায়ুতে অধিক অনুপাতে অক্সিজেন বিদ্যমান আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বায়ু সামান্য পরিমাণে জলে দ্রাবণীয়।

এইবার আমরা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বণডাইঅক্সাইড্ নামক বায়ুর তিনটি গ্যাসীয় উপাদানের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অক্সিজেন

চিহ্ন—O ; আণবিক সূত্র—O_2 ; পারমাণবিক ওজন—১৬।

বায়ুর উক্ত সমস্ত উপাদানের মধ্যে অক্সিজেন আমাদিগের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা ব্যতীত জীবগণ বাঁচিতে পারে না, সেইজন্য ইহাকে প্রাণবায়ু (Vital Air) বলা হয়। তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছ যে জীবমাত্রের জীবনধারণের জন্য শ্বসন অপরিহার্য। শ্বাস ক্রিয়ায় বায়ু হইতে অক্সিজেন গৃহীত হয়, এবং সেই অক্সিজেন দৈহিক কার্বণের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বণডাই-অক্সাইডে পরিণত ও বায়ুতে পরিত্যক্ত হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি কার্বণপ্রধান বস্তুসমূহ দগ্ধ হইবার সময় বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত কার্বণ-যুক্ত হইয়াও কার্বণডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়, এইরূপে পৃথিবীতে নিয়ত কার্বণডাইঅক্সাইড্ উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুতে অতিরিক্ত অনুপাতে কার্বণডাইঅক্সাইড থাকিলে উহা শ্বাসক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়, এমন কি জীবগণের প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটে। তোমরা দেখিয়াছ যে উদ্ভিদ্গণ কার্বণডাইঅক্সাইডের কার্বণ অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। প্রধানত এই উপায়ে বায়ুতে অতিরিক্ত অনুপাতে এই গ্যাস জমিতে পায় না। দহনের সময় বাতির কার্বণ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া যে কার্বণডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় তাহা তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ। গন্ধকাদি কার্বণহীন বস্তুর দহনের সময়ও যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তাহাও তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ।

বায়ু হইতে, এবং জলকে তাড়িৎবিশ্লেষ করিয়া অক্সিজেন পাওয়া

যায় তাহা তোমরা পূর্বেই দেখিয়াছ। এতদ্ভিন্ন অক্সিজেনযুক্ত নানাবিধ যৌগিক বস্তু বিশ্লেষ করিয়া অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। রসশালায় সাধারণত **পটাসিয়ম ক্লোরেট** (কলরাপটাস) নামক লবণ হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত লবণে যথেষ্ট অক্সিজেন যুক্ত আছে ; তাপের সাহায্যে উহাকে পৃথক করা হয়। পটাসিয়ম্-ক্লোরেটের রাসানিক সূত্র—$KCLO_3$। নিম্নলিখিত সমীকরণে উহার বিশ্লেষ দেখান হইতেছে,

$$2KCLO_3 = 2KCL + 3O_2$$
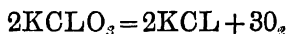
অর্থাৎ পটাসিয়ম ক্লোরেটের দুইটি অণু বিশ্লিষ্ট হইয়া দুইটি পটাসিয়ম ক্লোরাইড এবং তিনটি অক্সিজেন অণু উৎপন্ন হয়।

একটি শক্ত কাচ নির্মিত পরীক্ষানলের মধ্যে ৪ ভাগ পটাসিয়ম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাংগানিস্ ডাইঅক্সাইড চূর্ণের মিশ্র লও। একটি কাচের নল সমেত কর্কের ছিপি দ্বারা নলের মুখটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দাও। একটি দ্রোণীর (Pneumatic Trough) উপর একটি জলপূর্ণ গ্যাসজার (Gas Jar) উল্টাইয়া রাখ। ছিপির নলের অপর প্রান্ত গ্যাসজারের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দাও। পরীক্ষানলটিকে সামান্য নিম্নমুখ করিয়া পূর্বোক্ত চূর্ণের নিম্নে সাবধানতার সহিত তাপ দাও। পরীক্ষানলের মধ্য হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া গ্যাস-জারের মধ্যে জমিতে থাকিবে এবং গ্যাসজারের জল ক্রমশ কমিতে থাকিবে। জারটি গ্যাসে পূর্ণ হইলে প্রথমে উহার মুখ ঘসাকাচের ঢাকা দ্বারা বন্ধ কর, পরে জারটিকে জল হইতে তুলিয়া লও। এইরূপে ৩।৪টি জার অক্সিজেন গ্যাসে পূর্ণ কর। এইবার নলটিকে জল হইতে সরাইয়া লও এবং পরে তাপ প্রদান বন্ধ

কর। নলটিকে প্রথমে সরাইয়া না লইলে পরীক্ষানলের মধ্যে জল প্রবেশ করিবে।

তোমরা পটাসিয়ম ক্লোরেটের সহিত ম্যাংগানিস ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত করিয়াছিলে, কিন্তু সমীকরণে উহা দেখান হয় নাই। অক্সিজেন উৎপন্ন হইবার পর পটাসিয়ম ক্লোরেটের পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু ম্যাংগানিস্ ডাইঅক্সাইড অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে;
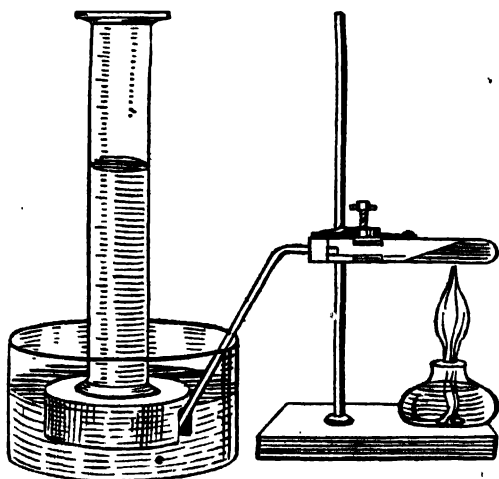
৭৩নং চিত্র

সুতরাং এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ম্যাংগানিস্ ডাইঅক্সাইড যোগদান করে নাই, সাহায্য করিয়াছে মাত্র। তবে ইহার উপস্থিতিতে ক্লোরেট দ্রুত বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ যে সকল বস্তু নিজেরা অপরিবর্তিত থাকিয়া কোন রাসানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য করে, তাহাদিগকে অনুঘটক (Catalytic Agent) কহে।

অক্সিজেনের ধর্ম। এইবার গ্যাসজারে সংগৃহীত অক্সিজেন পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহা **বর্ণহীন, স্বাদহীন** ও **গন্ধহীন** গ্যাস। সংগ্রহ করিবার সময় দেখিয়াছ যে ইহা জলে **সম্পূর্ণরূপে দ্রাবণীয় নহে**; এবং পূর্বে দেখিয়াছ যে ইহা জলে দ্রবীভূত থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহা জলে অত্যল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। মৎস্যাদি জলচর প্রাণী এই দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রত্যেক জীবের শ্বাসক্রিয়া তথা **জীবনধারণের পক্ষে ইহা অপরিহার্য**। একটি কাঠি জ্বালিয়া নিবাইয়া দিলে উহাতে কিছুক্ষণ অগ্নি থাকে, অর্থাৎ শিখা না থাকিলেও উহা লাল হইয়া থাকে। এই অবস্থায় একটি কাঠি অক্সিজেনপূর্ণ জারে প্রবেশ করাইয়া দিলে কাঠিটি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে না। ইহা হইতে বুঝা গেল যে অক্সিজেন নিজে **দাহ্য নহে**, কিন্তু **দহনের সমর্থক**। ইহা প্রায় সমস্ত মৌলিক বস্তুর সহিত যুক্ত হইতে পারে; সেইজন্য ইহাকে সক্রিয় (Active) গ্যাস বলা হয়। তোমরা পরে দেখিতে পাইবে যে হাইড্রোজেনগ্যাস দাহ্য। ইহা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া দগ্ধ হইলে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা উৎপন্ন হয়। এই শিখার তাপ অত্যন্ত অধিক (প্রায় ২০০০° সেন্টিগ্রেড)। এই তাপে প্লাটিনাম ধাতু গলান যায়, এবং নানাবিধ ঝালাই কার্য সম্পন্ন করা হয়। অক্সিহাইড্রোজেনের শিখার সম্মুখে একটি চুণের (Quicklime) দণ্ড রাখিলে উহা গলে না বটে, কিন্তু উহা হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হয়। ইহাকে লাইম্ লাইট্ (Lime Light) বলে। অ্যাসিটিলিন ও অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাস দগ্ধ হইয়া অক্সিএসিটিলিন শিখা উৎপন্ন হয়। এই শিখার তাপ প্রায় ২৫০০° সেন্টিগ্রেড। অক্সিজেন গ্যাস পীড়িত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়ার সহায়করূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেন

চিহ্ন—N ; আণবিক সূত্র—N_2; পারমাণবিক ওজন—১৪।

মুক্ত অবস্থায় পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে, কারণ বায়ুর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন। যে ভাবে জলের উপর বেলজার চাপা দিয়া গন্ধক প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছিলে, সেইভাবে একটু ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) খর্পরের উপর রাখিয়া জ্বালাইয়া দাও এবং জলের উপর বেলজার চাপা দাও। বায়ুর অক্সিজেন ফস্‌ফরাসের সহিত যুক্ত হইয়া ফস্‌ফরাস্ পেণ্টক্সাইড উৎপন্ন হইবে। ($4P+5O_2=2P_2O_5$)। P_2O_5 জলে দ্রাবণীয়, সুতরাং বেলজারের মধ্যে নাইট্রোজেন পড়িয়া থাকিবে। বেলজারের মধ্যে কেবল নাইট্রোজেন থাকে না, উহার সহিত আর্গন প্রভৃতি গ্যাস এবং সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে। রসশালায় সাধারণত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। দুইটি পৃথক পাত্রে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও সোডিয়ম নাইট্রাইট ($NaNO_2$) যতদূর সম্ভব অল্প জলে দ্রব কর। একটি ফ্লাস্ক লও; ফ্লাস্কটির ছিপিতে দুইটি ছিদ্র কর; একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি থিস্‌ল্ ফনেল (Thistle Funnel) ফ্লাস্কের প্রায় তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দাও, এবং অপর ছিদ্রটির মধ্যে সমকোণে বক্র একটি কাচের নল ফ্লাস্কের ভিতর সামান্য প্রবিষ্ট করাও। এই নলের অপর প্রান্ত নিউম্যাটিক ট্রাফের মধ্যে যাইবে। এইবার যে ভাবে অক্সিজেন সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সেইভাবে জলের উপর গ্যাসজার উল্টা করিয়া রাখ। থিস্‌ল্ ফনেলের সাহায্যে পূর্বোক্ত দ্রব দুইটি ফ্লাস্কে ঢালিয়া দাও এবং ফ্লাস্কের নিম্নে অল্প তাপ দিতে থাক। ফ্লাস্কের মধ্যে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হইয়া গ্যাসজারে

জমিতে থাকিবে। গ্যাস বাহির হইতে আরম্ভ হইলেই তাপ প্রদান বন্ধ করিবে, আর তাপ দিবার প্রয়োজন হইবে না। ফ্লাস্কের মধ্যে প্রথমে অ্যামোনিয়ম্ ক্লোরাইড্ ও সোডিয়ম নাইট্রাইট্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ম্ নাইট্রাইট্ ও সোডিয়ম ক্লোরাইডে পরিবর্তিত হয়। পরে অ্যামোনিয়ম্‌নাইট্রাইট্ বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন ও জল উৎপন্ন হয়। নিম্নে এই দুই রাসায়নিক পরিবর্তনের সমীকরণ দেওয়া হইল।

$$NaNO_2 + NH_4Cl = NaCl + NH_4NO_2$$

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O.$$
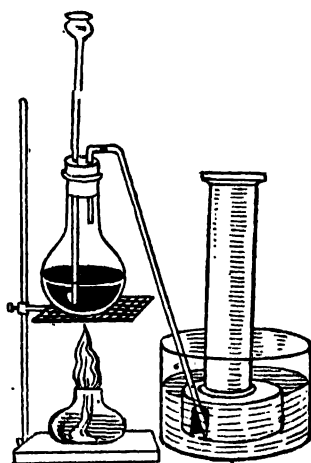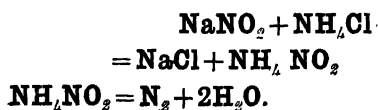
৭৪নং চিত্র

নাইট্রোজেনের ধর্ম। অক্সিজেনের ন্যায় নাইট্রোজেনও **বর্ণহীন স্বাদহীন** ও **গন্ধহীন** গ্যাস। ইহা **অক্সিজেন অপেক্ষাও জলে অল্প দ্রাবণীয়।** একটি নাইট্রোজেনপূর্ণ গ্যাসজারে লোহিতোত্তপ্ত কাঠি প্রবিষ্ট করাইলে দেখিবে যে, উহা নির্বাপিত হইয়া যাইবে, এমন কি জ্বলন্ত কাঠি প্রবিষ্ট করাইলেও উহা নির্বাপিত হইবে। এই গ্যাস নিজেও জ্বলে না। নাইট্রোজেন **দাহ্য নহে** এবং উহা **দহন-সমর্থক**ও নহে। বিষাক্ত না হইলেও এই গ্যাসে শ্বাসক্রিয়া চলে না। অক্সিজেন যেরূপ শীঘ্র অন্য মৌলিক বস্তুর সহিত যুক্ত হয়, নাইট্রোজেন সেরূপ নহে। সেইজন্য ইহাকে অক্রিয় (Inert) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নাইট্রোজেন বায়ু অপেক্ষা সামান্য লঘু। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে

নাইট্রোজেনকে সাময়িকভাবে সক্রিয় (Active) করা যায় ; তখন ইহা ফস্‌ফরাস্‌ প্রভৃতি নানা মৌলিক বস্তুর সহিত অনায়াসে যুক্ত হইতে পারে।

কার্বণ ডাইঅক্সাইড

আণবিক সূত্র—CO_2 ; আণবিক ওজন—৪৪।

বায়ুতে সাধারণত সামান্য পরিমাণ (শতকরা ০'০৪ ভাগ) কার্বণডাইঅক্সাইড বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জীবগণের পরিত্যক্ত নিশ্বাস-বায়ুতে উহার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪'৪০ ভাগ। প্রস্রবণের জলে দ্রব অবস্থায় এবং খড়ি, চুণা-পাথর, মর্মর (Marble) প্রভৃতিতে যুক্ত অবস্থায় CO_2 বিদ্যমান থাকে। কাষ্ঠ, কয়লা, বাতি প্রভৃতি কার্বণপ্রধান বস্তু মুক্ত বায়ুতে দগ্ধ হইলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। রসশালায় সাধারণত মর্মর প্রস্তর বিশ্লেষ করিয়া CO_2 সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। দুইটি মুখ বিশিষ্ট বোতলকে উল্‌ফের বোতল (Woulf's Bottte) কহে। ইহার এক মুখের ছিপি ভেদ করিয়া একটি থিস্‌ল্‌ ফনেল বোতলের প্রায় তলদেশ পর্যন্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দাও ; এবং অপর ছিপি ভেদ করিয়া একটি বক্র কাচের নল বোতলের উপর পর্যন্ত পরাইয়া দাও। এই নলটির অপর প্রান্ত অধোমুখ হইবে। নলটি একটি খালি (বায়ুপূর্ণ) গ্যাসজারের মধ্যে থাকিবে। উল্‌ফের বোতলের মধ্যে কতকগুলি মর্মর প্রস্তরের ক্ষুদ্র খণ্ড নিক্ষেপ কর ও কিঞ্চিৎ জল ঢাল। এইবার ছিপিগুলি আঁটিয়া দাও। ফনেলের ভিতর দিয়া গুরু (Concentrated) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্‌ বোতলের মধ্যে ঢাল। অ্যাসিড পড়িবামাত্র মর্মরখণ্ড হইতে বুদ্বুদ উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং

নলের মধ্য দিয়া গ্যাসজারে জমিতে থাকিবে। কার্বণ ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা গুরুভার বলিয়া জারের নিম্নে চলিয়া যায় এবং জারের মধ্যস্থিত বায়ু তাড়াইয়া জারকে পূর্ণ করে।

$$CaCo_3+2HCl=CaCl+H_2O+CO_2$$
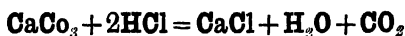
কার্বণ ডাইঅক্সাইডের ধর্ম। ইহা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় **বর্ণহীন** গ্যাস, কিন্তু ইহার সামান্য **অম্লস্বাদ** আছে। বিষাক্ত না হইলেও ইহা দ্বারা **শ্বাসকার্য চলে না**। বায়ুতে ইহার পরিমাণ শতকরা ০.০৬ ভাগের অধিক হইলে প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়, এবং তদতিরিক্ত হইলে শ্বাসরোধ হয় এমন কি মৃত্যু হইতে পারে। হাইড্রোজেনের তুলনায় বায়ুর ঘনত্ব (Density) প্রায় ১৪, কিন্তু CO_2র ঘনত্ব ২২; সুতরাং ইহা **বায়ুর প্রায় দেড় গুণ ভারী**। জলকে যে ভাবে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালা যায়, ইহাকেও সেইরূপ ভাবে ঢালা যায়। CO_2 পূর্ণ গ্যাসজারে একটি জ্বলন্ত বাতি নামাইয়া দিলে উহা নির্বাপিত হইয়া যাইবে এবং গ্যাস নিজেও জ্বলিবে না, কিন্তু একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ম তার CO_2 পূর্ণ জারে জ্বলিতে থাকে, সুতরাং ইহা **দাহ্য নহে** এবং সাধারণ ভাবে **দহন সমর্থক নহে**, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর দহন সমর্থন করে। গুরুভার গ্যাস বলিয়া ইহা সাধারণত পুরাতন অব্যবহৃত কূপের নিম্নে জমে, এই সকল কূপ সংস্কার করণার্থ, কূপের মধ্যে নামিয়া বহু লোক শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। এইরূপ কূপে নামিবার পূর্বে একটি জ্বলন্ত
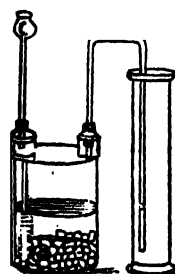
৭৫নং চিত্র

বাতি নামাইয়া দেওয়া হয়। বাতি নির্বাপিত হইলে বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে CO_2 জমিয়া আছে, এবং বাতি জ্বলিতে থাকিলে উহার মধ্যে নামা নিরাপদ। স্বাভাবিক বায়ুর চাপে ১৫° সেন্টিগ্রেড উষ্মায় ইহা সম-আয়তন জলে **দ্রব হয়**। অতিরিক্ত চাপের অধীনে জলে CO_2 দ্রব করিয়া "সোডার জল" প্রস্তুত করা হয়। তোমরা দেখিয়াছ যে সূর্যালোকে উদ্‌ভিদের সবুজ অংশে ইহা কার্বণ ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়; কার্বণ উদ্‌ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। রাত্রে কিন্তু এই প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে, তখন উদ্‌ভিদের কেবল শ্বাসকার্য চলে, অর্থাৎ অক্সিজেন গৃহীত ও CO_2 পরিত্যক্ত হইয়া নিম্নে জমিতে থাকে। সেইজন্য রাত্রে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাওয়া অবিধেয়। এক জার কার্বণডাইঅক্সাইডে কিছু জল ঢাল। CO_2 জলে দ্রব হইবে, এই দ্রবে একখানি নীল লিটমাস (Litmus) কাগজ ফেলিয়া দাও; কাগজখানি লোহিত বর্ণধারণ করিবে। অ্যাসিড সংযোগে নীল লিট্‌মাস লাল হয়। সুতরাং কার্বণডাইঅক্সাইড-দ্রব **সামান্য অ্যাসিড**; এই কারণে এই গ্যাসকে সাধারণ ভাষায় **কার্বণিক অ্যাসিড গ্যাস** বলা হয়। উক্ত দ্রবকে তাপ সংযোগে ফুটাইলে দেখিবে যে লিটমাস্ কাগজ পুনরায় নীল হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ দ্রব হইতে CO_2 চলিয়া গিয়াছে। এইবার একটি CO_2 পূর্ণ জারে একটু পরিষ্কার স্বচ্ছ চূণের জল ঢাল, উহা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র হইবে; **চূণের জলকে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র করা** CO_2র একটি বিশেষত্ব। বায়ুতে শতকরা ২½ ভাগ (আয়তনানুসারে) বা ততোধিক CO_2 বিদ্যমান থাকিলে বায়ু আর দহন সমর্থন করিতে পারে না, সেইজন্য CO_2কে **অগ্নি-নির্বাপক** রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। একটি পাত্রে একটু বেন্‌জিন বা তার্পিন জ্বালাইয়া দাও এবং তাহার উপর

যেরূপভাবে জল ঢালে, সেইরূপভাবে একটি জার হইতে CO_2 গ্যাস ঢালিয়া দাও, অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

আণবিক সূত্র—H_2O ; আণবিক ওজন—১৮।

পূর্বে জলকে মৌলিক বস্তু রূপে গণ্য করা হইত। ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেব দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া জল প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করেন যে জল **যৌগিক বস্তু**। তোমরা তাড়িৎবিশ্লেষ প্রসঙ্গে দেখিয়াছ যে জলকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক গ্যাসদ্বয়ে বিশ্লেষ করা যায় ; জলে এই গ্যাসদ্বয় নির্দিষ্ট অনুপাতে (২ : ১) বিদ্যমান থাকে এবং উহাদিগকে সহজে পৃথক করা যায় না ; অধিকন্তু, গ্যাসদ্বয় যখন যুক্ত হয় তখন তাহাদের নিজস্ব ধর্ম পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য জলকে বায়ুর ন্যায় মিশ্র বলা যায় না, ইহা যৌগিক বস্তু।

জলের উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। অক্সিজেনের ধর্ম তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ, এক্ষণে হাইড্রোজেনের ধর্ম কিরূপ তাহা দেখ।

হাইড্রোজেন

চিহ্ন—H ; আণবিক সূত্র—H_2 ; পারমাণবিক ওজন—১।

জলকে বিশ্লেষ করিয়া হাইড্রোজেন পাওয়া যাইতে পারে। রসশালায় সাধারণত সাল্ফিউরিক অ্যাসিড্ (H_2SO_4) হইতে এই গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। কার্বণ ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করিবার সময় যেরূপ উল্ফের বোতল লইয়াছিলে, সেইরূপ থিসল্ ফনেল ও বক্রনল সমেত একটি উল্ফের বোতলে কতকগুলি **বাজার-চলন দস্তার** (Commer-

cial zinc) গুটি লও। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সংগ্রহের সময় যেরূপ ট্রাফের জলের উপর জলপূর্ণ গ্যাসজারে গ্যাস সংগ্রহ করিয়াছিলে হাইড্রোজেনও সেইভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। উল্‌ফের বোতল
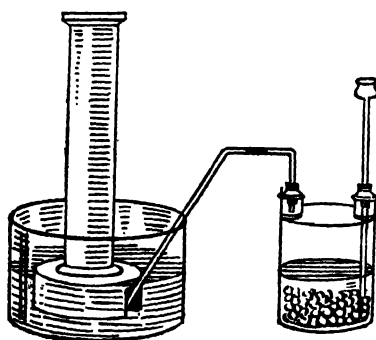
৭৬নং চিত্র

ছিপিবন্ধ করিয়া থিস্‌ল্ ফনেলের ভিতর দিয়া কিছু **লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড** (Dilute Sulphuric Acid) ঢালিয়া দাও। দস্তার উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জিঙ্কসালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে।

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$
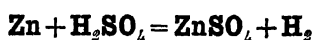
কিছুক্ষণ গ্যাস নির্গত হইবার পর কতকগুলি গ্যাসজার পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় (জলের উপর) হাইড্রোজেনগ্যাসে পূর্ণ কর।

হাইড্রোজেনের ধর্ম। ইহা **বর্ণহীন, স্বাদহীন** ও **গন্ধহীন** গ্যাস এবং জলে অতি **অল্প দ্রাবণীয়**।

একটি তুলার (Balance) দুইদিকে দুইটি বীকার নিম্নমুখ করিয়া ঝুলাইয়া দাও। একটি বীকারের নিম্নে একটি হাইড্রোজেনপূর্ণ জারের

মুখ খুলিয়া ধর। হাইড্রোজেন সেই বীকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তুলার সেই দিক্ উচ্চ হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে হাই-ড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা **লঘু**। একটি সাধারণ খেলার বেলুন হাইড্রো-জেন গ্যাসে পূর্ণ করিয়া এবং মুখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দাও, উহা দ্রুত উপরে উঠিয়া যাইবে। ইহাও হাইড্রোজেনের লঘুত্ব প্রমাণ করে। ইহা অপেক্ষা লঘু কোন বস্তু আমাদের জানা নাই।

হাইড্রোজেনপূর্ণ জারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি নিমজ্জিত কর। কাঠিটি নির্বাপিত হইয়া যাইবে কিন্তু জারের মুখের নিকট গ্যাসটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অন্ধকার গৃহে জারটি নিম্নমুখে ধরিয়া জ্বালিয়া দিলে হাইড্রোজেন জারের মুখের নিকট ক্ষীণ নীলাভ আলোক বিকিরণ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে; অতএব ইহা **দহন সমর্থক না হইলেও স্বয়ং দাহ্য**।

একটি বাল্‌ব সমন্বিত সরল নলের বাল্‌বে কিছু ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড লও। নলটিকে অনুভূমিকভাবে স্থাপন কর। উহার এক প্রান্ত হাইড্রোজেন উৎপাদক উল্‌ফের বোতলের সহিত এবং অপর প্রান্ত সমকোণে-বক্র কাচের নলের সহিত সংযুক্ত কর। শেষোক্ত নলটির এক প্রান্ত সূক্ষ্ম হইবে এবং ঊর্ধ্বমুখে থাকিবে। নলের এই প্রান্তটিকে জ্বালাইয়া দাও, এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া একটি মোটা কাচের নল ধর। উল্‌ফের বোতল হইতে যখন হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, তখন উহার সহিত লঘু অ্যাসিডের জলকণা থাকিতে পারে, ক্যালসিয়ম্ ক্লোরাইড সেই জল বিশোষণ করিবে। বক্রনলের মধ্যে শুষ্ক হাইড্রোজেন যাইয়া সূক্ষ্ম মুখে দগ্ধ হইবে এবং বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন করিবে। বাহিরের মোটা নলটির ভিতরদিকে যে জলকণা দেখা যাইবে তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। বাহিরের নলটিকে ধীরে ধীরে
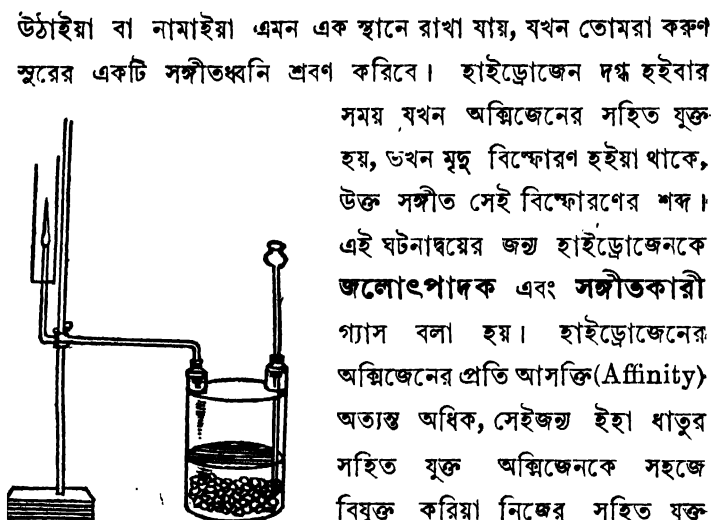
উঠাইয়া বা নামাইয়া এমন এক স্থানে রাখা যায়, যখন তোমরা করুণ সুরের একটি সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিবে। হাইড্রোজেন দগ্ধ হইবার সময় যখন অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়, তখন মৃদু বিস্ফোরণ হইয়া থাকে, উক্ত সঙ্গীত সেই বিস্ফোরণের শব্দ। এই ঘটনাদ্বয়ের জন্য হাইড্রোজেনকে **জলোৎপাদক** এবং **সঙ্গীতকারী** গ্যাস বলা হয়। হাইড্রোজেনের অক্সিজেনের প্রতি আসক্তি (Affinity) অত্যন্ত অধিক, সেইজন্য ইহা ধাতুর সহিত যুক্ত অক্সিজেনকে সহজে বিযুক্ত করিয়া নিজের সহিত যুক্ত করে, অর্থাৎ ধাতব অক্সাইডকে বিজারিত (Reduce) করে। লৌহ, প্লাটিনাম্ প্রভৃতি ধাতু হাইড্রোজেনকে বিশোষণ করিতে পারে। হাইড্রোজেন গ্যাস তাপের **সুপরিবাহী**।

৭৭নং চিত্র

জলের রাসায়নিক সংযুতি (Composition)

জলের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষে তোমরা দেখিয়াছ যে আয়তনানুসারে জলে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন সংযুক্ত থাকে। এক্ষণে ওজনানুসারে উক্ত উপাদানদ্বয় জলে কি অনুপাতে থাকে তাহা দেখ। একটি উল্‌ফের বোতলে হাইড্রোজেন উৎপাদন করিয়া প্রথমে উহাকে পটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট্ দ্রবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কর। (এইরূপে উহার অনেক আবর্জনা দূর হইবে)। অতঃপর উহাকে একটি গুরু সালফিউরিক অ্যাসিডপূর্ণ বোতলের মধ্য দিয়া যাইতে দাও।

(হাইড্রোজেনে যদি কোন জলকণা থাকে, অ্যাসিড তাহা বিশোষণ করিবে এবং বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হাইড্রোজেন বোতল হইতে বাহির হইবে)। অতঃপর বাল্‌ব সমন্বিত একটি সরল নলের মধ্য দিয়া উক্ত হাইড্রোজেন গমন করিবে, উক্ত নলের বাল্‌বে কিঞ্চিৎ শুষ্ক কপার অক্সাইড লইবে। নলের অপর প্রান্ত একটি ক্ষুরনলের (U tube) সহিত যুক্ত হইবে ; ক্ষুরনলটি ক্যালসিয়ম্ ক্লোরাইডে পূর্ণ করিবে, এবং উহার অপর প্রান্ত খোলা থাকিবে। এইরূপে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হাইড্রোজেন, কপারঅক্সাইড স্পর্শ করিয়া ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ বাহির হইবার পর, কপারঅক্সাইডকে কয়েক মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত কর। হাইড্রোজেন কপার অক্সাইডকে বিজারিত (Reduce) করিয়া জলে পরিণত হইবে এবং
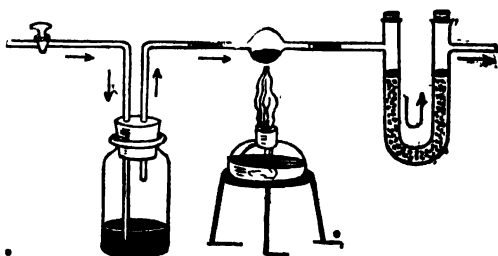
৭৮নং চিত্র

বাল্‌বের মধ্যে তামা (Metallic Copper) পড়িয়া থাকিবে ($CuO + H_2 = Cu + H_2O$)। ক্ষুরনলের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় জল ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হইবে। সমস্ত কপার অক্সাইড যতক্ষণ না তামায় পরিণত হয় ততক্ষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করিও না। যতক্ষণ বাল্‌বনল ও ক্ষুরনল শীতল না হয় ততক্ষণ উহার মধ্য

দিয়া শুষ্ক হাইড্রোজেন প্রবাহিত করিবে। পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে কপারঅক্সাইড সমেত বাল্‌বনলকে এবং ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড সমেত ক্ষুরনলকে সযত্নে পৃথক্‌ভাবে ওজন্ করিয়া রাখিবে। পরীক্ষার পর যখন উহারা শীতল হইয়াছে, তখন আবার উহাদিগকে আধেয় সমেত সযত্নে ওজন করিলে দেখিবে যে তামা সমেত বাল্‌ব্‌ নলের ওজন হ্রাস এবং ক্যাল্‌সিয়ম্ ক্লোরাইড্ সমেত ক্ষুরনলের ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে।

মনে কর, বাল্‌ব্‌নল + কপার অক্সাইডের ওজন ছিল—ক

" + তামার ওজন হইয়াছে—খ

এবং, ক্ষুরনল + ক্যালসিয়ম্ ক্লোরাইডের ওজন ছিল—গ

" + " " + জলের ওজন হইয়াছে—ঘ

সুতরাং, কপারঅক্সাইড হইতে ক-খ পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হইয়াছে এবং উহা হাইড্রোজনের সহিত মিলিত হইয়া ঘ-গ পরিমাণ জল উৎপন্ন করিয়াছে।

যদি তোমার ওজন করা নিভুর্ল হয়, তাহা হইলে দেখিবে যে ক-খ $= \frac{৮}{৯}$(ঘ-গ), অর্থাৎ ওজনানুসারে ৮ ভাগ অক্সিজেন ৯ ভাগ জল উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং হাইড্রোজেনের ওজন = ৯—৮ = ১। অতএব দেখা যাইতেছে যে **ওজনানুসারে** ৮ ভাগ অক্সিজেন ১ ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ৯ ভাগ জল উৎপন্ন করে।

প্রাকৃতিক জল ও বাতান্বিত জল

সমুদ্রই প্রাকৃতিক জলের প্রধান কেন্দ্র। সমুদ্রের জল সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হইয়া মেঘ হয়, মেঘ শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিকে পূর্ণ করে, এবং ভূপৃষ্ঠ

হইতে নদ নদীর সাহায্যে পুনরায় সমুদ্রে ফিরিয়া আইসে। প্রাকৃতিক জল আমরা কখন বিশুদ্ধ অবস্থাই পাই না। প্রধানত বৃষ্টি, কূপ, পুষ্করিণী, খাল, বিল, নদী ও প্রস্রবণ হইতে আমরা জল সংগ্রহ করিয়া থাকি। প্রত্যেক জলেই নানাবিধ আবর্জনা মিশ্রিত থাকে; কতকগুলি আবর্জনা জলে দ্রাবণীয় এবং কতকগুলি দ্রাবণীয় নহে। আবর্জনাগুলি খনিজ এবং জান্তব দুই প্রকার হইতে পারে।

সমুদ্র জলে অত্যধিক পরিমাণে কঠিনবস্তু দ্রব থাকে, এই সকল বস্তুর মধ্যে খাদ্যলবণ (Common Salt) প্রধান। ইহা ভিন্ন ম্যাগনেসিয়ম, ক্যালসিয়ম, পটাসিয়ম প্রভৃতি ধাতুঘটিত নানাবিধ লবণও সমুদ্রজলে দ্রব থাকে। সমুদ্রজলে এই সকল আবর্জনার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩·৬, তন্মধ্যে খাদ্যলবণের পরিমাণ ২·৬। নদীর জলে দ্রাবণীয় ও অদ্রাবণীয় উভয় প্রকার আবর্জনা থাকে, সেইজন্য ইহা সাধারণত ঘোলা হয়।

ভূপৃষ্ঠের জল ভূ-ত্বকের সছিদ্র স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে গমন করে, সেই জল গভীর কূপে বা প্রস্রবণে উত্থিত হয়, সুতরাং গভীর কূপ বা প্রস্রবণের জলে অদ্রাবণীয় আবর্জনা অতি অল্প থাকে; কিন্তু ইহাতে ক্যালসিয়ম্, ম্যাগনেসিয়ম্, লৌহ প্রভৃতি ঘটিত লবণ ও কার্বণ-ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস দ্রব হইয়া থাকিতে পারে। কার্বণ-ডাইঅক্সাইড দ্রব থাকিলে জল **বাতান্বিত** (Ærated) হয়।

প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জলে সর্বাপেক্ষা অল্প আবর্জনা থাকে; কারণ ইহা স্বাভাবিক উপায়ে পাতিত (Distilled)। বায়ুর মধ্য দিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার সময় বায়ুস্থ অক্সিজেন, কার্বণ ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস, ধূলি, পোকা, জীবাণু এবং কলকারখানা-বহুল স্থানে ধূম, ঝুল প্রভৃতি আবর্জনার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। পানীয়

জল যতদুর সম্ভব বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ; বিশেষত পানীয় জলে জৈব আবর্জনা থাকা বিপজ্জনক। ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বচ্ছ হওয়া উচিত। গভীর কূপের ও প্রস্রবণের জল বাতান্বিত হওয়ায় অধিক সুস্বাদু হয়, কিন্তু পাতিত জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলেও স্বাদহীন বা "বোদা" হইয়া থাকে। গালন প্রক্রিয়া দ্বারা অদ্রাবণীয় আবর্জনা এবং পাতন প্রক্রিয়ায় দ্রাবণীয় আবর্জনা দূর করা যায়। তথাকথিত "সোডার জলে" সোডা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সাধারণ জলে অতিরিক্ত চাপের অধীনে যতদূর সম্ভব কার্বণ ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। জলে লেবু, আদা প্রভৃতির সিরাপ মিশ্রিত করিয়া উক্ত প্রকারে লিমনেড্, জিন্‌জারেড্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বাতান্বিত জল (Ærated water) বলে। কার্বণডাই-অক্সাইড্ স্নিগ্ধকারক এবং বাতান্বিত জল সুস্বাদু বলিয়া, ইহা বহুল পরিমাণে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

খর জল ও মৃদু জল

যে জলে সাবান ঘষিলে সহজে অধিক ফ্যানা হয় তাহাকে **মৃদুজল** (Soft water), এবং যে জলে সহজে ফ্যানা হয় না তাহাকে **খরজল** (Hard water) কহে। ক্যালসিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়মের বাইকার্বনেট্, সালফেট্, ক্লোরাইড্ প্রভৃতি লবণ দ্রব হইয়া থাকিলে জল খর হয়। জলের খরত্ব **স্থায়ী বা অস্থায়ী** হইতে পারে। যে জল ফুটাইলে তাহার খরত্ব নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে অস্থায়ী, এবং উক্ত প্রকারে খরত্ব নষ্ট না হইলে স্থায়ী খর জল বলে।

জলে ক্যালসিয়ম্ বা ম্যাগনেসিয়ম্ বাইকার্বনেট্ দ্রব হইয়া

থাকিলে উহার খরত্ব অস্থায়ী হয়, কিন্তু উক্ত ধাতুদ্বয়ের সালফেট্ বা ক্লোরাইড দ্রব হইয়া থাকিলে জলের খরত্ব স্থায়ী হয়।

ফুটাইলে, বা উহার সহিত **চূণের জল মিশ্রিত করিলে** অস্থায়ী খরজল মৃদুজলে পরিণত হয়। (চূণের জল মিশ্রিত করিয়া জলের খরত্ব নষ্ট করার প্রথাকে **ক্লার্কের প্রক্রিয়া** কহে)।

ফুটাইলে, $CaH_2 \ (CO_3)_2 = CaCO_3$ (অদ্রাবণীয়) $+ H_2O + CO_2$

$MgH_2 \ (CO_3)_2 = MgCO_3$ (অদ্রাবণীয়) $= H_2O + CO_2$

চূণের জল মিশ্রিত করিলে,

$$CaH_2(CO_3)_2 + Ca(OH)_2 = 2CaCO_3 + 2H_2O$$

$$MgH_2(CO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 = 2CaCO_3 + Mg(OH)_2 + 2H_2O$$
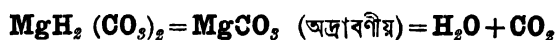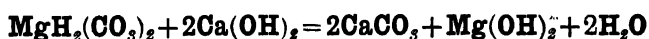
(ম্যাগনেসিয়ম্ বাইকার্বনেটের সহিত দ্বিগুণ চূণের জল মিশ্রিত করিতে হইবে)।

উক্ত প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত লবণ অদ্রাবণীয় হইয়া জলের নিম্নে পতিত হয়, সুতরাং জল মৃদু হইয়া যায়। কেট্‌লি বা ইঞ্জিনের বয়লারে প্রায় "খাঁকারি" জমিতে দেখা যায়, কারণ ক্যালসিয়ম্ বাইকার্বনেট্ মিশ্রিত (অস্থায়ী) খরজল ফুটিবার সময় উহা হইতে অদ্রাবণীয় ক্যালসিয়ম্ কার্বনেট্ বাহির হইয়া "খাঁকারি"রূপে কেট্‌লি বা বয়লারের গাত্রে জমিয়া থাকে।

স্থায়ী খরজলে সোডাক্ষার (সোডিয়ম্ কার্বনেট্) মিশ্রিত করিলে, উহা দ্রাবণীয় ক্যালসিয়ম্ বা ম্যাগনেসিয়মের ক্লোরাইড্ বা সালফেটের সহিত সংযুক্ত হইয়া অদ্রাবণীয় কার্বণেটে পরিণত হয়, এবং এইরূপে জলের স্থায়ী খরত্ব দূরীভূত হইয়া থাকে। নিম্নে উক্ত রসায়নিক ক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হইল।

$$MgCl_2 + Na_2CO_3 \text{ (সোডা)} = MgCO_3 + 2NaCl$$

$$CaSO_4 + Na_2CO_3 = CaCO_3 + Na_2SO_4$$
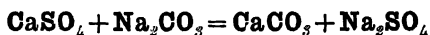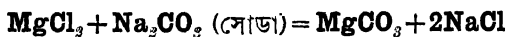
খরজলে সাবান দিয়া ধৌতক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, উহাতে অযথা সাবান নষ্ট হয়। খরজল পান করিতে বিস্বাদ লাগে এবং ইহা রন্ধনকার্যেরও অনুপযুক্ত। খরজল পান করিলে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি জন্মিতে পারে।

Questions :—How can you seperate the ingredients of a mechanical mixture ? (2) Describe the following laboratory processes, (*a*) filtration, (*b*) distillation (*c*) sublimation. (3) What chemical changes take place when iron rusts and candle burns ? (4) What are the compositions of air and water ? Which of them is a chemical compound and why ? (5) How do you prepare (*a*) Oxygen, (*b*) Hydrogen, and (*c*) Carbon dioxide in the laboratory Enumerate their respetive properties. (6) What do you mean by the terms hard water and soft water ? Describe the methods of softning different kinds of hard water.

পরিশিষ্ট

অগস্ত্য—Canopus.

অগ্ন্যাশয়—Pancreas.

অচ্ছোদপটল—Cornea

অণু—Molecule.

অধিবৃত্ত—Parabola.

অনচ্ছ—Opaque.

অনুকূলন—Adaptation.

অনুঘটক—Catalytic agent.

অনুজংঘাস্থি—Fibula.

অনুত্রিকাস্থি—Coccyx.

অন্তর্গ্রহ—Inferior planet.

অন্তর্ধূমপাতন—Destructive distillation.

অন্তর্বাস (পুষ্পের)—Corolla.

অন্তর্ভূমি—Subsoil.

অন্তর্মুখ (নার্ভ)—Afferent.

অন্তস্ত্বক—Dermis.

অন্তস্থল—Core.

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—Ulna.

অন্ত্র—Intestine

অন্ত্রধরা কলা—Peritoneum.

অন্ননালী—Œsophagus.

অপুষ্পক উদ্ভিদ্—Phanerogam.

অবচিতি—Catabolism.

অবতল—Concave.

অভিকর্ষ—Gravity.

অভিজিত—Vega.

অভেদ্যতা—Impenetrability.

অমরা—Placenta.

অরণিপ্রস্তর—Flint.

অলিন্দ—Auricle.

অসদ্বিম্ব—Virtual Image.

অস্থানজ (মূল)—Adventitious.

অক্ষকাস্থি—Collar bone.

অংস ফলক—Scapula.

আকর্ষ—Tendril.

আগ্নেয় (শিলা)—Igneous.

আণবিক—Molecular.

আপতিত (রশ্মি)—Incident.

আপাত—Apparent.

আপেক্ষিক গুরুত্ব—Specific-gravity.

আবরকীয়—Parietal.

আলোক যোজন—Photo-Synthesis.
আশক্তি—Affinity.
ইচ্ছানুগ (পেশি)—Voluntary.
ইতর (পরাগ যোগ)—Cross.
ঈষদচ্ছ—Translucent.
উচ্চ সংযোগ—Superior Conjunction.
উত্তল—Convex.
উত্তেজন প্রবণতা—Irritability.
উদর—Abdomen.
উদ্বায়ী—Volatile.
উদ্‌ভিদ্‌ বিদ্যা—Botany.
উপগ্রহ—Satellite.
উপচিতি—Anabolism.
উপচ্ছায়া—Penumbra.
উপপত্র—Stipule.
উপবৃত্ত—Ellipse.
উপদান (খাদ্যের)—Nutritive principle.
উভলিঙ্গ—Hermaphrodite.
উরঃফলক—Breast bone.
উর্বস্থি—Femur.
উল্কা—Meteor.
উল্কাপিণ্ড—Meteorite.
উষ্মা—Temperature.
ঊর্ধ্বপাতন—Sulblimation.
ঋজুরেখ (বিস্তৃতি)—Rectilineal.
এক ফলক পত্র—Simple leaf.
এঁটেল (মাটি)—Clayey.
ঐদস্থিতি বিদ্যা—Hydrostatics.
কঙ্কাল—Skeleton.
কণ্ঠমণি—Adam's apple.
কনীনিকা—Iris.
কন্যা (রাশি)—Virgo.
কশ্যপ—Cassiopeia.
করকুর্চাস্থি—Carpal bone.
করোটি—Skull.
কর্কট (রাশি)—Cancer.
কর্দম—Clay.
কর্দম স্রোত—Muddy stream
কক্ষ (গ্রহাদির)—Orbit.
কালপুরুষ—Orion.
কুম্ভ (রাশি)—Aquarius.
কুন্তক (দন্ত)—Incisor.
কৃষ্ণমণ্ডল—Choroid coat.
কেলাস—Crystal.

কেলাসন—Crystallisation.
কেশর দণ্ড—Filament.
কোষক—Cell.
কোহল—Alcohol.
কৈশিকত্ব—Capillarity.
ক্রম সংকোচ—Peristalsis.
ক্রান্তিবৃত্ত—Ecliptic.
ক্লোম নলিকা—Wind pipe.
ক্লোম শাখা—Bronchial tube.
খণ্ডিত (বর্তনী)—Open.
খরজল—Hard water.
খর্পর—Basin.
খাদ্য-মূল্য—Food value.
খাদ্যরস—Chyle.
খাদ্য লবণ—Common salt.
খিলান—Arch or Anticline.
গমন—Locomotion.
গরিষ্ঠ—Maximum.
গর্ভদণ্ড—Style.
গর্ভমুণ্ড—Stigma.
গর্ভপত্র—Carpel.
গর্ভাধান—Fertilization.
গর্ভাশয়—Ovary.
গলগ্রন্থি—Thyroid gland.
গলন—Melting.
গলবিল—Pharynx.
গালন—Filtration.
গুটি—Cocoon.
গুরু (অ্যাসিড্)—Concentrated.
গুল্ফাস্থি—Tarsal bone.
গুল্ম—Shrub.
গৌণ—Secondary.
গ্রন্থি—Gland.
গ্রহ—Planet.
গ্রহাণুপুঞ্জ—Asteroids.
গ্রাহক (নার্ভকোষ)—Afferent.
গ্যাসীয়—Gaseous.
ঘণক—Cube.
ঘনত্ব—Density.
ঘনীভবন—Condensation.
ঘর্ষ (বিদ্যুৎ)—Frictional.
চর্বক (দন্ত)—Bicuspid.
চল (বিদ্যুৎ)—Dynamical.
চল (শক্তি)—Kinetic.
চিহ্ন—Symbol.
চুম্বক—Magnet.
চুম্বকত্ব—Magnetism.

চুম্বকন—Magnetisation.
চুম্বক পাথর—Lodestone.
চুম্বকীয়—Magnetic.
চ্যুতি—Fault.
চূর্ণীভবন—Disintegration.
ছায়াপথ—Milky-way.
ছিদ্রত্ব—Porosity.
ছেদক (দন্ত)—Canine.
জতুগর্ভ—Bituminous.
জলত্যাগ—Transpiration.
জলবিষুব—Autumnal-equinox.
জরদ (বর্ণ)—Orange.
জড়—Matter.
জাড্য—Inertia.
জান্বস্থি—Patella.
জারণ—Oxidation.
জালক—Capillary.
জিহ্বাগুটি—Papilla.
জীবনেতিহাস—Life history.
জীববিদ্যা—Biology.
জীবাশ্ম—Fossil.
জ্বালামুখ—Crater.
জ্যোতিষ—Astronomy.
জংঘাস্থি—Tibia.
ঝিল্লি—Membrane.
ডিম্ব—Spore.
ডিম্বক—Ovule.
ডিম্বক নাড়ী—Funicle.
ডিম্বক নিবেশ—Placentation.
ডিম্বক রন্ধ্র—Mycropyle.
তঞ্চন—Coagulation.
তন্তু—Fibre.
তন্ত্র—System.
তরুণাস্থি—Cartillage.
তড়িৎ দ্বারা—Electrode.
তড়িৎচালক বল—Electro-motive force.
তড়িৎ চুম্বক—Electromagnet.
তড়িৎ দ্বার—Electrolysis.
তড়িৎ বিশ্লেষ—Electrolysis.
তাপীয়—Thermal.
তারা—Star.
তারামণ্ডল—Constellation.
তুলা (রাশি)—Libra.
ত্রিকাস্থি—Sacrum.
থিতান—Decantation.
দল (পুষ্পের)—Petal.

দহন—Combustion.

দণ্ড (চুম্বক)—Bar.

দক্ষিণ ক্রুশ—Southern Cross.

দক্ষিণাবর্ত—Clockwise.

দিগন্ত—Horizon.

দৈর্ঘ্য (প্রসারণ)—Linear.

দ্রাব—Solute.

দ্রাবক—Solvent.

দ্রাবণ—Solution.

দ্রাবণীয়—Soluble.

দ্রাব্যতা—Solubility.

দ্রোণী—Syncline or Trough.

ধনু (রাশি)—Sagittarius.

ধমনী—Artery.

ধম্মিলক—Cerebellum.

ধস্—Land slide.

ধূমকেতু—Comet.

ধ্রুবাক্ষ—Axis.

নগ্নীভবন—Denudation.

নার্ভপ্রান্ত—End plate.

নিতম্বাস্থি—Hipbone.

নিত্যতা (শক্তির)—Conservation.

নিম্ন সংযোগ—Inferior conjunction.

নির্দেশক (তারা)—Pointer.

নিরক্ষবৃত্ত—Terrestrial equator.

নিলয়—Ventricle.

নিশ্বাস—Expiration.

নিষেক—Fertilization.

নীহারিকা—Nebula.

নেত্রবর্ত্মকলা—Conjunctiva.

নৌ (কম্পাস)—Marine.

পঞ্জরাস্থি—Rib.

পত্রকক্ষ—Axil.

পত্র প্রবাল—Leaf bud.

পত্র ফলক—Leaf lamina.

পত্র বৃন্ত—Petiole.

পত্র ভূমি—Base.

পদার্থ বিদ্যা—Physics.

পরমাণু—Atom.

পরাগ—Pollen.

পরাগধানী—Anther.

পরাগযোগ—Pollination.

পরাগস্থলী—Pollen sack.

পরাবৃত্ত—Hyperbola.

পরিচলন—Convection.
পরিপার্শ্ব—Environment.
পরিবহন—Conduction.
পরিবাহী—Conductor.
পরীক্ষানল—Test tube.
পর্ণাঙ্গ—Fern.
পর্ব (কাণ্ডের)—Node.
পর্বমধ্য—Inter node.
পাকমণ্ড—Chyme.
পাকস্থলী—Stomach.
পাচক রস—Digestive juice.
পাচন—Digestion.
পাত (জ্যোতিষে)—Node.
পাতন—Distillation.
পাপড়ি—Petal.
পালল (শিলা)—Sedimentary.
পিঙ্গল কয়লা—Lignite.
পুং কেশর—Stamen.
পুংযন্ত্র (পুষ্পের)—Androecium.
পূর্ণকীট—Imago.
পৃষ্ঠটান—Surface tension.
পৃষ্ঠ প্রসারণ—Superficial expansion.
পেশি—Muscle.
পেষক (দন্ত)—Molar.
পোষণ—Nutrition.
পৌষ্টিক নালি—Alimentary canal.
প্রগণ্ডাস্থি—Humerus.
প্রচ্ছায়া—Umbra,
প্রজনন—Reproduction.
প্রতিবন্ধ—Resistance.
প্রতিবিম্ব—Image.
প্রতিবিহিত—Compensated.
প্রতিফলন—Reflection.
প্রতিযোগ—Opposition.
প্রতিসরণ—Refraction.
প্রতিসরণাঙ্ক—Refractive index.
প্রতীপ (গতি)—Retrograde.
প্রবাহ—Current.
প্রবীজনাভি—Hylum.
প্রবেশ্য—Permeable.
প্রশ্বাস—Inspiration.
প্রসমন—Nutralise.
প্রসারণ—Expansion.
প্রসারণাঙ্ক—Co-efficient of expansion.

প্রাণবায়ু—Vital air.
প্রাণিবিদ্যা—Zoology.
প্রেরক (নার্ভকোষ)—Efferent.
প্লবতা—Buoyancy.
প্লীহা—Spleen.
ফলক—Lamina.
ফুল্‌কো—Gill.
ফুসফুস্—Lung.
ফুস্‌ফুস ধমনী—Pulmonary artery.
ফুস্‌ফুস্‌ধরাকলা—Pleura.
ফুসফুসোত্থশিরা—Pulmonary vein.
বকযন্ত্র—Retort.
বন্ধনী—Ligament.
বর্তনী—Circuit.
বর্ণালী—Spectrum.
বহির্গ্রহ—Superior planet.
বহির্মুখ (নার্ভ)—Efferent.
বহিস্ত্বক—Epidermis.
বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—Radius.
বহুফলক পত্র—Compound leaf.
বস্তি—Bladder.
বক্ষ—Thorax.
বাতান্বিত—Ærated.
বামাবর্ত—Anti-clockwise.
বারুণ (শিলা)—Plutonic.
বাষ্প—Vapour.
বাষ্পীভবন—Evaporation.
বালুকাময় (শিলা)—Arenaceous.
বালেন্দু—Crescent.
বায়ুকোষ—Air sac.
বায়ুচলন—Ventilation.
বায়ু মণ্ডল—Atmosphere.
বিকিরণ—Radiation.
বিজারণ—Reduction.
বিদ্যুৎ—Electricity.
বিধি—Principle.
বিনতি—Dip.
বিনতি লম্ব—Strike.
বিভাজ্যত্ব—Divisibility.
বিশোষণ—Absorb.
বিয়োজন—Decomposition.
বিক্ষেপ—Deflecation.
বীজ অন্তস্ত্বক—Tegmen.
বীজত্বক—Spermoderm.

বীজপত্র—Cotyledon.
বীজ বহিস্ত্বক—Testa.
বীরুৎ—Herb.
বুধ (গ্রহ)—Mercury.
বৃক্ক—Kidney.
বৃতি—Calyx.
বৃত্যংশ—Sepal.
বৃশ্চিক (রাশি)—Scorpio.
বৃষ (রাশি)—Taurus.
বৃহদন্ত্র—Large intestine.
বৃহস্পতি (গ্রহ)—Jupiter.
বৈদ্যুতিক—Electric.
ব্যাপ্তি—Extension.
ভঙ্গ বা ভাঁজ—Folding.
ভর—Mass.
ভস্ম—Calx.
ভূত্বক—Crust of the earth.
ভূবিদ্যা—Geology.
ভৌত—Physical.
ভ্রূণ—Embryo.
ভ্রূণ পোষক—Nucellus.
ভ্রূণ মূল—Radicle.
ভ্রূণস্থলী—Embryo sac.
মকর (রাশি)—Capricorn.
মঙ্গল (গ্রহ)—Mars.
মণিক—Mineral.
মণিবন্ধাস্থি—Carpal bones.
মধুগ্রন্থি—Nectary.
মধ্যচ্ছদা—Diaphragm.
মধ্যরেখা—Meridian.
মর্মর—Marble.
মস্তিষ্ক—Brain.
মহাকর্ষ—Gravitation.
মহাধমনী—Aorta.
মহাবিষুব—Vernal Equinox
মাটি—Soil.
মাধ্যম—Medium.
মিথুন (রাশি)—Gemini.
মিশ্র—Mixture.
মীন (রাশি)—Pisces.
মুচি—Crucible.
মূককীট—Pupa.
মূল—Root Principal.
মূলত্র—Root cap.
মূলপ্রেষ—Root pressure.
মূলরোম—Root hair.
মৃদুজল—Soft water.
মেরু—Pole.

মেরুদণ্ড (প্রাণীর)—Backbone.
মেরুদণ্ড (পৃথিবীর)—Axis.
মেষ (রাশি)—Aries.
মৌলিক বস্তু—Element.
যকৃত—Liver.
যন্ত্র—Organ.
যুক্তবৃতি—Gamosepalus.
যোজক—Cement.
রক্তকণিকা—Blood corpuscle.
রক্তমস্তু—Serum.
রক্তরস—Plasma.
রশ্মি—Ray.
রশ্মিগুচ্ছ—Beam.
রসশালা—Chemical laboratory.
রসায়ন—Chemistry.
রামধনু—Rainbow.
রাশি—Constellation of Zodiac.
রাসায়নিক—Chemical.
রূপান্তর (প্রাণীর)—Metamorphosis.
রেচন—Excretion.
লঘিষ্ঠ—Minimum.
লঘু—Dilute.
লবণ—Salt.
লবণাম্ল—Hydrochloric acid.
লালা—Saliva.
লুব্ধক—Sirius.
লৌহ প্রস্তর—Iron stone.
শক্তি—Energy.
শঙ্কু—Cone.
শনি—Saturn.
শস্য শোষক—Scutellum.
শারীর বিদ্যা—Physiology.
শারীর (থার্মমিটার)—Clinical.
শিরোবক্ষ—Cephalothorax.
শিলা—Rock.
শিশুমার—Ursa minor.
শীতল মরু—Tundra.
শুক্র (গ্রহ)—Venus.
শুক্রাণু—Spermatozoon.
শুণ্ড—Antena.
শুঁটি—Legume.
শূক—Larva.
শৈবাল—Moss.
শোষকাধার—Desiccator.
শ্বসন—Respiration.

শ্বেত কণিকা—White blood corpuscle.

শ্বেতসার—Starch.

শ্রোণি চক্র—Pelvis.

শ্লেষ্মল কলা—Mucous membrane.

সদ্‌বিম্ব—Real Image.

সপুষ্পক উদ্‌ভিদ্—Phanerogam.

সপ্তর্ষিমণ্ডল—Ursa major.

সমসত্ত্ব— Homogeneous.

সমাবতল—Plano concave.

সমীকরণ—Equation.

সমুচ্চিতি—Metabolism.

সমোত্তল—Plano convex.

সম্ভেদ—Cleavage.

সান্দ্র—Viscous.

সিংহ (রাশি)—Leo.

সুবিন্দু—Zenith.

সুষুম্না কাণ্ড—Spinal cord.

সূচী চুম্বক—Magnetic needle,

সৈন্ধব লবণ—Rock salt.

স্তরীভূত—Stratified.

স্ত্রীবীজ—Ovum.

স্থিতীয় (বিদ্যুৎ)—Statical.

স্থিতি স্থাপক—Elastic.

স্থৈতিক—Potential.

স্নেহদ্রব্য—Fat.

স্নেহগ্রন্থি—Sebaceous gland.

স্ফটিক—Crystal.

স্ফুটন—Ebullition.

স্ফুটনাঙ্ক—Boiling point.

স্ফোটক (ফল)—Dehiscent.

স্বচ্ছ—Transparent.

স্ব (পরাগ যোগ)—Self.

স্বাঙ্গীকরণ- Assimilation.

স্বানুগ (পেশি)—Involuntary.

স্যন্দ্য—Fitrate.

সংনামিতা—Compressibility.

সংপৃক্ত—Saturated.

সংহত—Closed.

সংশক্তি—Cohesion.

হিমবাহ—Glacier.

হিমাঙ্ক—Freezing point.

হৃদয়—Heart.

হৃদয়ধরা কলা—Pericardium.

ক্ষয়ীভবন—Erosion.

ক্ষুদ্রান্ত্র—Small intestine.

ক্ষুরচুম্বক—Horse-shoe magent.

ক্ষুরনল—U-tube.